পর্যায়—২

একক 9 ❑ আলোকের সমবর্তন

গঠন

9.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

9.2 সমবর্তন কাকে বলে?

9.3 সমবর্তিত তরঙ্গের গাণিতিক রূপ

9.4 রৈখিকভাবে সমবর্তিত আলোক উৎপাদনের পদ্ধতি

9.4.1 প্রতিফলনের দ্বারা রৈখিক সমবর্তন

9.4.2 দ্বৈধ প্রতিসরণের দ্বারা রৈখিক সমবর্তন

9.4.3 দ্বিবর্ণ কেলাসের সাহায্যে রৈখিক সমবর্তন

9.5 একাক্ষ কেলাসে আলোক তরঙ্গের সঞ্চার

9.5.1 সাধারণ ও অসাধারণ রশ্মির মধ্যে দশাপার্থক্য

9.6 বৃত্তীয় ও উপবৃত্তীয় সমবর্তনের উৎপাদন

9.7 সমবর্তিত আলোকের বিশ্লেষণ

9.7.1 সমবর্তক ও বিশ্লেষক

9.7.2 সমবর্তনের বিশ্লেষণ পদ্ধতি

9.8 সমবর্তনের ব্যবহারিক প্রয়োগ

9.9 সারাংশ

9.10 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

9.11 উত্তরমালা

9.1 প্রস্তাবনা

এই পাঠক্রমের প্রথম পর্যায়ে আপনি আলোকের ব্যতিচার ও ব্যবর্তন সম্বন্ধে বিশদ্‌ভাবে পড়েছেন। এই ঘটনাগুলি আলোকের তরঙ্গ প্রকৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করলেও এগুলি থেকে আলোকতরঙ্গ অনুদৈর্ঘ্য না অনুপ্রস্থ তা বোঝা যায় না। অথচ আপনি জানেন যে ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎচুম্বকীয় তত্ত্ব অনুযায়ী আলোকতরঙ্গ আসলে তড়িৎক্ষেত্রের তরঙ্গ এবং এই তরঙ্গে তড়িৎক্ষেত্রটি সঞ্চারের দিকের সঙ্গে অভিলম্ব থাকে। তড়িৎক্ষেত্রটি যখন কোন নির্দিষ্ট তলে আবদ্ধ থাকে বা তড়িৎক্ষেত্রের নির্দেশক ভেকটরটি যখন একটি বৃত্ত বা উপবৃত্ত রচনা

করে, তখনই পরীক্ষার মাধ্যমে আলোকতরঙ্গের অনুপ্রস্থ রূপটি ধরা পড়ে এবং ঐ ঘটনাকে আমরা আলোকের সমবর্তন বলি। আপনি হয়ত অনুমান করতে পারছেন যে আলোকের মত অন্যান্য তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গেরও সমবর্তন ঘটতে পারে। এটি সত্য হলেও এখানে আমরা কেবলমাত্র দৃশ্যমান আলোকের সমবর্তনের মধ্যেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

সমবর্তিত আলোর উৎপাদন ও বিশ্লেষণের নানা পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। সমবর্তিত আলোর বেশ কিছু প্রয়োগও আমাদের চোখে পড়ে। এই এককে আপনি সমবর্তিত আলোর কিছু প্রয়োগের সঙ্গেও পরিচিত হবেন।

এর পরের এককে আপনি আলোকীয় ঘূর্ণন (optical rotation) সম্বন্ধে পড়বেন। ঐ বিষয়টি বুঝতেও বর্তমান এককটি অপরিহার্য।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর আপনি যে কাজগুলি করতে সমর্থ হবেন সেগুলি হল ঃ

- আলোকের সমবর্তন কী এবং রৈখিক, বৃত্তীয় ও উপবৃত্তীয় সমবর্তন কাকে বলে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন ধরনের সমবর্তনের গাণিতিক রূপ লিখতে পারবেন এবং কোন একটি আলোকতরঙ্গের গাণিতিক রূপ থেকে তার সমবর্তনের প্রকৃতি চিনে নিতে পারবেন।
- রৈখিক সমবর্তিত আলোক উৎপাদনের তিনটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- রৈখিক সমবর্তিত আলোককে বৃত্তীয় বা উপবৃত্তীয় সমবর্তিত আলোকে রূপান্তরণের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- যে কোন আলোকে বিশ্লেষণ করে তার সমবর্তনীয় প্রকৃতি কীভাবে নিরূপণ করা যায় তা বিবৃত করতে পারবেন।

9.2 সমবর্তন কাকে বলে?

আপনি আগেই জেনেছেন যে আলোক তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ। আলোকতরঙ্গের প্রকৃতি অনুপ্রস্থ। অর্থাৎ কম্পনশীল তড়িৎক্ষেত্র $(\vec{E})$ এবং চৌম্বকক্ষেত্র $(\vec{B})$ ভেক্টরদুটি তরঙ্গের গতিপথের সঙ্গে অভিলম্বে থাকে।

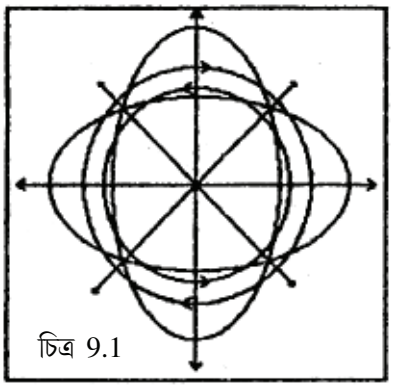

চিত্র 9.1

এই ভেক্টরদুটি নিজেরাও পরস্পর সমকোণে থাকে। আলোকের উৎস অগণিত অনু-পরমাণু দিয়ে গঠিত এবং সেগুলি পৃথক পৃথক অসম্পর্কিত উৎস হিসাবে কাজ করে। এই উৎসগুলি থেকে বিকীর্ণ আলোতে কম্পনশীল তড়িৎক্ষেত্র ক্ষণে ক্ষণে দিক পরিবর্তন করে। ফলে পরীক্ষার দ্বারা এই তরঙ্গের অনুপ্রস্থ চরিত্র বোঝা যায় না। এজন্য সাধারণ উৎস থেকে নির্গত আলোকে অসমবর্তিত (unpolarised) বলা হয়। আপনি যদি একটি অসমবর্তিত আলোকরশ্মির তড়িৎক্ষেত্রটিকে সামনে থেকে পর্যবেক্ষণ করতে পারতেন তবে লক্ষ্য করতেন যে তড়িতীয় ভেক্টরের প্রান্তবিন্দুটি কখনও একটি উপবৃত্ত, কখনও বৃত্ত আবার কখনও একটি সরলরেখা রচনা করছে। 9.1 চিত্রে আপনি প্রান্তবিন্দুটির কয়েকটি পথরেখা দেখতে পারেন।

নানাপ্রকার ভৌত উপায়ে অসমবর্তিত আলোকের তড়িৎক্ষেত্রের উপর কিছু শর্ত আরোপ করে ঐ আলোকে সমবর্তিত আলোকে রূপান্তরিত করা যায়। দেখা যাক কতভাবে তড়িৎক্ষেত্রটির উপর শর্ত আরোপ করা যায়।

(ক) তড়িৎক্ষেত্রটি যদি একটি নির্দিষ্ট তলে আবদ্ধ থাকে তবে আলোকরশ্মির গতপথের অভিলম্ব তলে তড়িৎক্ষেত্র ভেক্টরের প্রান্তবিন্দুটিকে সর্বদাই একটি নির্দিষ্ট সরলরেখায় থাকতে দেখা যাবে। 9.2(a) ও (b) চিত্রে আপনি এই অবস্থাটি দেখতে পাবেন। এখানে Z-অক্ষ বরাবর সঞ্চরমান তরঙ্গে কোন মুহূর্তে তড়িতীয় ভেক্টরের প্রান্তবিন্দুগুলি যে বক্ররেখার উপর থাকে সেটিকেই দেখানে হয়েছে। আলোকরশ্মিটির এখন

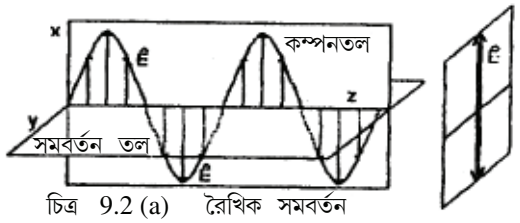

চিত্র 9.2 (a) রৈখিক সমবর্তন

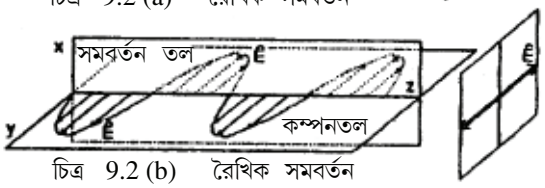

চিত্র 9.2 (b) রৈখিক সমবর্তন

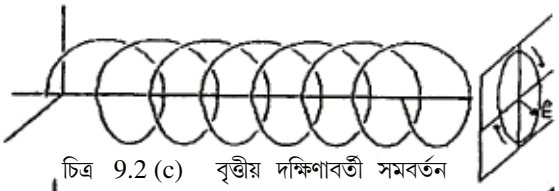

চিত্র 9.2 (c) বৃত্তীয় দক্ষিণাবর্তী সমবর্তন

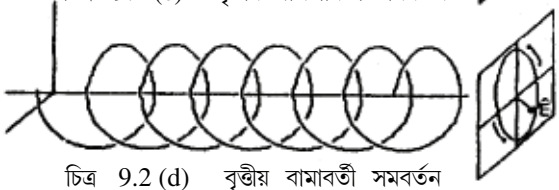

চিত্র 9.2 (d) বৃত্তীয় বামাবর্তী সমবর্তন

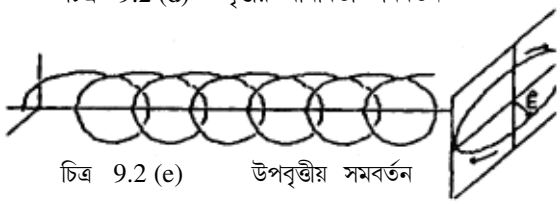

চিত্র 9.2 (e) উপবৃত্তীয় সমবর্তন

রৈখিক সমবর্তন (linear polarization) ঘটেছে বলা হয়। তড়িৎক্ষেত্র যে তলে আবদ্ধ থাকে তাকে কম্পনতল (plane of vibration) এবং তার লম্বতলকে সমবর্তন তল (plane of polarization) বলা হয়।

(খ) তড়িতীয় ভেক্টরের প্রান্তবিন্দুটি যদি একটি বৃত্ত রচনা করে তবে আলোকরশ্মির সমবর্তনকে বৃত্তীয় (circular) বলা হয়। বৃত্তীয় সমবর্তনের ক্ষেত্রে দর্শক উৎসের দিকে তাকালে তিনি যদি তড়িতীয় ভেক্টরকে ঘড়ির কাঁটার মত ঘুরতে দেখেন, তবে ঐ আলোকের দক্ষিণাবর্তী বৃত্তীয় (right circular) ও ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে ঘুরতে দেখলে বামাবর্তী বৃত্তীয় (left circular) সমবর্তন ঘটেছে বলে ধরা হয়। 9.2 (c) ও (d) চিত্র দুটিতে এই দুই অবস্থা দেখতে পাবেন।

(গ) প্রান্তবিন্দুর পথরেখাটি সরলরেখা বা বৃত্ত না হয়ে একটি উপবৃত্তও হতে পারে। 9.2(e) চিত্রে এই অবস্থাটি দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে আলোকের সমবর্তনকে আমরা উপবৃত্তীয় (elliptical) বলি।

সমবর্তিত তরঙ্গের রূপটি বোঝার জন্য আপনি একটি সহজ পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। একটি লম্বা মোটা দড়ির একপ্রান্ত হাতে ধরে অন্য প্রান্তটি ঝুলিয়ে দিন। আপনাকে এর জন্য সিঁড়িতে বা বারান্দায় দাঁড়াতে হতে পারে। এবার দড়ির উপরের প্রান্তটি দ্রুত ডাইনে বাঁয়ে আন্দোলিত করলে দড়িটি বেয়ে উপর থেকে নীচে রৈখিকভাবে সমবর্তিত তরঙ্গ যেতে দেখবেন।

এবার আমরা দেখব সমবর্তিত আলোকতরঙ্গকে কীভাবে গাণিতিক রূপে প্রকাশ করা যায়।

9.3 সমবর্তিত তরঙ্গের গাণিতিক রূপ

ধরে নিন একটি আলোকতরঙ্গ সমকোণী কার্টেজীয় নির্দেশতন্ত্রে z-অক্ষ বরাবর অগ্রসর হচ্ছে। তরঙ্গের তড়িৎক্ষেত্রটি অনুপ্রস্থ হওয়ায় সেটি x-y তলে আবদ্ধ থাকবে। তবে কোন z-উপাংশ থাকবে না। তড়িৎক্ষেত্রের x-y উপাংশগুলি লেখা যায় ঃ

$E_x(z, t) = a \cos(kz - \omega t)$ 9.1

ও $Ey(z, t) = b\cos(kz - \omega t + \varphi)$ 9.2

লক্ষ্য করুন E_x ও E_y দুটির রাশিমালাই $+z$ দিকে সঞ্চারিত তরঙ্গ বোঝাচ্ছে। উভয়ের ক্ষেত্রেই কম্পাঙ্ক $v = \omega/2\pi$ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য $\lambda = 2\pi/k$, অর্থাৎ আমরা একবর্ণী আলোর তরঙ্গই বিবেচনা করছি যার বেগ $v = v\lambda = \omega/2\pi \times 2\pi/k = \omega/k$ ......9.3 তবে তড়িৎক্ষেত্রের উপাংশদুটির বিস্তার a ও b ভিন্ন এবং তাদের মধ্যে দশার প্রভেদ φ। এখন আমরা দেখব a, b ও φ এর বিভিন্ন মানের জন্য যে কোন x-y তলে $\vec{E}$ ভেক্টরটি কী ধরণের লেখ রচনা করে।

(i) $\phi = 0$;

এক্ষেত্রে $E_y / E_x = b/a$ অর্থাৎ $\hat{E}$ ভেক্টরটি এমন একটি সরলরেখায় থাকবে যেটি x অক্ষের সঙ্গে $\tan^{-1}\frac{b}{a}$ কোণ রচনা করে। সহজেই বোঝা যায় যে আলোকরশ্মিটি এক্ষেত্রে রৈখিকভাবে সমবর্তিত হয়েছে (চিত্র 9.3 (a))। ϕ এর মান π এর যুগ্ম গুণিতক, অর্থাৎ $2n\pi$ (n = পূর্ণসংখ্যা) হলে সমবর্তনের প্রকৃতি একই থাকে।

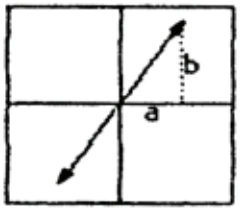

চিত্র **9.3 (a)**

তবে $\varphi = (2n+1)\pi$ হলে $E_y = -b\cos(k_z - \omega t)$ হবে। সেক্ষেত্রে $E_y / E_x = -b/a$। অর্থাৎ $\hat{E}$ ভেক্টরের রেখা x অক্ষের সঙ্গে $-\tan^{-1}\frac{b}{a}$ কোণে আনত থাকবে।

(ii) $\varphi = 90^0$; $a = b$;

অর্থাৎ $E_y(z,t) = -b\sin(k_z - \omega t) = -a\sin(k_z - \omega t)$ 9.4

9.1, 9.4 সমীকরণ দুটির মধ্যে সময় t কে অপনয়ন করলে,

$E_x^2 + E_y^2 = a^2$

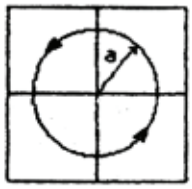

চিত্র **9.3 (b)**

এই সমীকরণটি আপনি নিশ্চই a ব্যাসার্ধের বৃত্তের সমীকরণ বলে চিনতে পারছেন। অর্থাৎ $\hat{E}$ ভেক্টরের প্রান্ত বিন্দুটি এক্ষেত্রে বৃত্ত রচনা করছে এবং আলোকরশ্মির বৃত্তীয় সমাবর্তন ঘটেছে (চিত্র 9.3 (b))

এখন প্রশ্ন, 9.1 ও 9.2 সমীকরণ দুটি যে বৃত্তীয় সমবর্তন নির্দেশ করছে তা দক্ষিণাবর্তী না বামাবর্তী? এটি গাণিতিকভাবে নির্ণয় করা যাক।

আমরা লিখতে পারি : $\hat{E} = \hat{i}E_x + \hat{j}E_y = \hat{i}a\cos(k_z - \omega t) - \hat{j}a\sin(k_z - \omega t)$

সুতরাং $\frac{d}{dt}\hat{E} = \hat{i}a\omega\sin(k_z - \omega t) + \hat{j}a\omega\cos(k_z - \omega t)$

এবং $\hat{E} \times \frac{d}{dt}\hat{E} = \hat{k}\,a^2\omega\left[\cos^2(k_z - \omega t) + \sin^2(k_z - \omega t)\right] = \hat{K}a^2\omega$

(এখানে আমরা $\hat{i}\times\hat{i} = \hat{j}\times\hat{j} = 0,$ এবং $\hat{i}\times\hat{j} = -\hat{j}\times\hat{i} = \hat{k},$ নিয়মগুলি ব্যবহার করেছি।)

লক্ষ্য করুণ $\therefore E\times\frac{d}{dt}\hat{E}$ ক্রস গুণফলটি $\hat{k}$ অর্থাৎ z অক্ষ অভিমুখী। এর অর্থ $\hat{E}$ ভেক্টরটি x অক্ষ থেকে y অক্ষের দিকে ঘুরে যাচ্ছে এবং আলোকের বামাবর্তী সমাবর্তন ঘটেছে। আপনি $\varphi = -90^\circ$ ধরে দেখাতে পারেন যে সেক্ষেত্রে আলোক রশ্মির সমবর্তন বৃত্তীয় এবং দক্ষিণাবর্তী হবে।

(iii) $\varphi = 90^\circ, a \neq b;$

এক্ষেত্রে 9.4 সমীকরণের পরিবর্তে আমরা পাই

$$E_y(z,t) = -b\sin(kz - \omega t) \quad \text{..... 9.5}$$

9.1 ও 9.5 সমীকরণ থেকে পাওয়া যায়

$$E_x^2/a^2 + E_y^2/b^2 = 1$$

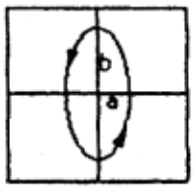

চিত্র **9.3 (c)**

যেটি একটি উপবৃত্তের সমীকরণ। a ও b এই উপবৃত্তের দুই অর্ধাক্ষ । এক্ষেত্রে সমবর্তনটি উপবৃত্তীয় এবং তার প্রকৃতি বামাবর্তী। **চিত্র** 9.3 ।

iv) ϕ এর মান অনির্দিষ্ট, $a \neq b$ ।

এখন আমরা 9.1 ও 9.2 সমীকরণ থেকে সরাসরি t কে অপনীত করব। ধরে নেওয়া যাক $z = 0$।

$$\therefore E_x = a\cos\omega t$$
$$E_y = b\cos(\omega t - \varphi) = b[\cos\omega t\cos\varphi + \sin\omega t\sin\varphi]$$

$$= \frac{E_x}{a}b\cos\varphi + \sqrt{1 - \left(\frac{E_x}{a}\right)^2}\,b\sin\varphi$$

$$\therefore \left[E_y - \frac{E_x}{a} b\cos\varphi\right]^2 = \left[1 - \left(\frac{E_x}{a}\right)^2\right] b^2 \sin^2\varphi$$

বা সরল ক'রে $\frac{E_x^2}{a^2} + \frac{E_y^2}{b^2} - 2\frac{E_x E_y}{ab}\cos\varphi = \sin^2\varphi$ 9.6

9.6 সমীকরণটির লেখচিত্র কেমন হবে বলে আপনার মনে হয়? এটি আসলে একটি উপবৃত্তের সমীকরণ, যার অক্ষগুলি x ও y অক্ষের সঙ্গে একটি কোণে আনত রয়েছে। এই কোণটি যদি θ হয়, তবে

$$\tan 2\theta = \frac{2ab\cos\theta}{a^2 - b^2}$$ 9.7

9.3 (d) চিত্র থেকে আপনি লেখচিত্রের চরিত্রটি বুঝতে পারবেন।

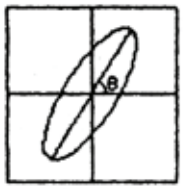

চিত্র 9.3(d)

বিভিন্ন ধরণের সমবর্তিত আলোকের গাণিতিক রূপগুলি জানতে পারলেন। এবার একটি সহজ অনুশীলনীর উত্তর দিন।

অনুশীলনী 1. ধরা যাক x ও y অক্ষ বরাবর তড়িৎক্ষেত্রের উপাংশগুলি যথাক্রমে $E_x = E_0 \sin(\omega t + k_z)$, $E_y = E_0 \cos(\omega t + k_z)$ আলোক তরঙ্গের সমবর্তন কী ধরণের হবে?

9.4 রৈখিকভাবে সমবর্তিত আলোক উৎপাদনের পদ্ধতি

যে কোন সাধারণ উৎস থেকে আমরা যে আলো পাই তা অসমবর্তিত আলো। সমবর্তিত আলোক উৎপাদন করতে হলে প্রথমে অসমবর্তিত আলোকরশ্মিকে রৈখিকভাবে সমবর্তিত রশ্মিতে রূপান্তরিত করতে হয়। এজন্য একটি নির্দিষ্ট তলে আলোকরশ্মির তড়িৎক্ষেত্রকে অপরিবর্তিত রেখে তড়িৎক্ষেত্রের অভিলম্ব উপাংশটিকে কোন উপায়ে শোষিত বা বিচ্যুত করতে হয়। রৈখিকভাবে সমবর্তিত রশ্মিকে সহজেই বৃত্তীয় বা উপবৃত্তীয়ভাবে সমবর্তিত রশ্মিতে রূপান্তরিত করা যায়। আগের অনুচ্ছেদের (i) অংশে আপনি দেখেছেন যে রৈখিক সমবর্তনের ক্ষেত্রে তড়িৎক্ষেত্রের দুই বাষ্পনশীল উপাংশের মধ্যে যে দশা প্রভেদ থাকে তা π এর গুণিতক হয়। এই দুই উপাংশের মধ্যে একটি বাড়তি দশাপ্রভেদ সৃষ্টি করে আলোকরশ্মির রৈখিক সমবর্তনকে বৃত্তীয় বা উপবৃত্তীয় সমবর্তনে পরিণত করা যায়।

আমরা এই অনুচ্ছেদের রৈখিক সমবতর্ন উৎপাদনের পদ্ধতিগুলি আলোচনা করব। অসমবর্তিত আলোকে রৈখিকভাবে সমবর্তিত করতে প্রধানত তিনটি উপায় অবলম্বন করা যায়। এগুলি হল ঃ

- প্রতিফলনের দ্বারা
- দ্বৈধ প্রতিসরনের (double refraction) দ্বারা,
- দ্বিবর্ণী (dichroic) কেলাসের সাহায্যে।

দেখা যাক এই তিনটি পদ্ধতির মূলনীতিগুলি কি।

9.4.1 প্রতিফলনের দ্বারা রৈখিক সমবর্তন ঃ

ধরা যাক অসমবর্তিত আলোর একটি রশ্মি বায়ু থেকে n প্রতিসরাঙ্কের একটি অন্তরক (dielectric) পদার্থের উপর আপতিত হল (চিত্র 9.4)। চিত্রে θ এবং φ যথাক্রমে আপতন কোণ ও প্রতিসরণ কোণ। আপতন তলে এবং তার অভিলম্ব দিকে আপতিত রশ্মির তড়িৎক্ষেত্রের উপাংশগুলি গড়ে সমমান বলে ধরা যায়। প্রতিফলিত রশ্মির ক্ষেত্রে একথা বলা যায় না। তড়িৎক্ষেত্রের দুই উপাংশের জন্যই অন্তরক পদার্থের প্রতিফলন গুণাঙ্ক, অর্থাৎ আপতিত তীব্রতার কত অংশ প্রতিফলিত হয়, সেটি আপতন কোণের উপর নির্ভর করে।

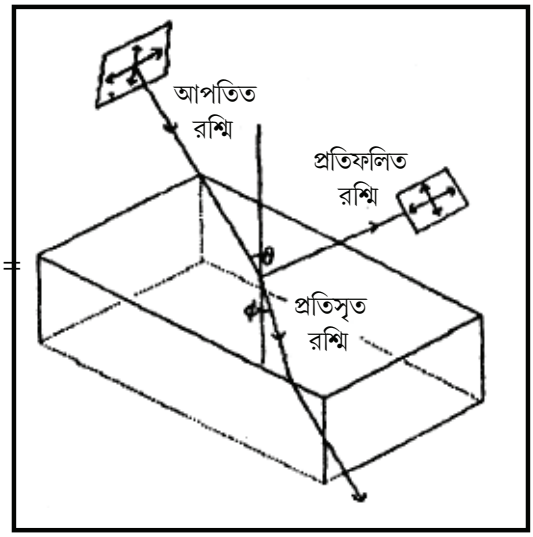

চিত্র 9.4

ব্রুস্টারের সূত্র অনুযায়ী আপতন কোণের ট্যানজেন্ট যখন প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে অন্তরক পদার্থের প্রতিসরাঙ্কের সমান হয় তখনই প্রতিফলিত রশ্মির রৈখিক সমবর্তন সম্পূর্ণ হয়। আপনি হয়ত এর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাটি জানতে চাইবেন।

তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের তত্ত্ব থেকে গাণিতিকভাবে দেখানো যায় যে আপতন তলের অভিলম্বে ও সমান্তরালে তড়িৎক্ষেত্রের দুই উপাংশের যে অংশগুলি (r) প্রতিফলিত হয় সেগুলি হল ঃ

সমান্তরাল উপাংশেরক্ষেত্রে ..... 9.8 (a)

এবং অভিলম্ব উপাংশের ক্ষেত্রে ..... 9.8 (b)

প্রতিফলিত তীব্রতা ও আপতিত তীব্রতার অনুপাতকে আমরা প্রতিফলন গুণাঙ্ক বলি। এই রাশিটির মান 9.8 (a) ও (b)-এর রাশিদুটির বর্গের সমান অর্থাৎ সমান্তরাল উপাংশের প্রতিফলন গুণাঙ্ক

..... 9.9(a)

এবং অভিলম্ব উপাংশের প্রতিফলন গুণাঙ্ক $\rho_1 = r_1^2 \left(\frac{\cos\theta - n\cos\varphi}{\cos\theta + n\cos\varphi}\right)^2$ .....9.9 (b) বলি।

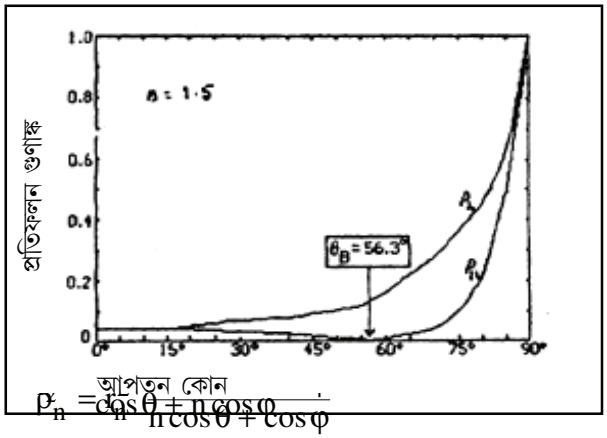

9.5 চিত্রে লেখচিত্রের সাহায্যে আপতন কোণের সঙ্গে তড়িৎক্ষেত্রের আপতন তলের অভিলম্ব উপাংশ ও সমান্তরাল উপাংশর প্রতিফলন গুণাঙ্কের পরিবর্তন দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র থেকে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে অভিলম্ব উপাংশের জন্য প্রতিফলন গুণাঙ্কটি আপতন কোণের সঙ্গে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেলেও, সমান্তরাল উপাংশের প্রতিফলন গুণাঙ্ক $\rho_n = \frac{\cos\theta + n\cos\varphi}{n\cos\theta + \cos\varphi}$. কোনও একটি নির্দিষ্ট আপতন কোণে শূন্য হয়ে যায়। এই বিশেষ আপতন কোণের মানটি আপনি নির্ণয় করতে পারেন কি?

9.9(a) সূত্র থেকে দেখা যায়

যদি $n\cos\theta = \cos\varphi$ হয় তবে $\rho n = \theta$ হয়।

স্নেলের সূত্র থেকে, $\sin\theta = n\sin\varphi$

$\therefore n\cos\theta\sin\theta = \cos\varphi.n\sin\varphi.$

বা $\sin 2\theta = \sin 2\varphi$

যেহেতু θ ও φ কোণ দুটি অসমান এবং এক সমকোণ অপেক্ষা বড় নয়। $2\theta = \pi - 2\varphi$, বা

$\theta + \varphi = \frac{\pi}{2}$। এর অর্থ যখন প্রতিফলিত ও প্রতিসৃত রশ্মি দুটি পরস্পর সমকোণে থাকে তখনই প্রতিফলিত রশ্মিতে কেবলমাত্র অভিলম্ব উপাংশটি উপস্থিত থাকে।

এই অবস্থায় $\sin\theta = n\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = n\cos\theta$, বা, $\tan\theta = n$

$\therefore \theta = \tan^{-1} n$

আপতন কোণ θএর এই বিশেষ মানের জন্য প্রতিফলিত রশ্মিটি সম্পূর্ণ রৈখিকভাবে সমবর্তিত হয়। এটিই ব্রুস্টারের সূত্র। এখানে আপতন তলটিই হয় সমবর্তন তল এবং কম্পনতল. সেটির সঙ্গে অভিলম্বভাবে থাকে।

9.10 সূত্রের $\tan^{-1} n$ কোণটিকে ব্রুস্টার কোণ θ_B (Breuster angle) বলা হয়। 9.5 চিত্রে n=1.5 ধরা হয়েছে। এখানে ব্রুস্টার কোণ $\theta_B = \tan^{-1} 1.5 = 56.3^0$ এবং এই আপতন কোণে $\rho_{\parallel}$ এর মান শূন্য হয়েছে।

এতক্ষণ আমরা প্রতিফলিত রশ্মির সমবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। ব্রুস্টার কোণে আপতনের ফলে আলোকরশ্মির প্রতিসৃত অংশেরও আংশিক রৈখিক সমবর্তন ঘটে কেননা প্রতিসৃত রশ্মিতে আপতন তলের সমান্তরাল তড়িৎক্ষেত্র অভিলম্ব তড়িৎক্ষেত্রের তুলনায় বেশী থাকে। লক্ষণীয় বিষয় এই, যে একটি সমান্তরাল অন্তরক পাতের উপর কোন আলোকরশ্মি ব্রুস্টার কোণে আপতিত হলে আপতন কোণের সাইনের মান হয় $\sin\theta_B = \sin\left(\tan^{-1} n\right) = \frac{n}{\sqrt{1+n^2}}$

তখন প্রতিসরণ কোণ θ_B হলে, $\sin\theta_B = \frac{1}{n}\sin\theta_B = \frac{1}{\sqrt{1+n^2}}$

অর্থাৎ, $\tan\varphi_B = \frac{1}{n}$ 9.11

প্রতিসৃত রশ্মিটি অন্তরক পাতের পিছনের তলে φ_B কোণে আপতিত হবে (চিত্র 8.6) এবং 8.11 সূত্র অনুযায়ী এই আপতন কোণ অন্তরক পদার্থ থেকে বায়ুতে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ব্রুস্টার কোণের

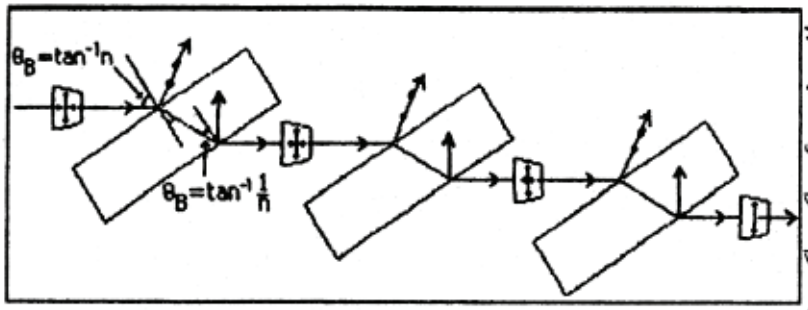

চিত্র 9.6

সমান। সুতরাং প্রতিফলিত রশ্মিটি পুনরায় রৈখিকভাবে সমবর্তিত হবে এবং প্রতিসৃত রশ্মিটি আরও বেশী অনুপাতে আপতন তলের সমান্তরাল তড়িৎক্ষেত্রে সমৃদ্ধ হয়ে অন্তরক পাত থেকে নির্গত হবে। এইভাবে রশ্মিটি পরপর কয়েকটি অন্তরক পাতের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর প্রায় সম্পূর্ণরূপে রৈখিকভাবে সমবর্তিত রশ্মিতে পরিণত হয়।

9.4.2 দ্বৈধ প্রতিসরণের দ্বারা রৈখিক সমবর্তন

আপনি বায়ু, জল, কাঁচ প্রভৃতি যে সব স্বচ্ছ পদার্থের সঙ্গে বেশী পরিচিত সেগুলির উপর একটি রশ্মি আপতিত হলে একটিমাত্র প্রতিসৃত রশ্মি উৎপন্ন হয়। ক্যালসাইট, কোয়ার্স প্রভৃতি কোন কোন কেলাসের উপর অসমবর্তিত আলোকরশ্মি আপতিত হলে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি অবস্থায় সৃষ্টি হয়। এর বৈশিষ্ট্যগুলি আগে দেখে নেওয়া যাক।

● আপতিত আলোকরশ্মিটি কেলাসের মধ্যে সাধারণভাবে দুটি প্রতিসৃত রশ্মিতে বিভক্ত হয় এবং রশ্মিদুটির পৃথক ও সুনির্দিষ্ট চরিত্র থাকে (চিত্র 9.7)।

● দুটি রশ্মির একটি সবদিকে সমগতিবেগে সঞ্চারিত হলেও অন্যটির বেগ সঞ্চরণের দিকের উপর নির্ভর করে। অবশ্য কেলাসের মধ্যে এমন একটি দিক থাকে, যে দিক বরাবর দুই রশ্মি একই বেগে চলে। এই দিকটিকে কেলাসের আলোকীয় অক্ষ (optic axis) বলা হয়। যে কোন বিন্দু থেকে উৎপন্ন দুটি তরঙ্গমুখের একটি গোলকাকৃতি এবং অন্যটি উপগোলকাকৃতি (spheroidal) হয়। দুটি তরঙ্গমুখ আলোকীয় অক্ষের দিকে পরস্পরকে স্পর্শ করে। গোলকাকৃতি তরঙ্গমুখের রশ্মিটিকে সাধারণ রশ্মি (ordinary ray) এবং অন্যটিকে অসাধারণ রশ্মি (extraordinary ray) বলা হয়।

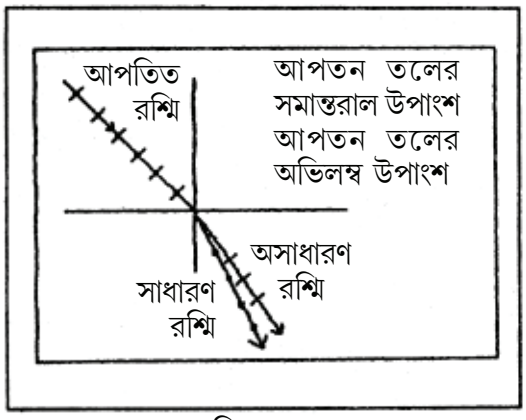

চিত্র 9.7

● সাধারণ ও অসাধারণ দুই রশ্মিই সম্পূর্ণ রৈখিকভাবে সমবর্তিত হয়। সাধারণ রশ্মিটিতে কম্পনশীল

তড়িৎক্ষেত্রটি আপতন তলের অভিলম্বে থাকে এবং অসাধারণ রশ্মিটিতে তড়িৎক্ষেত্রটি আপতন তলের সমান্তরাল থাকে।

- অসাধারণ রশ্মির ক্ষেত্রে সাধারণভাবে শক্তির প্রবাহ তরঙ্গমুখের অভিলম্ব দিকে হয় না।

9.7 চিত্র থেকে সাধারণ ও অসাধারণ রশ্মির এই ধর্মগুলি বোঝা যাবে। ক্যালসাইট বা কোয়ার্জ কেলাসে একটিমাত্র আলোকীয় অক্ষ থাকে তাই এ জাতীয় কেলাসকে একাক্ষ (uniaxial) কেলাস বলা হয়। অভ্র (muscoite), পটাসিয়াম নাইট্রেট প্রভৃতি কোন কোন কেলাসে দুটি আলোকীয় অক্ষ থাকে, অর্থাৎ কেলাসের মধ্যে এমন দুটি দিক থাকে যে দিকে সাধারণ ও সাধারণ রশ্মি একই বেগে চলে। এ ধরণের দ্বি-অক্ষ (biaxial) কেলাসে আলোর প্রতিসরণ অপেক্ষাকৃত জটিল এবং এটি আমরা আলোচনার বাইরে রাখব। আসুন এবার দ্বৈধ প্রতিসরণকে কীভাবে রৈখিক সমবর্তন ঘটনোর কাজে লাগানো যায় সেটি দেখা যাক।

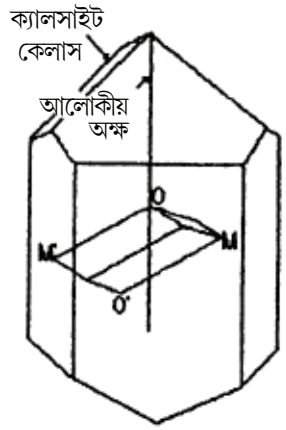

চিত্র 9.8.(a)

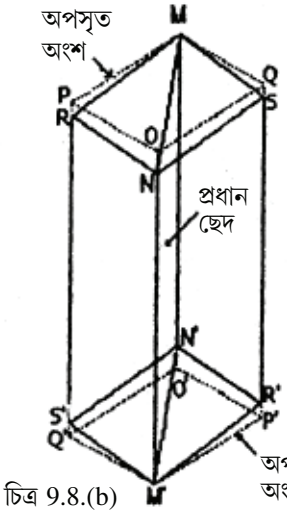

চিত্র 9.8.(b)

চিত্র 9.8.(c)

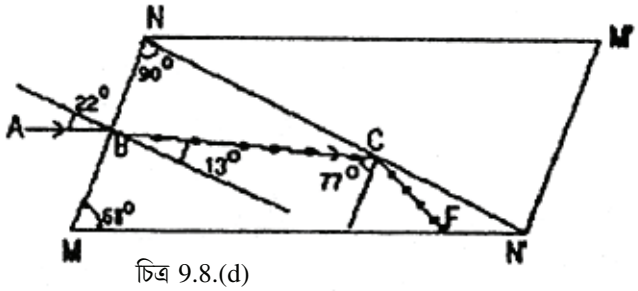

চিত্র 9.8.(d)

নিকল প্রিজম : স্কটল্যান্ডের বিজ্ঞানী নিকল (William Nicol) 1828 সালে ক্যালসাইট কেলাস থেকে নিকল প্রিজম্ তৈরী করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এটির সাহায্যে আপনি অসমবর্তিত আলো থেকে সম্পূর্ণ রৈখিকভাবে সমবর্তিত আলো পেতে পারেন। এর নির্মাণ প্রণালী ও গঠন 9.8(a-d) চিত্রে দেখানো হয়েছে। নিকল প্রিজম্ তৈরী করতে হলে প্রথমে ক্যালসাইটের একটি স্বচ্ছ কেলাস থেকে প্রস্থের তিনগুণ দীর্ঘ একটি রম্বোহেড্রন (rhombohedron) আকৃতির খন্ড কেটে নেওয়া

হয় (চিত্র 9.8.a)। রম্বোহেড্রনের দুটি বিপরীত শীর্ষবিন্দু, 0 এবং 0′ পাওয়া যায় যেগুলির সন্নিহিত তিনটি কোণই স্থূলকোণ। এ দুটির মধ্য দিয়ে রম্বাস তলের সঙ্গে অভিলম্ব যে তলটি কল্পনা করা যায় (OMO′M′) সেটিকে আমরা কেলাসের প্রধান ছেদ (principal section) বলি। প্রধান ছেদটি আকৃতিতে একটি সামান্তরিক, যার $\angle OMO'$ ও $\angle OM'O'$ কোণদুটির মান 71°। কেলাসটির OPMQ এবং O′P′M′Q′ তলদুটিকে (চিত্র 9.8) ঘর্ষণের দ্বারা কেলাসের কিছু অংশ অপসৃত করা হয়, যাতে NRMS এবং N′R′M′S′ তলদুটি হয় কেলাসের নূতন প্রান্ততল এবং প্রধান ছেদের $\angle NMN'$ ও $\angle NM'N'$ কোণগুলি হয় 68°। এর ফলে NM ও N′M′ বাহুগুলি প্রধান ছেদের NN′ কর্ণের সঙ্গে সমকোণে থাকে। এবার কেলাসটিকে প্রধান ছেদের সঙ্গে লম্বভাবে NN′ কর্ণের মধ্য দিয়ে যাওয়া তল বরাবর কাটা হয় এবং দুটি খন্ডের মধ্যে ক্যানাডা বালসাম আঠার স্তর দিয়ে দুটিকে আবার জুড়ে দেওয়া হয়। প্রান্ততল ব্যতীত অন্য তলগুলিতে কালো রং মাখানো হয় যাতে সেগুলি যে কোন আপতিত আলো সম্পূর্ণ শোষণ করতে পারে। নিকল প্রিজ্‌মটি এখন ব্যবহারের জন্য তৈরী।

9.8 (d) চিত্র থেকে আপনি নিকল প্রিজমের কার্যপদ্ধতি বুঝতে পারবেন। এখানে অসমবর্তিত আলোকরশ্মি AB প্রিজমের NM′ বা N′M প্রান্তগুলির সমান্তরালে NM তলে আপতিত হয়েছে। দ্বৈধ প্রতিসরণের ফলে কেলাসের মধ্যে রশ্মিটি সাধারণ রশ্মি BC এবং অসাধারণ রশ্মি BD তে বিভক্ত হয়ে যায়। সোডিয়ামের হলুদ আলোর ক্ষেত্রে ক্যালসাইট ও ক্যানাডা বালসাম আঠার প্রতিসরাঙ্কগুলি হল ঃ

ক্যালসাইটের প্রতিসরাঙ্ক (সাধারণ রশ্মি) $\mu_0 = 1{\cdot}65836$

ক্যালসাইটের প্রতিসরাঙ্ক (অসাধারণ রশ্মি BD দিকে), $\mu_e = 1{\cdot}48641$

ক্যানাডা বালসাম আঠার প্রতিসরাঙ্ক, $\mu_c = 1{\cdot}55$

অসাধারণ রশ্মির ক্ষেত্রে ক্যালসাইটের প্রতিসরাঙ্ক ক্যানাডা বালসাম আঠার তুলনায় কম হওয়ায় ঐ রশ্মিটি সোজাসুজি N′M′ প্রান্ততলের মধ্য দিয়ে আপতিত রশ্মির সমান্তরালে DE বরাবর নির্গত হয়। কিন্তু সাধারণ রশ্মির ক্ষেত্রে একটি ভিন্ন ঘটনা ঘটে। এই রশ্মির জন্য ক্যালসাইট ও ক্যানাডা বালসাসের মধ্যবর্তী তলে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের জন্য সঙ্কট কোন $\sin^{-1}(1.55/1.65836) = 69°$।

কিন্তু ক্যালসাইটের প্রান্ততলে এই রশ্মির আপতন কোণ $= 90°-68° = 22°$। $\therefore$ প্রতিসরণ কোণ $= \sin^{-1}(\sin 22°/1{\cdot}65836) = \sin^{-1} 0{\cdot}225 = 13°$

সুতরাং ক্যানাডা বালসাম স্তরে সাধারণ রশ্মির আপতন কোণ $= 90° - 13° = 77°$

যেটি সঙ্কট কোণ $69°$ এর চেয়ে বড়। এর ফলে পূর্ণ প্রতিফলিত CF রশ্মিটি পূর্বের পথ থেকে বিচ্যুত হয় এবং প্রিজমের কালো রঙের তলে শোষিত হয় (চিত্র 9.8 (e)। অন্যদিকে নির্গত রশ্মিটি কেবলমাত্র অসাধারণ রশ্মি দ্বারা গঠিত হওয়ায় সম্পূর্ণ রৈখিকভাবে সমবর্তিত হয়।

আপতিত রশ্মি AB এর আপতন কোনটি $22°$ থেকে $14°$ পর্যন্ত কমবেশী হলেও নিকল প্রিজমটি ঠিকমত কাজ করতে পারে। তবে আপতন কোণ $36°$ এর চেয়ে বেশী হলে সাধারণ রশ্মির পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটে না, সেটিও প্রিজম্ থেকে সোজাসুজি নির্গত হয়। আবার আপতন কোণ $8°$ অপেক্ষা কম হলে অসাধারণ রশ্মির দিক বরাবর ক্যালসাইটের প্রতিসরাঙ্ক এত বৃদ্ধি পায় যে অসাধারণ রশ্মিটিরও পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটে।

মোটের উপর, দ্বৈধ প্রতিসরণের উপর নির্ভরশীল নিকল প্রিজম বিশুদ্ধ রৈখিক সমবর্তন সৃষ্টির একটি কার্যকরী ব্যবস্থা। তবে এটির কাচামাপ, অর্থাৎ উপযুক্ত মাপের নিখুঁত ক্যালসাইট কেলাস কিছুটা দুর্লভ এবং এটির নির্মান পদ্ধতিও বেশ দুরূহ। যার ফলে নিকল প্রিজমের মূল্যও বেশী। এবার আমরা রৈখিক সমবর্তন উৎপাদনের একটি অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুলভ পদ্ধতি বর্ণনা করব।

9.4.3 দ্বিবর্ণী (dichrioc) কেলাসের সাহায্যে রৈখিক সমবর্তন

দ্বিবর্ণী কেলাসের বৈশিষ্ট্য এই যে এগুলিতে যে শুধু দ্বৈধ প্রতিসরণ ঘটে তাই নয়, পরস্পর সমকোণে কম্পনতল বিশিষ্ট দুটি রশ্মির একটি অন্যটির তুলনায় অনেক বেশী মাত্রায় শোষিত হয়। টুরম্যালিন (tourmaline) এ জাতীয় একটি কেলাস। ধরুন এই কেলাসের একটি পাত এমনভাবে কেটে নেওয়া হল যাতে কেলাসের আলোকীয় অক্ষ প্রান্ততলে থাকে। এবার অসমবর্তিত আলোর একটি রশ্মি ঐ তলে লম্বভাবে আপতিত হলে রশ্মিটি সাধারণ ও অসাধারণ রশ্মিতে ভেঙে যাবে, যদিও দুটি রশ্মিই সোজাসুজি একই পথে চলতে থাকবে (চিত্র 9.9)। আপতিত রশ্মি ও আলোকীয় অক্ষের মধ্য দিয়ে একটি সমতল কল্পনা

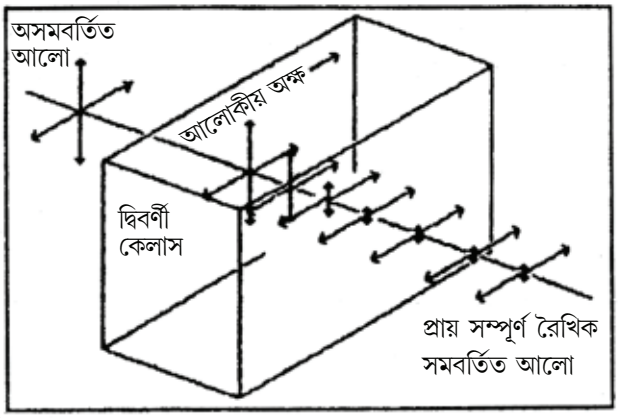

করলে সাধারণ রশ্মির তড়িৎক্ষেত্র তার অভিলম্ব বরাবর এবং অসাধারণ রশ্মির তড়িৎক্ষেত্র তার সমান্তরালে থাকবে। কেলাসটির মধ্যে সাধারণ রশ্মিটি অসাধারণ রশ্মির তুলনায় অনেক দ্রুত শোষিত হয়। পাতের বেধটি ঠিকমত নির্বাচন করলে কেলাস থেকে নির্গত আলো প্রায় সম্পূর্ণ রৈখিকভাবে সমবর্তিত হয়। টুরম্যালিন কেলাসের মধ্য দিয়ে নির্গত আলোর রং সবুজ, কেননা অন্য রংগুলি এই কেলাসে শোষিত হয়। এজন্য সমবর্তন হিসাবে টুরম্যালিন কেলাস বিশেষ ব্যবহৃত হয় না। অপর পক্ষে রৈখিকভাবে সমবর্তিত সাদা আলোয় কেলাসটি ধরলে কেলাসের আলোকীয় অক্ষের দিক অনুযায়ী সেটিকে কখনও সবুজ, কখনও কালো দেখায়, যার জন্য এটিকে দ্বিবর্ণী বলা হয়।

দ্বিবর্ণী কেলাসের এই ধর্মটি পোলারয়েড (polaroid) নামের সমবর্তক পাত তৈরী করতে ব্যবহৃত হয়। হেরাপ্যাথাইট (herapathite) নামের একটি রাসায়নিক বস্তুর মধ্যে দ্বিবর্ণী কেলাসের ধর্ম দেখতে পাওয়া যায়। এটির রাসায়নিক নাম কুইনাইন সালফেট পেরিআয়োডাইড। এর কেলাসগুলি আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র হওয়ায় এগুলিকে সরাসরি সমবর্তক হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। পোলারয়েড পাতে একটি স্বচ্ছ প্লাস্টিক পর্দার মধ্যে হেরাপ্যাথাইটের অসংখ্য আনুবীক্ষনিক কেলাস তাদের অক্ষগুলিকে একমুখী রেখে সাজানো থাকে। হেরাপ্যাথাইটের পরিবর্তে আয়োডিনের কেলাসও ব্যবহৃত হয়। পোলারয়েড পাত ইচ্ছামত আকার ও আকৃতিতে ব্যবহার করা যায় এবং এটি দামেও নিকল প্রিজমের তুলনায় সস্তা। এজন্য রৈখিকভাবে সমবর্তিত আলোক উৎপাদনে পোলারয়েড পাতই সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়।

রৈখিক সমবর্তন ঘটানোর পদ্ধতিগুলি জানতে পারলেন। এবার এ সম্বন্ধে একটি অনুশীলনীর উত্তর দিন।

অনুশীলনী 2

(i) একটি অসমবর্তিত আলোকরশ্মি 1.5 প্রতিসরণ গুণাঙ্কের কাচের উপর বায়ু থেকে 60° কোণে আপতিত হল। প্রতিফলিত রশ্মিতে আপতন তলের সমান্তরাল ও অভিলম্ব উপাংশগুলির তীব্রতার অনুপাত্র কত হবে?

(ii) সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(a) নিকল প্রিজ্‌মে ক্যানাডা বালসাম স্তরের কাজ কী?

(b) নিকল প্রিজ্‌মের তুলনায় পোলারয়েডের সুবিধা কী?

(c) একাক্ষ কেলাসে কোন দিকে সাধারণ ও অসাধারণ রশ্মির বেগ সর্বাপেক্ষা পৃথক হয়?

9.5 একাক্ষ কেলাসে আলোক তরঙ্গের সঞ্চার

সমবর্তন সংক্রান্ত অন্য বিষয়গুলি পড়ার আগে একাক্ষ কেলাসে সাধারণ ও অসাধারণ রশ্মিগুলি

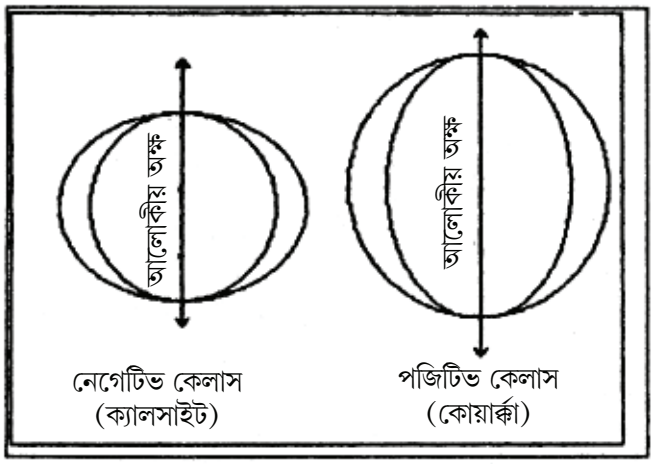

চিত্র 9.10a চিত্র 9.10b

কীভাবে সঞ্চারিত হয় সেটি আপনার জানা প্রয়োজন। এই পাঠক্রমের প্রথম এককে আপনি তরঙ্গসঞ্চারের প্রসঙ্গে হাইগেন্‌স্‌এর নীতিটি পড়েছেন। এখানে আমরা সাধারণ ও অসাধারণ রশ্মির ক্ষেত্রে হাইগেন্‌সএর নীতি প্রযোগ করে এই দুই রশ্মির দিক নির্ণয় করব।

আপনি আগেই জেনেছেন যে একাক্ষ কেলাসের মধ্যে সাধারণ রশ্মির তরঙ্গমুখ গোলকের আকৃতি হলেও, অসাধারণ রশ্মির তরঙ্গ মুখ উপগোলাকাকৃতি হয়। ক্যালসাইট কেলাসের ক্ষেত্রে উপগোলকটি আলোকীয় অক্ষ বরাবর চাপা (oblate) হয়, সাধারণ রশ্মির গোলকাকার তরঙ্গমুখ আলোকীয় অক্ষের উপর দুই বিন্দুতে উপগোলকটি স্পর্শ করা ছাড়া সম্পূর্ণ উপগোলকের ভিতরে থাকে (চিত্র 9.10a)। এজাতীয় কেলাসকে নেগেটিভ কেলাস বলা হয়। কোয়ার্জ কেলাসের ক্ষেত্রে এর বিপরীত ঘটে। উপগোলকটি আলোকীয় অক্ষের দিকে দীর্ঘায়িত (prolate) হয়, এবং ঐ অক্ষের উপর সাধারণ রশ্মির গোলকাকৃতি তরঙ্গমুখকে স্পর্শ করা ব্যতীত সেটির ভিতরে থাকে (চিত্র 9.10b)। এজন্য কোয়ার্জ কেলাসকে পজিটিভ কেলাস বলা হয়। এখানে আমরা ক্যালসাইটের মত নেগেটিভ কেলাস নিয়ে আলোচনা করব। তবে পজিটিভ কেলাসের ক্ষেত্রে কী ঘটবে তা আপনি নিজেই অনুসন্ধান করতে পারবেন।

আলোকীয় অক্ষের অবস্থান এবং আপতন কোণ অনুযায়ী কয়েকটি পৃথক অবস্থা কল্পনা করা যায় :

আলোকীয় অক্ষ দুই মাধ্যমের বিভেদতলে আপতন তলের সঙ্গে অভিলম্ব :

9.11.(a) ও 9.11.(b) চিত্রে এই অবস্থাটি দেখানো হয়েছে। (a) চিত্রে দুটি আলোকরশ্মি R ও R′ বায়ু ও একাক্ষ কেলাসের বিভেদতল AB এর উপর লম্বভাবে আপতিত হয়েছে। এক্ষেত্রে তরঙ্গ মুখের ছেদগুলি উভয়ই গোলাকার এবং তাদের সাধারণ স্পর্শকগুলি AB এর সমান্তরাল। ফলে প্রতিসৃত সাধারণ রশ্মি O এবং অসাধারণ রশ্মি E ভিন্ন বেগে কিন্তু

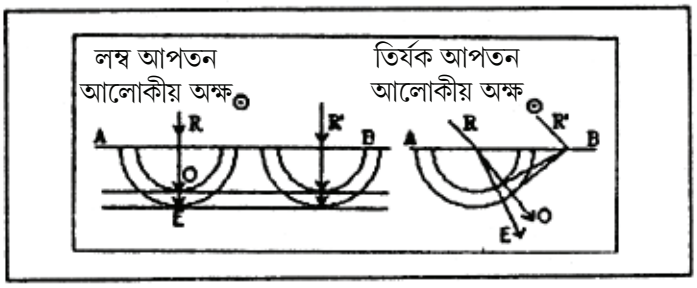

চিত্র 9.11.(a) চিত্র 9.11.(b)

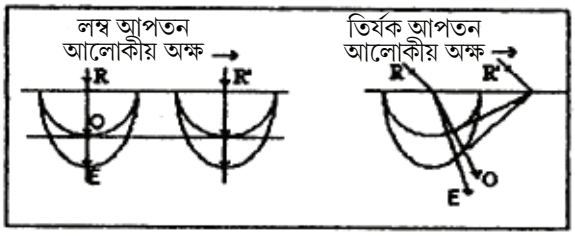

চিত্র 9.12.(a) চিত্র 9.12.(b)

একই দিকে, অর্থাৎ বিভেদতলের সঙ্গে লম্বভাবে গমন করছে। অন্যদিকে R ও R′ রশ্মি যখন তির্যকভাবে আপতিত হয় তখন হাইগেন্‌সের পদ্ধতিতে প্রতিসৃত তরঙ্গমুখগুলি অঙ্কন করে (চিত্র (b)) দেখা যায় যে O এবং E রশ্মিগুলি কেবল ভিন্ন বেগেই নয়, ভিন্ন দিকেও সঞ্চারিত হয়।

আলোকীয় অক্ষ দুই মাধ্যমের বিভেদতলে এবং আপতন তলে অবস্থিত ঃ

এই অবস্থাটি 9.12 (a) ও (b) চিত্রে দেখানো হয়েছে। (a) চিত্রে লম্ব আপতনের অবস্থাটি আসলে 9.11(a) চিত্রের অনুরূপ, দৃষ্টিকোণটি যদিও ভিন্ন। তির্যক আপতনের ক্ষেত্রে এখানেও E এবং O রশ্মিগুলি ভিন্নদিকে সঞ্চারিত হয়েছে।

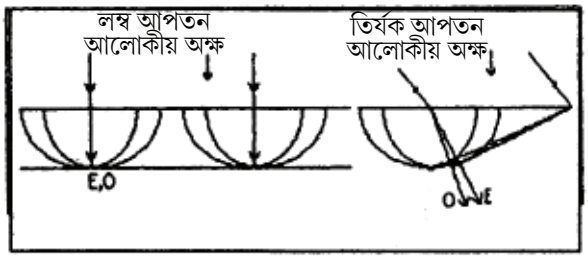

চিত্র 9.13.(a) চিত্র 9.13.(b)

আলোকীয় অক্ষ বিভেদতলের অভিলম্ব ঃ 9.13 চিত্রে লম্ব আপতনের অবস্থাটি দেখতে পাবেন। এখানে E ও O রশ্মিদুটি আলোকীয় অক্ষ বরাবর একই বেগে অগ্রসর হওয়ায় এই বিশেষ ক্ষেত্রে কোন দ্বৈধ প্রতিসরণ ঘটে না। তির্যক আপতনের ক্ষেত্রে (চিত্র 9.13b) রশ্মিদুটির প্রতিসরণ কোণ ভিন্ন হয় এবং দ্বৈধ প্রতিসরণটি স্পষ্ট দেখা যায়।

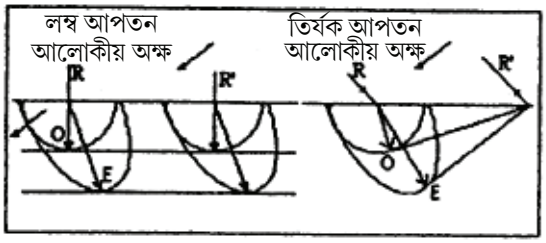

চিত্র 9.14.(a) চিত্র 9.14.(b)

আলোকীয় অক্ষ বিভেদতলের সঙ্গে আনত ঃ 9.14 চিত্রে লম্ব আপতনের অবস্থাটি দেখানো হয়েছে। এখানে O রশ্মিটি বিভেদতলের লম্ব অভিমুখে প্রতিসৃত হলেও অসাধারণ E রশ্মিটি তির্যকভাবে প্রতিসৃত হয়েছে এবং এর দিকটি বিভেদতলের সমান্তরাল তরঙ্গমুখের সঙ্গেও আনত রয়েছে। তির্যক আপতনের ক্ষেত্রে 9.14 (b) চিত্রের মত অবস্থা ঘটে এবং O রশ্মি ও E রশ্মি বিভিন্ন দিকে সঞ্চারিত হয়। নিকল প্রিজমের ক্ষেত্রে এই জাতীয় দ্বৈধ প্রতিসরণ আপনি আগেই লক্ষ্য করেছেন।

এবার একটি অনুশীলনীর মাধ্যমে হাইগেন্‌স্-এর পদ্ধতির প্রয়োগ অভ্যাস করে নিন।

অনুশীলনী 3

একটি পজিটিভ কেলাসের ক্ষেত্রে 9.14 (a) ও (b) চিত্রদুটির অনুরূপ অবস্থায় সাধারণ ও অসাধারণ রশ্মির গতিপথ নির্ণয় করুন।

9.5.1 সাধারণ ও অসাধারণ রশ্মির মধ্যে দশাপার্থক্য

আগের অংশ থেকে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে একটি কক্ষ কেলাসের মধ্যে দ্বৈধ প্রতিসরণের ফলে সাধারণ ও অসাধারণ রশ্মিগুলি কীভাবে প্রতিসৃত হয় তা আপতন কোণ ছাড়াও আলোকীয় অক্ষের কৌণিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে। এখন আমাদের জানতে হবে, একাক্ষ কেলাসে নির্মিত একটি আয়তফলকের উপর একটি অসমবর্তিত আলোকরশ্মি আপতিত হলে নির্গত সাধারণ ও অসাধারণ আলোকরশ্মির মধ্যে আলোকীয় পথের পার্থক্য ও দশা পার্থক্য কত হবে।

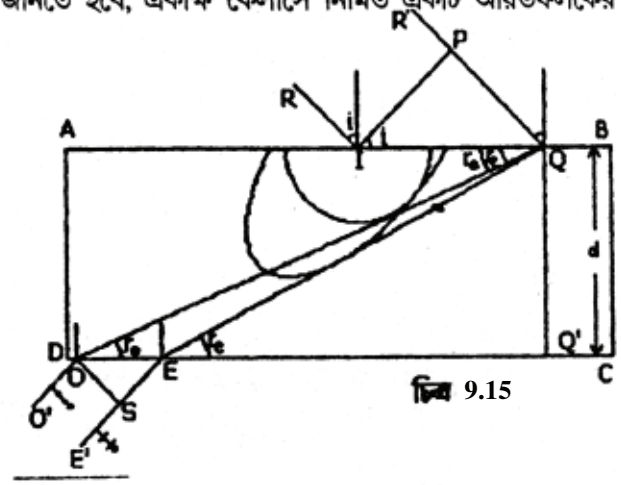

চিত্র 9.15

9.15 চিত্রে হাইগেন্‌স-এর পদ্ধতিতে একাক্ষ কেলাসের আয়তফলকের মধ্যে এবং সেটি থেকে নির্গত হওয়ার পরে সাধারণ ও অসাধারণ রশ্মিগুলির তরঙ্গমুখ দেখানো হয়েছে।

এই চিত্রে R এবং R′ রশ্মিদুটি ABC আয়তফলকের AB তলে i কোণে আপতিত হয়েছে। R রশ্মির আপতনের মুহূর্তে IP এই রশ্মিগুলির তরঙ্গমুখ। হাইগেনস্-এর পদ্ধতিতে প্রতিসৃত তরঙ্গমুখগুলি অঙ্কন করে সাধারণ ও অসাধারণ রশ্মির প্রতিসৃত তরঙ্গমুখ, যথাক্রমে QO এবং QE পাওয়া যায়। r_0 এবং r_e এগুলির প্রতিসরণ কোণ। আয়তফলকের CD তলে আপতনের পর সেগুলি আবার প্রতিসৃত হয়ে OD′ EE′ রূপে নির্গত হয়। স্পষ্টতই OO′ এবং EE′ আপতিত তরঙ্গমুখ IP এর সমান্তরাল এবং সেগুলির মধ্যে আলোকীয় পথের পার্থক্য OS-এর সমান, যেখানে $OS \perp EE'$ । এখন আমাদের OS এর মান নির্ণয় করতে হবে।

লক্ষ্য করুন যে $\angle OES = \angle QIP = i$। সুতরাং যদি $QQ' \perp CD$, এবং QQ' দৈর্ঘ্য = আয়তফলকের বেধ d হয় তবে

$$OS = OE \sin i = \left(OQ' - EQ'\right)\sin i = \left(d\cot r_0 - d\cot r_e\right)\sin i$$
$$= d\left(\cos r_0 \frac{\sin i}{\sin r_0} - \cos r_e \cdot \frac{\sin i}{\sin r_e}\right)$$

বা, $OS = d(\mu_0 \cos r_0 - \mu_e \cos r_e)$

যেখানে μ_0, μ_e যথাক্রমে সাধারণ ও অসাধারণ রশ্মির ক্ষেত্রে কেলাসের প্রতিসরাঙ্ক।

দুই রশ্মির মধ্যে দশাপার্থক্য $\delta = \frac{2\pi d}{\lambda}(\mu_0 \cos r_0 - \mu_e \cos r_e)$, যেখানে $\lambda =$ বায়ুতে আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য। এখানে μ_0 আলোকীয় অক্ষের কৌণিক অবস্থান এবং আপতন কোণের উপর নির্ভরশীল না হলেও μ_e রাশিটি অসাধরণ রশ্মিটি আলোকীয় অক্ষের সঙ্গে যে কোণ রচনা করে তার উপর নির্ভর করে।

যখন আলোকীয় অক্ষটি আলো কেলাসের যে তলে আপতিত হয় সেইতলে (অর্থাৎ AB অথবা CD তলে) অবস্থিত হয় এবং R-R′ রশ্মি লম্বভাবে আপতিত হয় [চিত্র 9.11 (a) দেখুন], তখন $i = r_0 = r_e = 0$ হয়। সাধারণ ও অসাধারণ রশ্মিগুলি একই দিকে ভিন্ন বেগে সঞ্চারিত হয়। আলোকীয় অক্ষ এবং আপতিত রশ্মি যে সমতল রচনা করে সাধারণ রশ্মির তড়িৎক্ষেত্রে তার লম্বভাবে এবং অসাধারণ রশ্মি তার সমান্তরালে থাকে। উপরন্তু অসাধারণ রশ্মিটি আলোকীয় অক্ষের সঙ্গে সমকোণে সঞ্চারিত হয় এবং এই দিকে ক্যালসাইট কেলাসের ক্ষেত্রে μ_e সর্বনিম্ন এবং কোয়ার্জ কেলাসের ক্ষেত্রে μ_e সর্বোচ্চ হয়। এই সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন প্রতিসরাঙ্ককে প্রধান অসাধারণ প্রতিসরাঙ্ক (extraordinary principal refractive index) μ_E বলা হয়। কেলাস থেকে নির্গত হওয়ার পর সাধারণ রশ্মি অসাধারণ রশ্মির তুলনায় যে দশাকোণে পিছিয়ে থাকে তার মান 9.12 সূত্র থেকে পাওয়া যায়।

$$\delta = \frac{2\pi d}{\lambda}(\mu_0 - \mu_E)$$

আপনাকে যদি দ্বৈধ প্রতিসরাঙ্ক কেলাস থেকে এমন একটি আয়তফলক তৈরী করতে হয় যার মধ্য দিয়ে যাওয়ার ফলে সাধারণ ও অসাধারণ রশ্মির মধ্যে একটি নির্দিষ্ট দশাপার্থক্য সৃষ্টি হবে তার 9.13 সূত্রটি আপনার খুবই কাজে লাগবে। এখানে আমরা দুটি উদাহরণ বিবেচনা করব।

অর্ধতরঙ্গ পাত (half wave plate)

এই পাত লম্বভাবে আপতিত কোন নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকের সাধারণ ও অসাধারণ রশ্মিদুটির মধ্যে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অর্ধেকের সমান পথ পার্থক্য সৃষ্টি করে। রশ্মিদুটির মধ্যে দশাপার্থক্য হবে $\frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{2} = \pi$।

বলুন, এই পাতের বেধ কত হবে? 9.13 সূত্র থেকে $\delta = \pi$ বসিয়ে,

$$d = \frac{\lambda}{2\pi(\mu_0 - \mu_E)}\pi = \frac{\lambda}{2(\mu_0 - \mu_E)}$$

ধরা যাক আমরা ক্যালসাইট কেলাস থেকে 508nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপযুক্ত একটি অর্ধতরঙ্গ পাত তৈরী করতে চাই। এই তরঙ্গদৈর্ঘ্যে ক্যালসাইটের প্রতিসরাঙ্ক $\mu_0 = 1{\cdot}66527$, $\mu_E = 1{\cdot}48956$। এই মানগুলি 9.14 সূত্রে ব্যবহার করে পাওয়া যায়

$$d = \frac{508nm}{2(1.66527 - 1.48956)} = 1.446\mu m$$

সিকি তরঙ্গ পাত (quater wavc plate):

এই পাতের উপর নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো লম্বভাবে আপতিত হলে সাধারণ ও অসাধারণ রশ্মিদুটির মধ্যে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এক চতুর্থাংশের সমান পথপার্থক্যের সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে রশ্মিদুটির মধ্যে যে দশাপার্থক্যের সৃষ্টি হয় তার মান $\frac{2\pi}{\lambda}.\frac{\lambda}{4} = \frac{\pi}{2}$ আগের মত 8.13 সূত্রে $\delta = \frac{\pi}{2}$ বসালে আপনি সিকিতরঙ্গ পাতের বেধ পাবেন ঃ

$$d = \frac{\lambda}{2\pi(\mu_0 - \mu_E)}.\frac{\pi}{2} = \frac{\lambda}{4(\mu_0 - \mu_E)} \quad \text{..... 9.15}$$

এখন আপনি নিজেই দেখে নিতে পারেন যে ক্যালসাইট কেলাস থেকে 508nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপযুক্ত সিকি তরঙ্গ পাত নির্মাণ করলে তার বেধ হবে 0.723μm অর্থাৎ অর্ধতরঙ্গ পাতের বেধের অর্ধেক।

9.6 বৃত্তীয় ও উপবৃত্তীয় সমাবর্তনের উৎপাদন

9.4 অনুচ্ছেদে আপনি রৈখিক সমবর্তন উৎপাদনের বিভিন্ন পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। সেখানে আপনি জেনেছেন যে বৃত্তীয় অথবা উপবৃত্তীয়ভাবে সমবর্তিত আলো উৎপাদন করতে প্রথমে রৈখিকভাবে সমবর্তিত আলো থেকেই শুরু করতে হয়। এই অনুচ্ছেদে রৈখিকভাবে সমবর্তিত আলোকে কীভাবে বৃত্তীয় অথবা উপবৃত্তীয়ভাবে সমবর্তিত আলোতে রূপান্তরিত করতে হয় সেটি আমরা আলোচনা করব।

ধরা যাক ABCD কোন এক দ্বৈধ প্রতিসারক কেলাস থেকে তৈরী একটি সিকি তরঙ্গ পাত। তীরচিহ্নগুলি পাতের তলে অবস্থিত আলোকীয় অক্ষের দিক নির্দেশ করছে। পাতটি পজিটিভ বা নেগেটিভ, যে কোন ধরণের কেলাস থেকে নির্মিত হতে পারে। তবে আমরা ধরে নেব এক্ষেত্রে সেটি ক্যালসাইট জাতীয় কোন নেগেটিভ কেলাসের তৈরী। আমরা আলোকীয় অক্ষ বারবর x অক্ষ এবং তার সঙ্গে সমকোণে y অক্ষ কল্পনা করব (চিত্র 9.16)।

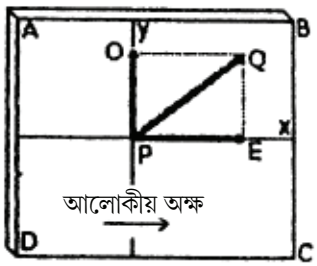

চিত্র 9.16

এবার ধরুন রৈখিকভাবে সমবর্তিত একটি একবর্ণী আলোকরশ্মি পাতটির উপর লম্বভাবে আপতিত হল, যার কম্পন PQ অভিমুখী এবং x অক্ষের সঙ্গে θ কোণে আনত। এই কম্পনের সমীকরণ

$$E = E_0 \sin\omega t$$

x ও y অক্ষ বরাবর এই কম্পনের উপাংশগুলি হবে (θ = **কম্পনের নতিকোণ**) x অক্ষ বা আলোকীয় অক্ষ বরাবর $x = E_0 \cos\theta \sin\omega t$ (অসাধারণ রশ্মি) y অক্ষ বা আলোকীয় অক্ষের লম্ব বরাবর $Y = E_0 \sin\theta \sin\omega t$ (সাধারণ রশ্মি)

আলোকীয় অক্ষ বরাবর উপাংশটি অসাধারণ রশ্মি এবং ঐ অক্ষের সঙ্গে লম্ব উপাংশটি সাধারণ রশ্মি হিসাবে আচরণ করবে। আপনি আগেই দেখেছেন যে অসাধারণ রশ্মিটি সাধারণ রশ্মির চেয়ে দ্রুত কেলাসটি অতিক্রম করবে এবং সিকি তরঙ্গ পাত থেকে নির্গত হওয়ার পর $\frac{\pi}{2}$ দশাকোণে এগিয়ে থাকবে। সুতরাং সিকি তরঙ্গ পাত থেকে নির্গত হওয়ার পর আলোর কম্পনের উপাংশগুলি হবে

$$X = E_0 \cos\theta \sin(\omega t + \alpha) \text{ (অসাধারণ রশ্মি)} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots \; 9.16(a)$$

$$Y = E_0 \sin\theta \sin\left(\omega t + \alpha - \frac{\pi}{2}\right) \text{(সাধারণ রশ্মি)}$$

$$= -E_0 \sin\theta \cos(\omega t + \alpha) \quad \ldots\ldots\ldots\ldots \; 9.16(b)$$

(a) ও (b) সমীকরণ দুটি থেকে t কে অপনয়ন করা যাক।

$$\left(\frac{x}{\cos\theta}\right)^2 + \left(\frac{y}{\sin\theta}\right)^2 = E_0^2 \sin^2(\omega t + \alpha) + E_0^2 \cos^2(\omega t + \alpha)$$

$$= E_0^2$$

বা, $$\frac{x^2}{(E_0 \cos\theta)^2} + \frac{y^2}{(E_0 \sin\theta)^2} = 1 \qquad \text{......................} \quad 9.17$$

9.17 সমীকরণটি একটি উপবৃত্তের সমীকরণ, যার অর্ধপরাক্ষ ও অর্ধউপাক্ষ $E_0 \cos\theta$ ও $E_0 \sin\theta$। আপনি নিশ্চই বুঝতে পারছেন যে এক্ষেত্রে সিকি তরঙ্গ পাতটি রৈখিক সমবর্তনকে উপবৃত্তীয় সমবর্তনে পরিণত করেছে।

এখন প্রশ্ন, সিকি তরঙ্গ পাতের সাহায্যে কীভাবে আমরা বৃত্তীয় সমবর্তন পেতে পারি? পাতটি যদি এমনভাবে বসানো যায় যে আপতিত রৈখিকভাবে সমবর্তিত তরঙ্গের কম্পনের দিকটি পাতের আলোকীয় অক্ষের সঙ্গে $\theta = 45^0$ কোণ রচনা করে তবে 9.17 সমীকরণে $\theta = 45^0$ বসিয়ে পাওয়া যায়।

চিত্র 9.17

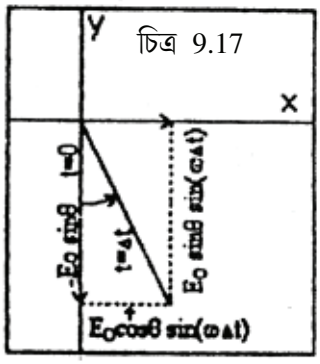

$$\frac{x^2}{E_0^2} + \frac{y^2}{E_0^2} = 1, \quad \text{বা,} \quad x^2 + y^2 = E_0^2 \qquad \text{.........} \quad 9.18$$

এটি নিঃসন্দেহে একটি বৃত্তের সমীকরণ। সুতরাং সিকিতরঙ্গ পাতটি যদি সঠিক কৌণিক অবস্থানে রাখা হয় তবে রৈখিকভাবে সমবর্তিত আলো থেকে বৃত্তীয়ভাবে সমবর্তিত আলো পাওয়া যেতে পারে।

আপনার মনে হতে পারে যে 9.17 ও 9.18 সমীকরণগুলিতে যে উপবৃত্তীয় বা বৃত্তীয় সমবর্তন বোঝাচ্ছে সেগুলিতে তড়িৎক্ষেত্র ভেক্টরটির গতি দক্ষিণাবর্তী না বামাবর্তী। এর উত্তর পেতে আপনাকে 9.16 (a) ও (b) সমীকরণদুটি লক্ষ্য করতে হবে। ধরে নিন $\alpha = 0$। t এর মান যখন শূন্য তখন $x = 0, Y = -E_0 \sin\theta$.। এর অব্যবহিত পরে যখন $t = \Delta t$,

চিত্র 9.18

$$X = E_0 \cos\theta \sin(\omega \Delta t)$$

$$Y = -E_0 \sin\theta \cos(\omega \Delta t)$$

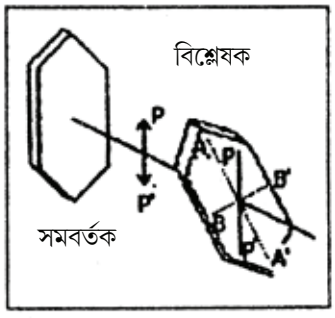

অর্থাৎ তড়িৎক্ষেত্র ভেক্টরটি Δt সময় বামাবর্তে অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে ঘুরে গিয়েছে। তড়িৎক্ষেত্র ভেক্টরের গতি এখানে স্পষ্টত বামাবর্তী। আপতিত রশ্মিটি যদি x অক্ষের সঙ্গে $-\theta$ কোণে আনত হত তবে আলোকীয় অক্ষের লম্ব বরাবর তড়িৎক্ষেত্রের উপাংশ হত $Y = -E_0 \sin\theta \sin\omega t$। অসাধারণ রশ্মির তুলনায় এই সাধারণ রশ্মি $\frac{\pi}{2}$ কোণে পেছিয়ে পড়ার পর 9.16 সমীকরণে 9.16 (b) স্থানে আপনি পাবেন

$$Y = -E_0 \sin\theta \sin\left(\omega t + \alpha - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$= E_0 \sin\theta \cos(\omega t + \alpha)$$

আগের যুক্তি ব্যবহার করে আপনি দেখাতে পারবেন যে এক্ষেত্রে তড়িৎক্ষেত্র ভেক্টরটি দক্ষিণাবর্তী। কাজেই সিকিতরঙ্গ পাত ব্যবহার করে আপনি রৈখিকভাবে সমবর্তিত আলোকে বামাবর্তী অথবা দক্ষিণাবর্তী বৃত্তীয় সমবর্তনে রূপান্তরিত করতে পারেন।

এবার দেখা যাক উপবৃত্তীয় সমবর্তনের আলোর উপর সিকি-তরঙ্গ পাতের প্রভাব কী হবে। আপনি আগেই দেখেছেন এই ধরনের সমবর্তনের ক্ষেত্রে উপবৃত্তের দুই অক্ষ বরাবর আলোকের কম্পনের উপাংশগুলি হল ঃ

$$X = E_0 \cos\theta \sin(\omega t + \alpha)$$

$$Y = \pm E_0 \sin\theta \cos(\omega t + \alpha)$$

এখন যদি আলোকরশ্মিটিকে একটি সিকি তরঙ্গপাতের মধ্য দিয়ে এমনভাবে পাঠানো যায় যাতে X উপাংশটির কম্পনের দিক পাতের আলোকীয় অক্ষ বরাবর থাকে তবে X উপাংশ অসাধরণ রশ্মি এবং Y উপাংশ সাধারণ রশ্মি হিসাবে আচরণ করবে। এবং আগের মত অসাধারণ রশ্মিটি সিকি তরঙ্গ পাত অতিক্রম করার পর সাধারণ রশ্মির তুলনায় $\frac{\pi}{2}$ দশাকোণে এগিয়ে যাবে। ফলে নির্গত উপাংশগুলি হবে।

$$X = E_0 \cos\theta \sin\left(\omega t + \beta + \frac{\pi}{2}\right) = E_0 \cos\theta \cos(\omega t + \beta)$$

$$Y = \pm E_0 \sin\theta \cos(\omega t + \beta)$$

দুই সমীকরণ থেকে সময় t-কে অপনয়ন করে,

$$Y = \pm x \tan\theta$$

এটি একটি সরলরেখার সমীকরণ। আপনি প্রমাণ করতে পারেন যে Y উপাংশের কম্পন সিকিতরঙ্গ পাতের আলোকীয় অক্ষ বরাবর থাকলেও পাত থেকে নির্গত কম্পন একটি সরলরেখায় থাকবে। সুতরাং, সিকি তরঙ্গপাত যেমন রৈখিকভাবে সমবর্তিত আলোকে বৃত্তীয় বা উপবৃত্তীয়ভাবে সমবর্তিত আলোতে পরিবর্তিত করতে পারে, তেমনই বিপরীতভাবে এই পাতের দ্বারা বৃত্তীয় বা উপবৃত্তীয় সমবর্তনকে রৈখিক সমবর্তনে পরিণত করাও সম্ভব।

আমারা অধাতব পাতের উপযোগিতা সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিনি। নীচের অনুশীলনী থেকে আপনি এই পাত কোন কাজে লাগে তা বুঝতে পারবেন।

অনুশীলনী 4

রৈখিকভাবে সমবর্তিত একটি আলোকরশ্মি একটি অর্ধতরঙ্গ পাতের উপর লম্বভাবে আপতিত হল। পাত থেকে নির্গত আলোকরশ্মির সমবর্তনগত অবস্থা কী হবে?

9.7 সমবর্তিত আলোকের বিশ্লেষণ (Analysis of polarised light)

9.4 ও 9.6 অনুচ্ছেদগুলি থেকে আপনি বিভিন্ন সমবর্তনগত অবস্থার আলোকরশ্মি উপাদানের উপায় জেনেছেন। কিন্তু কোন একটি আলোকরশ্মির সমবর্তনের প্রকৃতি অজ্ঞাত থাকলে আপনি রশ্মি আদৌ সমবর্তিত কি না এবং সমবর্তিত হলে সেটি রৈখিক বৃত্তীয় বা উপবৃত্তীয় এর কোন ধরনের সমবর্তিত রশ্মি তা কীভাবে নির্ণয় করবেন? এই অনুচ্ছেদে আমরা এর পদ্ধতিটি আলোচনা করব।

9.7.1 সমবর্তক ও বিশ্লেষক (Polariser and analyser)

আপনি আগেই দেখেছেন, নিকল প্রিজ্‌ম বা পোলারয়েড অসমবর্তিত আলোর একদিকের তড়িৎক্ষেত্র-উপাংশকে মূল রশ্মি থেকে বিচ্যুত করে অথবা শোষণ করে একটি নির্দিষ্ট কম্পনতলে তড়িৎক্ষেত্র বিশিষ্ট রৈখিকভাবে সমবর্তিত আলোতে পরিণত করে। ঐ নিকল প্রিজম্‌ বা পোলারয়েডকে আমরা সমবর্তক (polariser) বলি। এখন ঐ সমবর্তিত আলোকে যদি আর একটি সমাক্ষ নিকল প্রিজম বা পোলারয়েডের মধ্য দিয়ে চালনা করা যায় তবে তার ফল কি হবে?

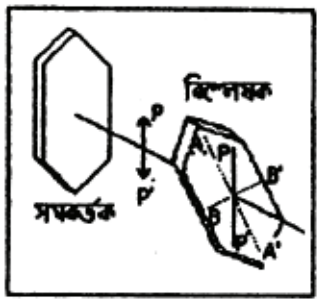

চিত্র 9.18 (a)

ধরুন সমবর্তক থেকে নির্গত আলোর তড়িৎক্ষেত্র PP' বরাবর (চিত্র 9.18) কম্পনশীলতার বিস্তার E এবং যেহেতু তীব্রতা বিস্তারের বর্গের সমানুপাতী, লেখা যায় যে আলোর তীব্রতা KE^2, যেখানে K = সমানুপাত ধ্রুবক।

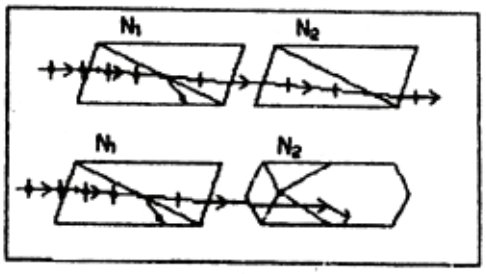

চিত্র 9.18 (b)

দ্বিতীয় নিকল প্রিজম্ বা পোলারয়েডটি AA' বরাবর কম্পনকে সঞ্চারিত হতে দেয় কিন্তু তার সমকোণে BB' বরাবর কম্পনের উপাংশকে নির্গত হতে দেয় না। ধরুন PP' ও AA'এর মধ্যে কোণ θ। সমবর্তক থেকে আসা কম্পনকে উপাংশে ভাগ করলে, দ্বিতীয় নিকল প্রিজম্ বা পোলারয়েড থেকে নির্গত উপাংশের বিস্তার হবে $E\cos\theta$। যেহেতু আলোর তীব্রতা I বিস্তারের বর্গের সমানুপাতী, এক্ষেত্রে নির্গত আলোর তীব্রতা

চিত্র 9.18 (c)

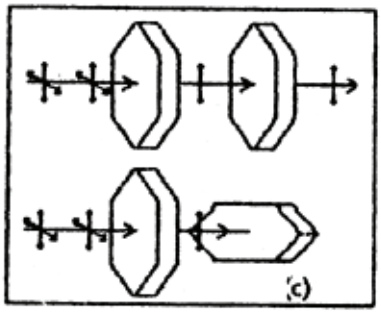

$$I = KE^2 \cos^2 \theta \qquad 9.19$$

8.19 সূত্র থেকে সহজেই বোঝা যায় যে যখন $\theta = 0$, তখনই নির্গত আলোর তীব্রতা সর্বাধিক, I_0 হবে যেখানে $I_0 = KE^2$;এখন আপনি 9.19 সূত্রের পরিবর্তে লিখতে পারেন

$$I = I_0 \cos^2 \theta \qquad 9.20$$

এই সূত্রটি ম্যালাস-এর সূত্র (Malus Law) নামে পরিচিত।

এখানে আমরা যে দ্বিতীয় নিকল প্রিজম্ বা পোলারয়েডের উল্লেখ করেছি সেটি সমবর্তক থেকে আসা আলোর সমবর্তনগত অবস্থা বিশ্লেষণে সাহায্য করে। এজন্য সেটিকে বিশ্লেষক (analyser) বলা হয়।

সমবর্তক ও বিশ্লেষকের আলোকীয় অক্ষগুলি যখন সমান্তরাল থাকে, অর্থাৎ $\theta = 0^\circ$ হয় তখন সমবর্তক ও বিশ্লেষক সমান্তরাল অবস্থায় আছে বলা হয়। আলোকীয় অক্ষগুলি যখন লম্ব অবস্থায় থাকে অর্থাৎ $\theta = 90^\circ$ হয়, তখন সমবর্তক ও বিশ্লেষক লম্বাবস্থায় crossed আছে বলা হয়। 9.20 সূত্র থেকে সহজেই বুঝতে পারেন যে এই অবস্থায় নির্গত আলোর তীব্রতা $I_0 \cos^2 90^\circ$ বা শূন্য হবে। অর্থাৎ কোন আলোই নির্গত হবে না। সমবর্তককে স্থির রেখে বিশ্লেষকটিকে যদি তাদের সাধারণ অক্ষের উপর ঘোরানো যায় তবে প্রতি আবর্তনে

বিশ্লেষক থেকে নির্গত আলোর তীব্রতা দুবার সর্বোচ্চ (যখন $\theta = 90°, 180°$) এবং দুবার শূন্য (যখন $\theta = 90°$ ও $270°$) হবে। 9.18 (b) চিত্রে দুটি নিকল প্রিজমের এবং 9.18 (c) চিত্রে দুটি বিবর্ণী কেলাসের সমান্তরাল ও লম্ব অবস্থাগুলি দেখানো হয়েছে।

9.7.2 সমবর্তনের বিশ্লেষণ পদ্ধতি

এবার দেখা যাক, কীভাবে আমরা কোন একটি আলোকরশ্মির সমবর্তনগত অবস্থা নির্ণয় করতে পারি। এ কাজে আমাদের বিশ্লেষক ও সিকি-তরঙ্গ পাত ব্যবহার করতে হবে। পরীক্ষার বিভিন্ন ধাপগুলি আমরা একটি সারণীর সাহায্যে আলোচনা করব।

সারণী 9.1-সমবর্তিত আলোকের বিশ্লেষণ

পরীক্ষা	পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত
1. আলোকের রশ্মিটি একটি বিশ্লেষকের মধ্য দিয়ে চালিত হল এবং বিশ্লেষকটি তার অভিলম্ব অক্ষের উপর ঘোরানো হল।	(a) বিশ্লেষকের একটি পূর্ণ আবর্তনে আলোকরশ্মিটি সম্পূর্ণ নির্বাপিত হল। (b) বিশ্লেষকের একটি পূর্ণ আবর্তনে নির্গত আলোর তীব্রতা দুবার সর্বোচ্চ এবং দুবার সর্বনিম্ন হল, কখনই শূন্য হল না।	(a) আলোকরশ্মিটি রৈখিকভাবে সমবর্তিত। (b) আলোকরশ্মিটি নীচের যে কোনটি হতে পারে। (i) উপবৃত্তীয়ভাবে সমবর্তিত, (ii) অসমবর্তিত রৈখিক ভাবে,সমবর্তিত আলোর মিশ্রণ, (iii) অসমবর্তিত ও উপবৃত্তীয় ভাবে সমবর্তিত আলোর মিশ্রণ।
যদি 1 নং পরীক্ষার পর্যবেক্ষণ (b) হয় তবে	(c) বিশ্লেষকের সব কৌণিক অবস্থানে নির্গত আলোর তীব্রতা সমান দেখা গেল।	(c) আলোকরশ্মিটি নীচের যে কোনটি হতে পারে। (i) অসমবর্তিত (ii) বৃত্তীয়ভাবে সমবর্তিত (iii) অসমবর্তিত ও বৃত্তীয়ভাবে সমবর্তিত আলোর মিশ্রণ।
2. আলোকরশ্মিটি প্রথমে একটি সিকি-তরঙ্গ-পাতের মধ্য দিয়ে	(a) সিকি তরঙ্গপাতের কোণ এবং অবস্থানের জন্য বিশ্লেষকটি 1(a)	(a)আলোকরশ্মিটি উপবৃত্তীয়ভাবে সমবর্তিত। উপবৃত্তের তথা দুটি

পরীক্ষা	পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত
পাঠানো হল এবং পাতটির বিভিন্ন কৌণিক অবস্থানের জন্য পাতের মধ্য দিয়ে নির্গত আলো বিশ্লেষকের সাহায্যে আগের মত পরীক্ষা করা হল।	পর্যবেক্ষণের মত আলোকের রশ্মিটিকে সম্পূর্ণ নির্বাপিত করে।	সিকি তরঙ্গ পাতের আলোকীয় অক্ষের সমান্তরাল ও অভিলম্ব।
	(b) সিকি তরঙ্গ পাতের কোন অবস্থানের জন্যই বিশ্লেষককে আবর্তিত করে আলোকরশ্মিটিকে নির্বাপিত করা যায় না। কিন্তু	b) (i) আলোক রশ্মিটি অসমবর্তিত ও রৈখিকভাবে সমবর্তিত আলোর মিশ্রণ। এক্ষেত্রে রৈখিক সমবর্তন বৃত্তীয় সমবর্তনে পরিণত হওয়ায় বিশ্লেষক থেকে নির্গত রশ্মি সমান তীব্র থাকে।
	(b) (i) পাতের দুটি পরস্পর বিপরীত অবস্থানে নির্গত রশ্মির তীব্রতা বিশ্লেষকটি আবর্তিত হলেও সর্বদা সমান থাকে।	
	(b) (ii) পাতের সব অবস্থানেই নির্গত রশ্মির তীব্রতা বিশ্লেষকের আবর্তনের সঙ্গে ওঠানামা করে।	(b) (ii) আলোকরশ্মিটি অসমবর্তিত ও উপবৃত্তীয় ভাবে সমবর্তিত আলোর মিশ্রণ।
যদি 1 নং পরীক্ষার (c) হয় তবে		
3. এক্ষেত্রেও 2নং পরীক্ষার মত আলোকরশ্মিটিকে সিকি-তরঙ্গপাতের মধ্য দিয়ে পর্দায়ে সেটির বিভিন্ন কৌণিক অবস্থানের জন্য নির্গত আলো বিশ্লেষকের সাহায্যে আগের মত পরীক্ষা করা হল।	(a) সিকি তরঙ্গপাতের যে কোন অবস্থানের জন্য বিশ্লেষকের দুই বিপরীত অবস্থানে আলো সম্পূর্ণ নির্বাপিত হয়।	(a) আলোকরশ্মিটি বৃত্তীয় ভাবে সমবর্তিত এবং সিকি তরঙ্গ পাতটি তার যে কোন কৌণিক অবস্থানে সেটিকে রৈখিক সমবর্তনে পরিণত করে।
	(b) বিশ্লেষকটির আবর্তনের সঙ্গে নির্গত আলোকের তীব্রতা (1b) পর্যবেক্ষণের মত সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মানের মধ্যে ওঠানামা করে।	(b) আলোকরশ্মিটি অসমবর্তিত ও বৃত্তীয় ভাবে সমবর্তিত আলোর মিশ্রণ।

পরীক্ষা	পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত
	(c) বিশ্লেষকের আবর্তনের সঙ্গে নির্গত আলোর তীব্রতার কোন পরিবর্তন হয় না।	(c) আলোকের রশ্মিটি সম্পূর্ণ অসমবর্তিত।

আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে উপরের সারণীতে আমরা রৈখিক, বৃত্তীয় ও উপবৃত্তীয় আলোকের সংমিশ্রণের কথা আলোচনা করিনি। এর কারণ এই তিন ধরণের সমবর্তিত আলোকের যে কোন দুটির মিশ্রণে উপবৃত্তীয়ভাবে সমবর্তিত আলোক উৎপন্ন হয়। এজন্য এই মিশ্রণগুলিকে আলাদাভাবে বিবেচনা করার প্রয়োজন হয় না।

এবার একটি অনুশীলনীর সাহায্যে যা পড়লেন সেটির চর্চা করে নিন।

অনুশীলনী 5

কেবলমাত্র রৈখিকভাবে সমবর্তিত আলোকরশ্মিকেই বিশ্লেষক দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নির্বাপিত করা যায়। পাশের চিত্রে বৃত্তগুলি অসমবর্তিত, রৈখিকভাবে সমবর্তিত ও বৃত্তীয়ভাবে সমবর্তিত আলো এবং সেগুলির সমপতিত অঞ্চলগুলি দুই বা তিন ধরণের আলোর মিশ্রণ বোঝাচ্ছে। যে সব ক্ষেত্রে একটি সিকি তরঙ্গ পাতের সাহায্যে আলোকরশ্মিটিকে রৈখিকভাবে সমবর্তিত আলোতে রূপান্তরিত করা সম্ভব সেখানে [✓] চিহ্ন এবং যেখানে তা সম্ভব নয় সেখানে [×] চিহ্ন দিন।

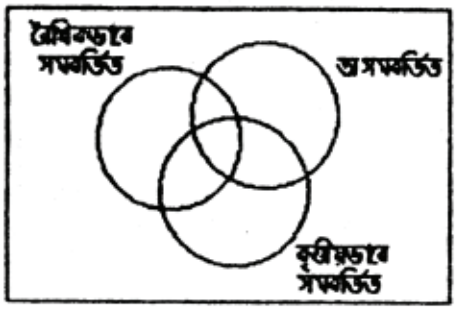

চিত্র **9.19**

9.8 সমবর্তনের ব্যবহারিক প্রয়োগ

সমবর্তিত আলোক এবং সমবর্তক ও বিশ্লেষকের ব্যবহারিক প্রয়োগের অনেক উদাহরণ দেখা যায়। এখানে আমরা কয়েকটি প্রয়োগ সংক্ষেপে আলোচনা করব।

(ক) পোলারয়েড রোদ চশমা : রৌদ্রালোকিত পিচের রাস্তা, জলাশয় প্রভৃতি থেকে প্রতিফলিত হয়ে যে আলো আমাদের চোখে আসে তার অনেকটাই রৈখিকভাবে সমবর্তিত থাকে। 9.4.1 অংশের আলোচনা থেকে এর কারণ বোঝা যাবে। এই সমবর্তিত আলোকের কম্পন অনুভূমিক থাকে। পোলারয়েড রোদ-চশমায় কাচের পরিবর্তে দ্বিবর্ণী পোলারয়েড পাত ব্যবহার করা হয়, যেটি অনুভূমিক কম্পনকে শোষণ করে এবং উল্লম্ব কম্পনের আলোকে সঞ্চারিত হতে দেয়। এর ফলে আমাদের চোখ প্রতিফলিত আলোর ঝকমকানি থেকে রক্ষা পায় এবং চারিদিকের দৃশ্যের প্রকৃত বর্ণ দেখতে পাওয়া যায়।

(খ) **আলোর তীব্রতা নিয়ন্ত্রক ফিল্টার ঃ** আপনি আগেই জেনেছেন যে একজোড়া সমবর্তক যদি এমনভাবে রাখা যায় যে তাদের আলোকীয় অক্ষগুলি সমান্তরাল অবস্থা থেকে θ কোণে বিচ্যুত থাকে তবে দুটির মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত আলোকর তীব্রতা $\cos^2\theta$এর সমানুপাতী হয়। এই নীতির উপর ভিত্তি করে একজোড়া রৈখিক সমবর্তক পেলারয়েড পাত্র ব্যবহার করে বিশেষ ধরণের চশমা, ট্রেনের কামরা ও জাহাজের জানালা প্রভৃতি তৈরী করা হয়। একটি পোলারয়েড পাতকে স্থির রেখে ও অন্যটি ঘুরিয়ে আলোকের সঞ্চারণ সর্বোচ্চ মান থেকে 10^4 গুণ পর্যন্ত কমানো সম্ভব হয়।

(গ) কার-সেল Kercell আলোকদ্বার ঃ

নাইট্রোবেনজিনের মত কোন কোন বস্তু সাধারণভাবে দ্বৈধ প্রতিসারক না হলেও তড়িৎক্ষেত্রের প্রভাবে দ্বৈধ প্রতিসারকে পরিণত হয়। ধরা যাক দুটি নিকল প্রিজ্‌ম বা পোলারয়েড লম্বাবস্থায় আছে এবং উভয়ের মধ্যে একটি স্বচ্ছ পাত্রে নাইট্রোবেনজিন রাখা আছে। এই অবস্থায় কোন আলোকরশ্মি সমবর্তক ও বিশ্লেষকের মধ্য দিয়ে নির্গত হতে পারবে না। এখন যদি দুইপাশে রাখা দুটি তড়িৎদ্বারের মধ্যে উচ্চ বিভব প্রভেদ প্রয়োগ করে নাইট্রোবেনজিনকে দ্বৈধ প্রতিসারকে পরিণত করা হয় তবে সমবর্তক থেকে আসা রৈখিক সমবর্তন বিশিষ্ট রশ্মি নাইট্রোবেনজিনের মধ্যে উপবৃত্তীয় সমবর্তন লাভ করবে এবং ঐ আলোর কিছু অংশ লম্বাবস্থায় রাখা বিশ্লেষকের মধ্য দিয়ে নির্গত হবে। তড়িৎদ্বারে যদি রেডিও কম্পাঙ্কের পরবর্তী বিভব প্রভেদ প্রয়োগ করা হয় তবে যখনই ঐ বিভবের মান শূন্য হবে তখন কোন আলো নির্গত হবে না কিন্তু বিভব পজিটিভ বা নেগেটিভ হলেই আলো নির্গত হবে। এইবাবে নির্গত আলোর তীব্রতা রেডিও কম্পাঙ্কের মত উচ্চ কম্পাঙ্কে ওঠানামা করবে। তড়িৎদ্বার সমেত নাইট্রোবেনজিন কোষটি কার অভিক্রিয়াকে Kerr effect ভিত্তি করে ক্রিয়া করে এবং এটি কার সেল নামে পরিচিত। আলোকের গতিবেগ সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করতে কার-সেল আলোকদ্বার বহুক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

9.9 সারাংশ

আলোকতরঙ্গে কম্পনশীল তড়িৎক্ষেত্রটিকে যদি একটি ভেক্টর হিসাবে দেখা যায় তবে সাধারণ আলোকে সেকটরের প্রান্তবিন্দুটি কোন নির্দিষ্টবক্ররেখার উপর থাকে না; যখন ঐ প্রান্তবিন্দু একটি সরলরেখা অথবা উপবৃত্ত অথবা বৃত্তের উপর থাকে তখনই ঐ আলোকে যথাক্রমে রৈখিক, উপবৃত্তীয় ও বৃত্তীয়ভাবে সমবর্তিত আলো বলা হয় এবং আলোর ঐ বিশেষ ধর্মকেই বলা হয় সমবর্তন। সমবর্তিত তরঙ্গকে বিশেষ গাণিতিক সমীকরণ দিয়ে নির্দেশিত করা যায়।

এই এককে রৈখিক সমবর্তন উৎপাদনের তিনটি উপায় বর্ণিত হয়েছে। এগুলি হল প্রতিফলনের দ্বারা বৈধ প্রতিসরণের দ্বারা এবং বিবর্ণী কেলাসের সমবর্তন। একথা কেলাসে যখন আলোকতরঙ্গ প্রবেশ করে তখন সাধারণভাবে সেটি সাধারণ ও অসাধারণ রশ্মিতে ভেঙে যায়। সাধারণ রশ্মিটি স্নেলের সূত্র অনুযায়ী প্রতিসৃত হলেও অসাধারণ রশ্মিটির আবরণে আপাতদৃষ্টিতে কিছু বৈষম্য দেখা যায়। তবে

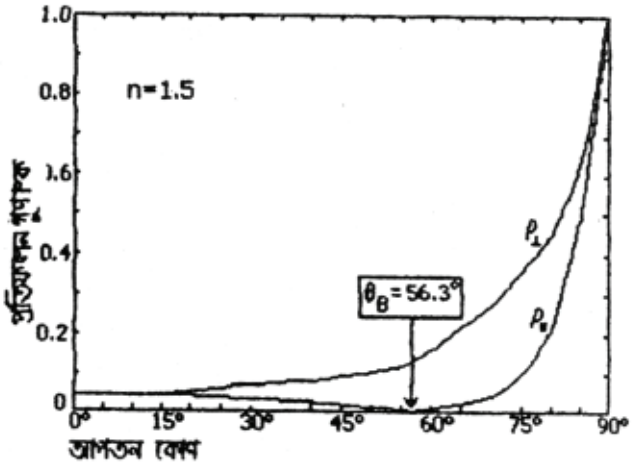

চিত্র 9.5

কেলাসের মধ্যে একটি বিশেষ দিক বরাবর দুটি রশ্মিই একই বেগে গমন করে এবং এই দিকটিকে আমরা আলোকীয় অক্ষ বলি। হাইগেন্‌সএর পদ্ধতিতে তরঙ্গমুখ অঙ্কন করে দুটি রশ্মির প্রতিসরণ সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা যায়।

একক কেলাস থেকে সিকি-তরঙ্গ-পাত নির্মান করা যায়। কেলাসের আলোকীয় অক্ষটি এই পাতের দুই তলের সমান্তরাল থাকে এবং পাতটির বেধ এমন হয় যাতে আলোকরশ্মি পাতের মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হলে সাধারণ ও অসাধারণ রশ্মির মধ্যে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এক চতুর্থের সমান আলোকীয়, পরের পার্থক্য থাকে। এই পাতের সাহায্যে রৈখিকভাবে সমবর্তিত তরঙ্গকে উপবৃত্তীয় বা বৃত্তীয়ভাবে সমবর্তিত তরঙ্গে রূপান্তরিত করা যায়।

সমবর্তনকারী কোন বস্তুকে সমবর্তিত আলোকের বিশ্লেষণেও ব্যবহার করা যায়। যে আলোর সমবর্তনের অবস্থা অজ্ঞাত সেটির বিশ্লেষণের পদ্ধতি এবং সমবর্তনের ব্যবহারিক প্রয়োগও এই এককে আলোকিত হয়েছে।

9.10 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১। সমবর্তিত ও অসমবর্তিত আলোর মধ্যে প্রভেদ কী? আলোকের সমবর্তনকে কখন রৈখিক, উপবৃত্তীয় বা বৃত্তীয় বলা হয়?

২। আলোকের রৈখিক সমবর্তন ঘটানোর উপায়গুলি লিখুন। সম্পূর্ণ রৈখিক সমবর্তন ঘটাতে এই পদ্ধতিগুলি কতটা কার্যকরী?

৩। একটি একবর্ণী আলোকরশ্মি একটি একক্ষ কেলাসের সমতল পৃষ্ঠে তির্যকভাবে আপতিত হল। প্রতিসরণের পর সাধারণ ও অসাধারণ রশ্মিগুলি হাইগেনস্‌ের পদ্ধতি অঙ্কন করুন, যখন আলোকীয় অক্ষটি (১) কেলাসের পৃষ্ঠের সঙ্গে লম্বভাবে (২) কেলাসের পৃষ্ঠতলে, আপতনতলের সঙ্গে সমান্তরালভাবে এবং (৩) কেলাসের পৃষ্ঠতলে, আপতনতলের অভিলম্বে রয়েছে।

৪। সিকি তরঙ্গ পাত ও অর্ধতরঙ্গ পাত কী? এগুলি কীভাবে নির্মিত হয়? এ ধরনের কোন একটি পাত কি সব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের জন্যই কার্যকরী হয়?

৫। রৈখিকভাবে সমবর্তিত আলোকে উপবৃত্তীয় বা বৃত্তীয়ভাবে সমবর্তিত আলোতে রূপান্তরিত করার পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

৬। কোন একটি একবর্ণী আলোকরশ্মির সমবর্তনগত অবস্থা কীভাবে নির্ণয় করবেন?

৭। নিচের সারণীর প্রথম স্তম্ভে যে ধরনের সমবর্তনের উল্লেখ করা হয়েছে, সেটিকে দ্বিতীয় স্তম্ভে উল্লিখিত সমবর্তনে রূপান্তরিত করতেহবে। এজন্য আপনি (ক) সমবর্তক নিকল প্রিজম বা পোলারয়েড (খ) সিকিতরঙ্গপাত ও (গ) অর্ধতরঙ্গপাত — এগুলির কোনটি বা কোনগুলি ব্যবহার করবেন?

৮। সমবর্তকের একটি ব্যবহারিক প্রয়োগের বর্ণনা দিন।

9.11 উত্তরমালা

অনুশীলনী

1. $E_x^2 + E_y^2 = E_0^2$, যেটি একটি বৃত্তের সমীকরণ। সুতরাং আলোকতরঙ্গের সমবর্তন বৃত্তীয়। এছাড়া,

$$\hat{E} = \hat{i}\, E_0 \sin(\omega t + kz) + \hat{j}\, E_0 \cos(\omega t + kz)$$

$$\frac{d\hat{E}}{dt} = \hat{i}\,\omega E_0 \cos(\omega t + kz) - \hat{j}\,\omega E_0 \sin(\omega t + kz)$$

$$\therefore \hat{E} \times \frac{d\hat{E}}{dt} = -\hat{k}\,\omega E_0^2$$

9.3 (ii) এর আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে এটি দক্ষিণাবর্তী বৃত্তীয় সমবর্তন নির্দেশ করছে।

2.i) আপতন কোণ $\theta = 60°$, সুতরাং $\cos\theta = 0{\cdot}5$ এবং প্রতিসরণ কোণ $= \varphi$ হলে,

$$\sin\varphi = \sin 60° \div \frac{3}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\therefore \varphi = 35{\cdot}3°,\ \cos\varphi = 0{\cdot}816$$

9.8 (a), (b) সূত্র ব্যবহার করে,

$$\rho_{11} = \left(\frac{1{\cdot}5\times 0{\cdot}5 - 0{\cdot}816}{1{\cdot}5\times 0{\cdot}5 + 0{\cdot}816}\right)^2 = {\cdot}0018$$

$$\rho_{\perp} = \left(\frac{0{\cdot}5 - 1{\cdot}5\times 0{\cdot}816}{0{\cdot}5 + 1{\cdot}5\times 0{\cdot}816}\right)^2 = 1{\cdot}76$$

লক্ষ্য করুন যে এক্ষেত্রে আপতন কোণটি ব্রুস্টার কোণ ($\tan^{-1}1.5$ ও $56{\cdot}3^{\circ}$)এর কাছাকাছি হওয়ায় ρ_{11} প্রায় শূন্য। অর্থাৎ প্রতিফলিত রশ্মিটি প্রায় সম্পূর্ণ রৈখিকভাবে সমবর্তিত।

2. (a) ক্যানাডা বালসাম স্তরটি সাধারণ রশ্মিটিকে পূর্ণ প্রতিফলিত করে ও মূল রশ্মি থেকে বিচ্যুত করে।

(b) নিকল প্রিজমের তুলনায় পোলারয়েড পাত আকারে ছোট, আকৃতিতে সুবিধাজনক এবং যে কোনও মাপে পাওয়া যায়। কোন যন্ত্রের মধ্যে পোলারয়েড পাত সহজে বসানো যায়। এটি কারখানায় যে কোনও পরিমাণে উৎপাদন করা যায় এবং নিকল প্রিজমের চেয়ে এটি অনেক সুলভ।

(c) আলোকীয় অক্ষের লম্ব অভিমুখে সাধারণ রশ্মি ও অসাধারণ রশ্মির বেগ সর্বাপেক্ষা পৃথক হয়।

3. 9.20 (a), (b) চিত্রে পজিটিভ কেলোসের ক্ষেত্রে সাধারণ ও অসাধারণ রশ্মির গতিপথ দেখানো হল।

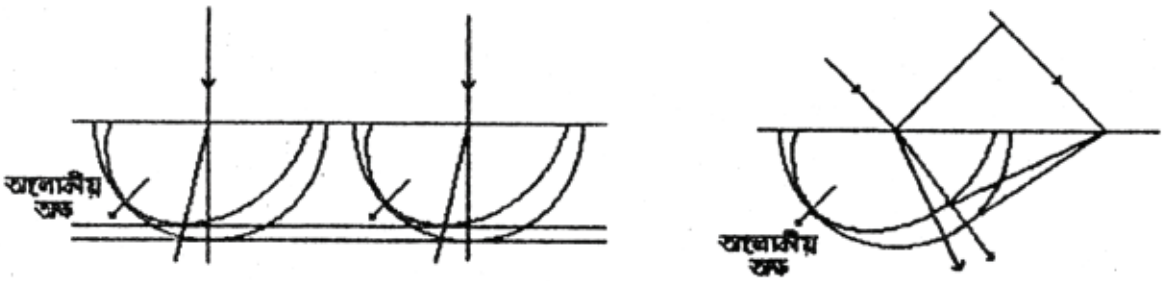

চিত্র **9.20** (a) ও (b)

4. 9.16 (a) ও (b) সমীকরণ দুটির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে অর্ধতরঙ্গ পাত থেকে নির্গত হওয়ার পর অসাধারণ ও সাধারণ রশ্মির সমীকরণগুলি হবে:

$$X = E_0\cos\theta\sin(\omega t + \alpha)$$

$$Y = E_0\sin\theta\sin(\omega t + \alpha - \pi) = -E_0\sin\theta\sin(\omega t + \alpha)$$

সময় t কে অপনয়ন করে, $Y = -x\tan\theta$ এটিও একটি সরলরেখার সমীকরণ, তবে এটির নতিকোণ $-\theta$ অর্থাৎ মূল কম্পনের বিপরীত।

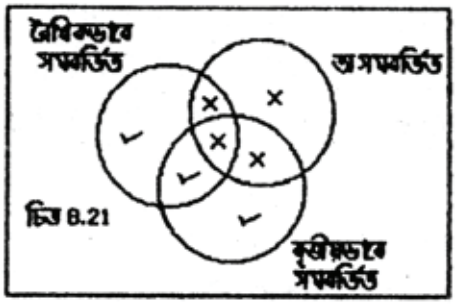

চিত্র **9.21**

একক 10 ❑ আলোকীয় ঘূর্ণন

গঠন

10.1 প্রস্তাবনা,

উদ্দেশ্য।

10.2 আলোকীয় ঘূর্ণনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য।

10.3 Fresnel এর ঘূর্ণনের তত্ত্ব।

10.4 সমবর্তন ঘূর্ণনমাপী (polarimeter)।

(i) Laurent এর অর্ধ-ছায়া সমবর্তন ঘূর্ণন মাপক।

(ii) Lippich এর সমবর্তন ঘূর্ণনমাপী।

(iii) যুগ্ম কোয়ার্টস্।

10.5 সমবর্তন ঘূর্ণনমাপীর সাহায্যে চিনির দ্রবণের ঘনত্ব নির্ণয়।

10.6 সারাংশ।

10.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী।

10.8 সর্বশেষ উত্তরমালা।

10.1 প্রস্তাবনা

পূর্বের এককে আলোকের সমবর্তন সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য জেনেছেন। বর্তমান এককে তলীয় সমবর্তিত আলোর একটা গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম সম্পর্কে অলোচনা করা হবে।

কোনও তলীয় সমবর্তিত আলোকরশ্মি যখন কোন আলোক-সক্রিয় মাধ্যমের (যথা চিনির দ্রবণ) মধ্য দিয়া যায় তখন উহার সমবর্তন তলের ঘূর্ণন হয়। কঠিন পদার্থেও (যেমন কোয়ার্টর্স কেলাসে) এই ধরনের ঘূর্ণন দেখা যায়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে দ্রবণে সমবর্তন তলের ঘূর্ণন এতে সক্রিয় দ্রাবের সমানুপাতিক। সুতরাং সমবর্তন তলের ঘূর্ণন মেপে দ্রাবের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। শিল্পক্ষেত্রে দ্রবণে চিনির পরিমাণ এই পদ্ধতিতে মাপা যায়। ইহাকে বলা হয় শর্করামিতি (Saccharimetry)।

উদ্দেশ্য : বর্তমান একক পাঠের পরে আপনারা

- আলোক সক্রিয় মাধ্যমের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম এবং আলোকীয় ঘূর্ণন মাপার পদ্ধতি জানতে পারবেন।
- আপনি কোন অজানা আলোক সক্রিয় দ্রবণে দ্রাবের পরিমাণ স্থির করতে পারবেন।

10.2 আলোকীয় ঘূর্ণনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

যখন কোন বিশ্লেষককে (চিএ 10.2.1 তে 'A') সমবর্তক P এর সাপেক্ষে ক্রমিত অবস্থায় রাখা হয়, তখন 'A' এর ভিতর দিয়ে কোন আলো যায় না এবং দৃষ্টিক্ষেত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে মনে হয়। প্রকৃতিতে কিছু আলোক-সক্রিয় পদার্থ (s) আছে (যেমন কোয়ার্টস্ কেলাস বা চিনির দ্রবণ) যা দুটি ক্রসিত P এবং A নিকলের মধ্যে রাখলে, উহা বিশ্লেষক A এর ভিতর দিয়ে কিছু আলো পাঠাতে পারে। A কে কিছুটা ঘুরিয়ে A থেকে নির্গত আলো সম্পূর্ণ নির্বাপিত করা যায়।

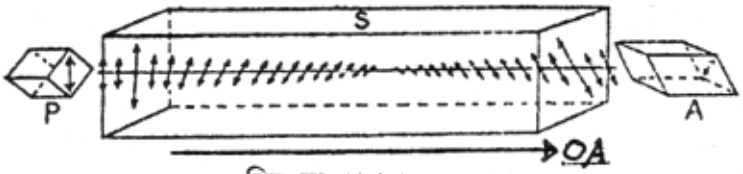

চিত্র নং **10.2.1**

P-সমবর্তক, A-বিশ্লেষক, S-আলোক সক্রিয় পদার্থ, OA-আলোকাক্ষ।

P ও A-ক্রসিত নিকল।

পদার্থ S এর এই ধর্মকে বলে আলোক সক্রিয়তা এবং যে সব পদার্থে এই ধর্ম দেখা যায়, তাদের বলে আলোক সক্রিয়। যেহেতু আলোক সক্রিয় পদার্থের ভিতর দিয়ে যাওয়া আলো বিশ্লেষককে ঘুরিয়ে সম্পূর্ণ নির্বাপিত করা যায়, কাজেই আলোক সক্রিয় মাধ্যম আলোর তলীয় সমবর্তিত প্রকৃতি ধ্বংস করেনি। আলোক সক্রিয় মাধ্যম শুধুমাত্র তলীয় সমবর্তিত আলোর কম্পন তলকে কিছুটা ঘুরিয়ে দিয়েছে। এই ঘটনাকে বলে সমবর্তন তলের ঘূর্ণন, অথবা সংক্ষেপে একে বলে ঘূর্ণনী সমবর্তন। কম্পন তলের ঘূর্ণন বামদিকে অথবা ডানদিকে হতে পারে। কোন দর্শক বিশ্লেষক থেকে নির্গত আলোক রশ্মির দিকে তাকালে, যদি ঘূর্ণন ঘড়ির কাঁটার ঘোরার দিকে হয়, তবে ঘূর্ণনকে ধনাত্মক অথবা দক্ষিণাবর্তী বলে। যে আলোক সক্রিয় পদার্থ এই ধরনের ঘূর্ণন ঘটায় তাকে দক্ষিণাবর্তনী পদার্থ বলে। ঘড়ির কাঁটা ঘোরার বিপরীতে হলে ঘূর্ণনকে ঋণাত্মক বা বামাবর্তী বলে এবং পদার্থকে বামাবর্তনী বলে।

কিছু কেলাস (যেমন কোয়ার্টস্), তরল পদার্থ (যেমন টারপেন্টাইন) এবং কিছু জৈব যৌগিক পর্দার্থের দ্রবণ (যেমন চিনির দ্রবণ) তলীয় সমবর্তিত আলোর সমবর্তন তলের এইরূপ ঘূর্ণন ঘটায়। কোয়ার্টস্ কেলাস দক্ষিণাবর্তনী এবং বামাবর্তনী উভয় প্রকারই দেখা যায়। কোয়ার্টস এর ক্ষেত্রে আলো আলোকাক্ষ বরাবর যাওয়া প্রয়োজন, নচেৎ দ্বিপ্রতিসরণের জন্য পর্যবেক্ষণে জটিলতা দেখা যায় (চিএ নং 10.2.1 দেখুন)।

Biot অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পদার্থের আলোক সক্রিয়তা পরীক্ষা করেন এবং পরীক্ষার ফলে দেখতে পান যে (i) নির্দিষ্ট উষ্ণতায় এবং নির্দিষ্ট রং এর আলোর ক্ষেত্রে, সমবর্তন তলের ঘূর্ণন অতিক্রান্ত আলোক সক্রিয়

মাধ্যমের বেধের সমানুপাতিক।

(ii) দুই বা একাধিক আলোক সক্রিয় মাধ্যমের জন্য উৎপন্ন মোট ঘূর্ণন ইহাদের প্রত্যেকের ঘূর্ণনের বীজগাণিতিক সমষ্টির সমান।

(iii) ঘূর্ণনের পরিমাণ আলোক সক্রিয় মাধ্যমের উষ্ণতা ও আপতিত আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভরশীল এবং ঘূর্ণন প্রায় তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক হয়।

আপেক্ষিক ঘূর্ণন ঃ

আপেক্ষিক ঘূর্ণন (α) দ্বারা কোন পদার্থের আলোক সক্রিয়তা মাপা হয়। এক মিলিমিটার বেধ বিশিষ্ট কোন কঠিন আলোক সক্রিয় পদার্থ ডিগ্রির মাপে যে ঘূর্ণন ঘটায় তাকে আলোক সক্রিয় পদার্থের আপেক্ষিক ঘূর্ণন বলে। দ্রবণের ক্ষেত্রে α এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ ঃ

$$\alpha = \frac{\text{দ্রবণের প্রতি এক ডেসিমিটার দৈর্ঘ্যের জন্য ঘূর্ণন}}{\text{প্রতি এক ঘন সেন্টিমিটার দ্রবণে গ্রাম এককে উপস্থিত সক্রিয় পদার্থ}}$$

আপেক্ষিক ঘূর্ণন ধ্রুবক নয়; নির্দিষ্ট পদার্থের ক্ষেত্রে ইহা উষ্ণতা এবং আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে, ইহা প্রায় তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বর্গের ব্যস্তানুপাতী হয়। কাজেই দৃশ্যমান আলোর ক্ষেত্রে, α এর মান বৃহত্তম হয় বেগুনী আলোর ক্ষেত্রে এবং ক্ষুদ্রতম হয় লাল আলোর ক্ষেত্রে। আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপর আপেক্ষিক ঘূর্ণনের নির্ভরতাকে বলে ঘূর্ণনী বিচ্ছুরণ।

দ্রবণের ঘনত্বের উপর নির্ভর করে বলে, সমবর্তন তলের ঘূর্ণন মেপে কোন দ্রবণের ঘনত্ব অর্থাৎ দ্রবণে কি পরিমাণ আলোক সক্রিয় পদার্থ আছে তা নির্ণয় করা যায়।

আলোক সক্রিয় কেলাস দুভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(i) কেলাস আলোক সক্রিয়, কিন্তু ইহার দ্রবণ অথবা গলিত অবস্থায় আলোক সক্রিয় নয় (যেমন, কোয়ার্টস্, সোডিয়াম্ ক্লোরেট্, জিঙ্ক সালফেট্ ইত্যাদি); এবং (ii) কঠিন পদার্থ ও উহার দ্রবণ অথবা গলিত অবস্থায় উভয়েই আলোক সক্রিয় (ইক্ষুচিনি, টারটারিক অ্যাসিড ইত্যাদি)।

প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে কেলাসে পরমাণুগুলো কুন্ডলিত অবস্থায় সাজানো (helical distribution) থাকে পরমাণুগুলোর এই বিশেষ ধরণের বিন্যাস আলোক সক্রিয়তার জন্য দায়ী। দ্রবণে পরমাণুগুলোর বিন্যাস নষ্ট হয়ে যায়, ফলে দ্রবণের আলোক সক্রিয়তা থাকে না।

দ্বিতীয়ক্ষেত্রে, অণুর মধ্যে পরমাণুগুলোর অপ্রতিসম বিন্যাসই আলোক সক্রিয়তার জন্য দায়ী।

10.3 Fresnel এর ঘূর্ণনের তত্ত্ব

আলোকাক্ষের দিকে (যেদিকে আপতিত আলোর দ্বিপ্রতিসরণ হয় না) পদার্থের আলোক সক্রিয়তার

প্রথম ব্যাখ্যা দেন Fresnel। যখন কোন তলীয় সমবর্তিত আলো আলোকাক্ষের দিকে কোন আলোক সক্রিয় মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন উহা দুটি সমান কম্পাংক বিশিষ্ট বিপরীত বৃত্তীয় সমবর্তিত কম্পনে বিভক্ত হয়। ইহাদের একটি ঘড়ির কাঁটার দিকে (R) এবং অপরটি বিপরীত দিকে L ঘোরে। আলোক সক্রিয় নয়।

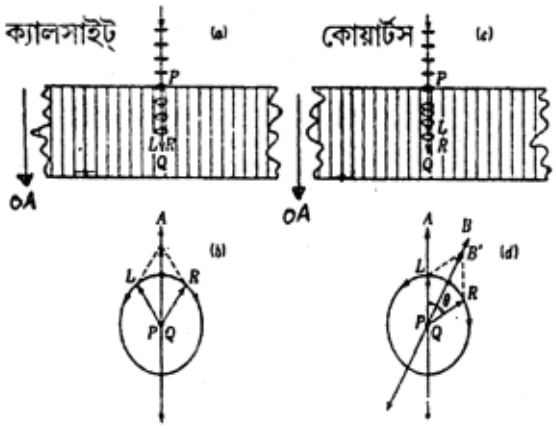

চিত্র **10.3.1** OA -আলোকাক্ষ

এমন কোন মাধ্যমে (যেমন ক্যালসাইট্ কেলাসে) দক্ষিণাবর্তী (R) ও বামাবর্তী বৃত্তীয় কম্পন দুটি একই গতিবেগে যায় (চিত্র নং 10.3.1 (a) দেখুন)। কাজেই গতিপথের কোন বিন্দুতে উভয় বৃত্তীয় কম্পন একই সময়ে উপস্থিত হয় এবং উহাদের লব্ধি কম্পন প্রাথমিক আপতন তলেই থাকে (চিত্র নং 10.3.1 (b) দেখুন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সমবর্তন তলের কোন ঘূর্ণন হয় না।

কিন্তু কোন আলোক সক্রিয় মাধ্যমে, যথা কোয়ার্টস্ কেলাসে, R এবং L বৃত্তীয় কম্পন দুটি সামান্য পৃথক গতিবেগে সামনের দিকে অগ্রসর হয়। দক্ষিণাবর্তনী কোয়ার্টস্ কেলাসে দক্ষিণাবর্তী (আলোর গতির বিপরীত দিকে দেখলে) কম্পন অপেক্ষাকৃত দ্রুতবেগে যায় এবং বামাবর্তনী কোয়ার্টসে বামাবর্তী কম্পন অপেক্ষাকৃত দ্রুতবেগে যায়।

কোন দক্ষিণাবর্তনী কোয়ার্টস কেলাসে আপতিত তলীয় সমর্তিত আলোর গতিপথে কোন বিন্দু Q ধরা যাক (চিত্র নং 10.3.1 (c) দেখুন)। 10.3.1 (d) নং চিত্রে AP আপতিত কম্পন তল ও কম্পনের বিস্তার নির্দেশ করে। দক্ষিণাবর্তী উপাংশ R প্রথমে Q বিন্দুতে উপস্থিত হয় এবং বামাবর্তী উপাংশ (L) আসার আগে (R) এর কৌণিক সরণ হয় θ। এই মুহূর্তে বৃত্তীয় গতিদুটির একটি R বিন্দু থেকে এবং অপরটি L বিন্দু থেকে সমান কম্পাংক নিয়ে বিপরীত দিকে যাত্রা শুরু করে। ফলে B′ বিন্দু নির্দিষ্ট সরলরেখা BQ বরাবর

কাঁপতে থাকে এবং এই কম্পনের বিস্তার ও কম্পাংক প্রাথমিক কম্পন AP এর ন্যায় হয়। ইহা বিন্দুতে আলোর কম্পন নির্দেশ করে। অর্থাৎ আলো কেলাসের তলে অবস্থিত P বিন্দু থেকে Q বিন্দুতে যাবার সময়ে সমবর্তন তল AP থেকে BQ তে ঘোরে (চিত্র নং 10.3.1 (d)) বা তলের ঘূর্ণন হয় $\frac{\theta}{2}$ পরিমাণ। উপরের আলোচনায় আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আলো যত কেলাসের ভিতর অগ্রসর হবে ততই কম্পন তলের ঘূর্ণন বাড়তে থাকবে, অর্থাৎ ঘূর্ণন কেলাসের বেধের সমানুপাতী হবে। গাণিতিকভাবে θ এর মান নিম্নরূপে বার করা যায়।

ধরা যাক μr ও μl যথাক্রমে, দক্ষিণাবর্তী ও বামাবর্তী আলোর ক্ষেত্রে কেলাসের প্রতিসরাংক এবং d হোল অতিক্রান্ত কেলাসের বেধ। অতএব, কেলাস থেকে নির্গত বৃত্তীয় কম্পনদ্বয়ের মধ্যে দশাকোণের পার্থক্য θ হলে, $\theta = \frac{2\pi}{\lambda}(\mu r. \sim \mu l.)d$ ..... (10.3.1)

λ = আপতিত তরলীয় সমবর্তিত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য।

আলোক সক্রিয় কেলাস থেকে নির্গত বৃত্তীয় কম্পনদ্বয় (বিপরীতমুখী) সমবেগে যায় এবং তারা সংযোজিত হয়ে একটি রৈখিক কম্পন (যার কম্পন তল BQ বরাবর) সৃষ্টি করে, ইহা আপতিত (AP) কম্পন তলের সঙ্গে $\frac{\theta}{2}$ কোণ করে।

Fresnel তত্ত্বের সত্যতা যাচাই পরীক্ষা।

নিজের তত্ত্বের অঙ্গীকার যাচাই করার জন্য Fresnel কতকগুলি দক্ষিণাবর্তী (R) ও বামাবর্তী (L) কোয়ার্টস্ প্রিজম একান্তররূপে (alternately) সাজিয়ে একটি আয়তাকার ব্লক তৈরি করেন (চিত্র নং 10.3.2 দেখুন)।

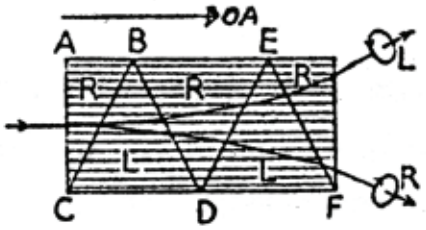

চিত্র **10.3.2** OA-আলোকাক্ষ

প্রতিটি প্রিজমের ক্ষেত্রে আলোকাক্ষ ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল। ধরা যাক প্রথম প্রিজমের (AC) তলে

কোন তলীয় সমবর্তিত আলো লম্বভাবে আপতিত। এই আলো ABC প্রিজমের মধ্যে দুটি বিপরীতমুখী দক্ষিণাবর্তী (R) ও বামাবর্তী (L) বৃত্তীয় কম্পনে বিভাজিত হয় এবং ABC দক্ষিণাবর্তী বলে R কম্পনজাত আলো অপেক্ষাকৃত দ্রুতগামী হয় এবং AB ভূমির বিপরীত দিকে বিচ্যুত হয়। BC তল অতিক্রম করার পর R কম্পনের গতিবেগ L কম্পনের গতিবেগ অপেক্ষা কম হয়, ফলে R কম্পন ভূমির দিকে ও L কম্পন ভূমি CD এর বিপরীত দিকে বিচ্যুত হয়। এভাবে পরবর্তী সংযোগতল (BD,DE ইত্যাদি) অতিক্রমের পর (R) ও L বৃত্তীয় কম্পনদ্বয়ের ব্যবধান আরও বৃদ্ধি পায়। পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে আয়তাকার ব্লক থেকে নির্গত আলোকরশ্মিদ্বয়ের একটি দক্ষিণাবর্তী R এবং অপরটি বামাবর্তী (L)। এভাবে Fresnel তার তত্ত্বের সত্যতা যাচাই করেন।

10.4 সমবর্তন ঘূর্ণনমাপী বা পোলারিমিটার (Polarimeter)

যে যন্ত্রের সাহায্যে কোন সমবর্তন তলের ঘূর্ণন মাপা হয় তাকে সমবর্তন ঘূর্ণনমাপী বলে। এর প্রয়োজনীয় অংশগুলো হোল ঃ একটি সমবর্তক, একটি বিশ্লেষক এবং তরল আলোক সক্রিয় পদার্থ রাখার জন্য একটি নল। কোন নির্দিষ্ট অবস্থা থেকে বিশ্লেষককে যে কোণে ঘোরালে, বিশ্লেষক থেকে নির্গত আলোর প্রাবল্য সর্বাপেক্ষা কম হয় অথবা বিশ্লেষক থেকে নির্গত আলো সম্পূর্ণ নির্বাপিত হয় তাহাই সমবর্তন তলের ঘূর্ণন নির্দেশ করে।

যখন কোন চিনির দ্রবণের ঘনত্ব মাপার জন্য ব্যবহার করা হয়, তখন উপরোক্ত যন্ত্রকে বলা হয় শর্করামাপী।

উপরোক্ত যন্ত্রের সহজ ব্যবস্থায় যদি কেবলমাত্র একটি আলোক সমবর্তক ও একটি বিশ্লেষক রাখা যায় তবে দেখা যায় যে বিশ্লেষককে বেশ কিছু পরিমাণ ঘোরালেও নির্গত আলোর নিম্নতম প্রাবল্যের অবস্থার বিশেষ তারতম্য হয় না। অর্থাৎ যন্ত্রটি সুবেদী হয় না। সমবর্তন ঘূর্ণন সূক্ষ্মভাবে মাপার জন্য নিম্নলিখিত তিনপ্রকার বিশেষ ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়া হয় ঃ (i) Laurent এর অর্ধছায়া সমবর্তন ঘূর্ণনমাপী, (ii) Lippich এর সমবর্তন ঘূর্ণনমাপী এবং (iii) যুগ্ম কোয়ার্টস।

(i) **Laurent এর অর্ধছায়া ঘূর্ণনমাপী।**

ইহা আলোকাক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে কাটা একটি অর্ধবৃত্তাকার কোয়ার্টস্ প্লেট্ এবং ইহার বেধ এমন হয় যাহাতে সাধারণ ও অসাধারণ আলোক রশ্মির (যাহারা কোয়ার্টস্‌কে আলোকাক্ষের লম্বভাবে অতিক্রম করে) মধ্যে $\frac{\lambda}{2}$ পথ পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। এখানে λ হলো আপতিত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য। উপরোক্ত কোয়ার্টস

পাতটি সমবেধবিশিষ্ট অর্ধবৃত্তাকার একটি কাচের পাতের সঙ্গে ব্যাস বরাবর আটকানো হোল, যাহাতে পাতদ্বয়ের বিন্যাস বৃত্তাকার হয়। কাচের পাতটি কোয়ার্ট্সের মত সমপরিমাণে আলো শোষণ করে। বৃত্তাকার বিন্যাসটি সমবর্তকের পিছনে এমন ভাবে রাখা হয় যাহাতে প্রতিটি অর্ধবৃত্ত দৃষ্টিক্ষেত্রের অর্ধেক অংশ ঢেকে রাখে।

ধরা যাক APB কাচের অর্ধবৃত্তাকার পাত, AQB কোয়ার্টসের পাত, AB আলোকাক্ষের দিক (চিত্র নং 10.4.1 দেখুন)। যদি আপতিত আলোর কম্পনের দিক OP এর সমান্তরাল হয়, তবে ইহা কাচের মধ্য দিয়ে অপরিবর্তিত ভাবে যাবে। কিন্তু কোয়ার্টসে ইহা দুটি উপাংশে, একটি OA-এর সমান্তরাল ও অপরটি ইহার লম্বভাবে বিভক্ত হয়।

কোয়ার্টেসের ভিতর দিয়ে যাবার ফলে একটা উপাংশের সাপেক্ষে অপরটির দশা বিপরীত হয়। এর ফলে নিঃসৃত আলোর কম্পনের দিক AB এর সঙ্গে $\angle AOQ(=\angle AOP)$ কোণ করে। কাজেই দৃষ্টিক্ষেত্রের দুটি অর্ধাংশে কম্পন যথাক্রমে OP এবং OQ বরাবর থাকে। বিশ্লেষকের ভিতর দিয়ে যাবার সময়ে, উহার দুটি অর্ধাংশ অসমানভাবে উজ্জ্বল হবে যতক্ষণ না বিশ্লেষকের নিঃসরণ তল AB এর সঙ্গে সমান্তরাল অথবা লম্বভাবে থাকে। উপরোক্ত দুটির প্রত্যেক ক্ষেত্রে, দৃষ্টিক্ষেত্রের দুটি অর্ধাংশ সমান উজ্জ্বল মনে হয়, কিন্তু একটি ক্ষেত্রে আলোর তীব্রতা অন্যটির তুলনায় বেশী মনে হয়। যদি অর্ধ-ছায়া কোণ $\angle POQ$ ছোট হয় (যেটা সাধারণত হয়), তবে যখন বিশ্লেষকের নিঃসরণ তল AB এর লম্বভাবে থাকে তখন আলোর তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম হয়।

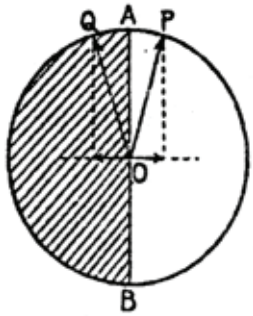

চিত্র **10.4.1**

প্রাথমিক আলোক তীব্রতা কম হলে, আমাদের চোখ আলোক তীব্রতার সামান্য পরিবর্তন ও (প্রায় 1%) ধরতে পারে। এই কারণে আমরা কম তীব্রতার অবস্থানকে (অর্থাৎ যখন বিশ্লেষকের নিঃসরণ তল অর্ধ-তরঙ্গপাতের আলোকাক্ষের সঙ্গে লম্বভাবে থাকে) পছন্দ করি।

সমবর্তন তলের ঘূর্ণন মাপার জন্য বিশ্লেষককে এমনভাবে রাখা হয়, যাহাতে দৃষ্টিক্ষেত্রের দুটি অর্ধাংশ সমান উজ্জ্বল মনে হয় (বিশ্লেষকের নিঃসরণ তল অর্ধ-তরঙ্গপাতের আলোকাক্ষের সঙ্গে লম্বভাবে রাখা)।

এর পর আলোক সক্রিয় পদার্থ বিশ্লেষক ও অর্ধছায়া পাতের মধ্যে রাখা হয়। তারপর বিশ্লেষককে ঘোরানো হয় যতক্ষণ না দৃষ্টিক্ষেত্রের দুটি অর্ধাংশ সমান উজ্জ্বল হয়। উপরোক্ত সমোজ্জ্বলতার জন্য বিশ্লেষককে যে ক্ষুদ্রতম পরিমাণ কৌণিক ঘূর্ণন দিতে হয় তাহাই সমবর্তক তলের ঘূর্ণন নির্দেশ করে।

উপরের আলোচনা থেকে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে অর্ধ ছায়া পাত (বা অর্ধ তরঙ্গপাত) কেবলমাত্র নির্দিষ্ট রংয়ের আলোর (যাহা সাধারণতঃ সোডিয়ামের হলুদ আলো) ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়।

(ii) Lippich এর সমবর্তন ঘূর্ণনমাপী

বর্তমানে সকল আধুনিক সমবর্তন ঘূর্ণনমাপক যন্ত্রে অর্ধ তরঙ্গপাত সমেত কোন প্রকার "অর্ধছায়া নীতি" ব্যবহার করা হয়। বহুলভাবে ব্যবহার করা হয় Lippich সমবর্তক।

Lippich যন্ত্রে ক্ষুদ্রতর নিকল N_3 সমবর্তক নিকল N_1 এর পিছনে রাখা হয় (চিত্র নং 10.4.2 দেখুন)। N_3 দৃষ্টিক্ষেত্রের অর্ধেক ঢেকে রাখে এবং ইহার ছোট কর্ণটি N_1 এর ছোট কর্ণের সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র কোণ করে থাকে। অতএব, N_1 এবং N_3 থেকে নির্গত আলোর কম্পনের অভিমুখ

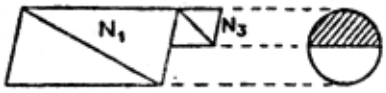

চিত্র **10.4.2**

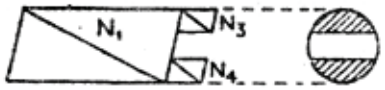

চিত্র **10.4.3**

দুটি পরস্পরের সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র কোণ করে। যখন বিশ্লেষকের ছোট কর্ণটি উপরোক্ত ক্ষুদ্র কোণের সমদ্বিখন্ডকের উপর লম্ব হয় তখন দৃষ্টিক্ষেত্রের দুটি অর্ধাংশ সমোজ্জ্বল মনে হয়।

সমবর্তন কোণের ঘূর্ণন আরো সূক্ষ্মভাবে মাপার জন্য, দুই অর্ধাংশ দৃষ্টিক্ষেত্রের বদলে তিনটি এক তৃতীয়াংশ দৃষ্টিক্ষেত্রের তন্ত্র ব্যবহার করা হয় (চিত্র নং 10.4.3 দেখুন)। এক্ষেত্রে দুটি ছোট নিকল N_3 ও N_4 সমবর্তক নিকল N_1এর পিছনে রাখা হয়। N_3 ও N_4 এর ক্ষুদ্র কর্ণদ্বয় পরস্পরের সঙ্গে সমান্তরাল হয় এবং N_1 এর ছোট কর্ণের সঙ্গে ক্ষুদ্র কোণ করে থাকে। এর ফলে দৃষ্টিক্ষেত্র তিনভাগে বিভক্ত হয় (চিত্র নং 10.4.3)। বাইরের এক তৃতীয়াংশদ্বয়ের ঔজ্জ্বল্য সবসময় একই থাকে। পরীক্ষা কালে মাঝের এক তৃতীয়াংশের আলোর তীব্রতা বাইরের এক তৃতীয়াংশদ্বয়ের তীব্রতার সঙ্গে সমান করা হয়। এই পদ্ধতিতে ঘূর্ণন মাপার ত্রুটি 0.01° এর বেশী হয় না। Lippich সমবর্তক যে কোন এক বর্ণের আলোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়।

(iii) যুগ্ম-কোয়ার্টস।

এই প্রকার সংযুক্তি সাদা অলোর ক্ষেত্রে (গড় তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রায় 5600 Å) ব্যবহার করা যায়। ইহা দুটি সমান বেধের অর্ধবৃত্তাকার কোয়ার্টস পাত দ্বারা গঠিত হয়। একটি পাত দক্ষিণাবর্তী এবং অপরটি বামাবর্তী হয়, পাতদুটি আলোকাক্ষের সঙ্গে লম্বভাবে কাটা হয় (চিত্র নং 10.4.4)। যখন একতলীয় সমবর্তিত আলো পাতদুটির ভিতর দিয়ে যায়, তখন একটি পাত সমবর্তন তলকে ডানদিকে এবং অপর পাতটি বামদিকে ঘোরায়। ঘূর্ণনের পরিমাণ অর্ধবৃত্তাকার পাতের বেধ এবং আপতিত আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। 3·75m.m.

বেধবিশিষ্ট পাত এবং হলুদাভ সবুজ আলোর (তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রায় 5600 Å)ক্ষেত্রে ঘূর্ণনের পরিমান 90° হয়।

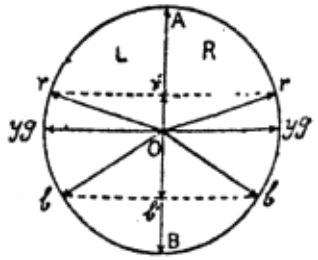

চিত্র **10.4.4**

ধরা যাক যুগ্ম-কোয়ার্টসে আপতিত আলোর কম্পন AB এর সমান্তরাল (চিত্র নং 10.4.4 দেখুন)। প্রতি অর্ধাংশে হলুদাভ সবুজ আলো (yg) AB এর সাপেক্ষে 90° ঘোরে। লাল (r) আলো নীল (b) আলোর চেয়ে কম ঘোরে। বিশ্লেষক নিকলের ছোট কর্ণটি AB এর সমান্তরাল করে রাখা হলে, হলুদাভ-সবুজ আলো বিশ্লেষক দিয়ে যেতে পারে না, কিন্তু অন্যান্য রংয়ের আলো সমপরিমাণে বিশ্লেষক দিয়ে নির্গত হয়। ফলে দৃষ্টি ক্ষেত্রে আলোর রং ধূসরাভ-বেগুনী এবং এই অবস্থাকে টিন্ট্ অফ্ প্যাসেজ বলে। উপরোক্ত অবস্থা থেকে বিশ্লেষককে সামান্য ঘোরালে দৃষ্টিক্ষেত্রের অর্ধাংশ গোলাপী এবং অপর অর্ধাংশ গাঢ় নীল রংয়ের হয়, কারণ অর্ধাংশে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে লাল আলো এবং অপর অর্ধাংশে অধিক পরিমাণে নীল আলো পৌঁছায়। পরীক্ষার জন্য কোন আলোক সক্রিয় পদার্থ সমবর্তক এবং বিশ্লেষকের মধ্যে রাখা হয়। আলোক সক্রিয় পদার্থ আনার আগে ও পরে বিশ্লেষককে টিন্ট্ অফ্ প্যাসেজে রাখা হয় এবং দুই অবস্থার পাঠের ব্যবধান থেকে সমবর্তক তলের ঘূর্ণন মাপা যায়।

উপরে আলোচিত তিনটি সংযুক্তির মধ্যে Lippich সমবর্তক সর্বাপেক্ষা অধিক সুবেদী। ইহার একটি সুবিধা হোল ইহা একবর্ণী আলোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়।

10.5 সমবর্তন ঘূর্ণনমাপীর সাহায্যে চিনির দ্রবণের ঘনত্ব নির্ণয়

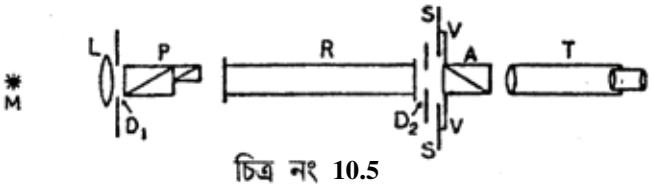

চিত্র নং **10.5**

M = একবর্ণী আলোক উৎস, D_1= একটি ডায়াফ্রাম যাহা L লেন্স থেকে নির্গত আলোর উন্মেষ নিয়ন্ত্রণ করে, P = Lippich সমবর্তক, R = পোলারিমিটার নল, A =বিশ্লেষক, V,V = বিশ্লেষকের সঙ্গে আটকানো ভার্নিয়ারদ্বয় যারা চক্রাকার S স্কেলের উপর দিয়ে ঘুরতে পারে। S এবং (V,V) দ্বারা বিশ্লেষক A-এর ঘূর্ণন

মাপা হয়। T টিন্ট্ অফ্ প্যাসেজ দেখার জন্য প্রয়োজনীয় টেলিস্কোপ D_2 = ডায়াফ্রাম যাহা R নল থেকে নির্গত আলোর উন্মেষ নিয়ন্ত্রণ করে।

চিত্র নং 10.5 এ চিনির দ্রবণের ঘনত্ব নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় পোলারিমিটার যন্ত্রসজ্জা দেখানো হয়েছে। λ তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট আলো এবং t °C উষ্ণতায় জলীয় দ্রবণে চিনির আপেক্ষিক ঘূর্ণন, $[\alpha]_t^{\lambda}$ নিম্নলিখিত সমীকরণ দ্বারা লেখা যায়ঃ

$$[\alpha]_t^{\lambda} = \frac{10\theta}{lm} \qquad \text{.....(10.5.1)}$$

যেখানে,

θ = ডিগ্রী মাপে সমবর্তন তলের ঘূর্ণন (λ তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট আলোর ক্ষেত্রে)

l = সেন্টিমিটার মাপে আলো দ্বারা অতিক্রান্ত দ্রবণ পথের দৈর্ঘ্য।

m = t° C উষ্ণতায় প্রতি ঘন সেন্টিমিটার দ্রবণে গ্রাম এককে উপস্থিত আলোক সক্রিয় পদার্থের ভর।

m এর মান নির্ণয় করতে গেলে α-র মান জানা প্রয়োজন। α-র মান কোন জানা ঘনত্বের (ধরা যাক্ m_0) চিনির দ্রবণে ঘূর্ণন θ_0 মেপে নির্ণয় করা যায়। অতঃপর কোন অজানা ঘনত্বের (ধরা যাক m) দ্রবণে ঘূর্ণন θ হলে, নিম্নলিখিত সমীকরণ

$$\frac{\theta}{m} = \frac{\theta_0}{m_0} \qquad \text{..... (10.5.2)}$$

থেকে m এর মান বাহির করা যায়।

θ পরিমাপের জন্য, প্রথমে পোলারিমিটার নলটি জলে ভর্তি করে সমবর্তক ও বিশ্লেষকের মধ্যে রাখা হয় এবং বিশ্লেষককে টিন্ট্ অফ্ প্যাসেজে রেখে পাঠ নেওয়া হয়। তারপর পোলারিমিটার নলে চিনির দ্রবণ ভরে পুনরায় পাঠ নেওয়া হয়। দুই পাঠের পার্থক্য থেকে θ-র মান পাওয়া যায়।

10.6 সারাংশ

(a) প্রকৃতিতে কিছু পদার্থ (যেমন কোয়ার্টস্ কেলাস, চিনির দ্রবণ ইত্যাদি) আছে যার ভিতর দিয়ে তলীয় সমবর্তিত আলো গেলে সমবর্তন তলের ঘূর্ণন হয়—ইহাকে আলোক সক্রিয়তা বা আলোকীয় ঘূর্ণন বলে। উপরোক্ত পদার্থগুলিকে আলোক সক্রিয় পদার্থ বলে।

(b) Fresenel এর ঘূর্ণনের তত্ত্বানুসারে যখন কোন তলীয় সমবর্তিত আলো আলোকাক্ষের দিকে কোন আলোক সক্রিয় মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন উহা দুটি সমান কম্পাংক বিশিষ্ট বিপরীত বৃত্তীয় সমবর্তিত কম্পনে বিভক্ত হয়। দক্ষিণাবর্তী ও বামাবর্তী বৃত্তীয় কম্পনদ্বয় বিভিন্ন গতিবেগে আলোক সক্রিয় মাধ্যমে অগ্রসর হয়—ইহার ফলে সমবর্তন তলের ঘূর্ণন হয়।

(c) কোন আলোক সক্রিয় দ্রবণে (যথা চিনির দ্রবণ) সমবর্তন তলের ঘূর্ণন দ্রবণে উপস্থিত আলোক সক্রিয় পদার্থের সমানুপাতিক। সুতরাং সমবর্তন তলের ঘূর্ণন মেপে দ্রবণে দ্রাবের পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব। শিল্পক্ষেত্রে দ্রবণে চিনির পরিমাণ এই পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয়—ইহাকে শর্করামিতি বলে।

10.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

1. আলোক সক্রিয়তা কাহাকে বলে? একটি আলোক সক্রিয় পদার্থের উদাহরণ দিন। আলোকীয় ঘূর্ণন প্রসঙ্গে ফ্রেনেলের তত্ত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

2. আপেক্ষিক ঘূর্ণন কাহাকে বলে? ইহা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

আলোকাক্ষ তলের অভিলম্বে অবস্থিত এইরূপ একটি কোয়ার্টস্ পাতের সাহায্যে প্রতি এক ঘন সেন্টিমিটারে 0·1 gm. সক্রিয় দ্রাব বর্তমান, এইরূপ ল্যাকটোস্ দ্রবণের 26·7cm. দৈর্ঘ্যে যে সমবর্তন তলের ঘূর্ণন সৃষ্টি হয় তাহা সম্পূর্ণরূপে নাকচ করতে হবে। পাতের বেধ কত হবে? [দেওয়া আছে ঃ— ল্যাকটোসের আপেক্ষিক ঘূর্ণন = 52·5°, কোয়ার্টস পাতে সংশ্লিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ=7660 Å এর জন্য μ_r.=1.53914, μ_c.=1·53920]

3. চিনির দ্রবণ সমেত 200 m.m. লম্বা একটি পোলারিমিটার নল যখন শর্করামিতি যন্ত্রে রাখা হোল তখন 11° আলোকীয় ঘূর্ণন পাওয়া গেল। যদি পরীক্ষাধীন অবস্থায় চিনির আপেক্ষিক ঘূর্ণন 66° হয়, তবে দ্রবণের ঘনত্ব কত?

4. আলোক সক্রিয়তা বিষয়ে Biot এর পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্তগুলি আলোচনা করুন।

10.8 সর্বশেষ উত্তরমালা।

1. অনুচ্ছেদ নং 10.2 এর প্রথমাংশ দেখুন।

10.3 অনুচ্ছেদে ফ্রেনেলের তত্ত্ব দেখুন।

2. 10.2 অনুচ্ছেদের মাঝের অংশ দেখুন. ল্যাকটোস দ্রবণে সমর্বতন তলের ঘূর্ণন θ হলে

$$\theta = \frac{\alpha lm}{10}$$ (9.5.1 সমীকরণ দেখুন)

$$= \frac{52\cdot5 \times 26\cdot7 \times 0\cdot1}{10} = 14\cdot02^\circ$$

'd' বেধের কোয়ার্টস্ পাতের জন্য ঘূর্ণন (θ_2)

প্রকৃতপক্ষে সমবর্তন তলের ঘূর্ণন পেতে হলে 10.3.1 সমীকরণে দেওয়া θ কে 2 দিয়ে ভাগ করতে হবে।

$\theta_q = \frac{2\pi}{\lambda}(\mu_r \sim \mu_l)d$ radian (10.3.1 সমীকরণ দেখুন)

$$= \frac{2\pi}{\lambda}\left(\mu_r \sim \mu_l\right)d \times \frac{180}{\pi}$$

$$= \frac{2}{\lambda}(\mu_r \sim \mu_l)d \times 180$$

$$= \frac{2 \times 0\cdot00006d \times 180}{7\cdot660 \times 10^{-5}} \quad \left[\because 7660\ \text{Å} = 7660 \times 10^{-8}\text{cm}\right]$$

$$= 281\cdot98\ d \ \text{deg ree}$$

$$\therefore 281\cdot98d = 14\cdot02^\circ$$

$$\therefore d = \frac{14\cdot02}{281\cdot98} = 0\cdot0497\text{cm}$$

[প্রকৃতপক্ষে সমবর্তন তলের ঘূর্ণন পেতে হলে 10.3.1 সমীকরণে দেওয়া θ কে 2 দিয়ে ভাগ করতে হবে।]

3. $\theta = \frac{\alpha lm}{10}$ (10.5.1 সমীকরণ দেখুন)

$$= \frac{66 \times 20 \times m}{10}; \quad l = 200\text{mm}$$

$$= 20\text{cm}$$

$$= 0.0833^\circ$$

4. 10.2 অনুচ্ছেদে Biot এর পরীক্ষালব্ধ ফল দেখুন।

একক ❑ 11 লেজার ও হলোগ্রাম

গঠন

11.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

11.2 লেজারের কার্যপ্রণালী

11.2.1 ভূমিকা

11.2.2 আইনস্টাইন গুণাংক (Einstein Coefficients) ও আলোর বিবর্ধন

11.2.3 লেজার কার্যকরী করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

11.2.4 কাল ও দেশ সম্পর্কীয় সুসম্বদ্ধতা (Temporal and Spatial coherence)

11.3 বিবিধ লেজার

11.3.1 চুনি লেজার

11.3.2 হিলিয়াম নিয়ন লেজার

11.3.3 আরও কয়েকটি লেজার

11.4 লেজারের নানা ব্যবহারিক প্রয়োগ

11.5 হলোগ্রাম ও হলোগ্রাফ পদ্ধতি

11.5.1 ভূমিকা

11.5.2 তত্ত্ব

11.5.3 ব্যবহারিক প্রয়োগ

11.6 সংক্ষিপ্তসার

11.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

11.8 উত্তরমালা

11.1 প্রস্তাবনা

এ পর্যন্ত আপনি আলোর বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে জেনেছেন। এ-বিষয়ে ধারণা করার জন্য এই সব তথ্য খুবই জরুরী। কিন্তু এর পরেও আধুনিক কালে আলোর বিচিত্র প্রকৃতি এবং তার বিবিধ প্রয়োগ নিয়ে এক নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। একক 10এ আপনি সাম্প্রতিক কালে আলোক সম্পর্কিত দু'টি যুগান্তকারী আবিষ্কারের

সঙ্গে পরিচিত হবেন । এই দু'টি আবিষ্কারের প্রথমটি হ'ল লেজার (Laser) এবং দ্বিতীয়টি হ'ল হলোগ্রাম (Hologram) ও হলোগ্রাফ পদ্ধতি (Holography)। বৈজ্ঞানিক গবেষণার আঙ্গিনার বাইরে এই দুই অভিনব আবিষ্কার নানাবিধ প্রয়োগের জন্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে পড়েছে । লেজার কথাটি হল - 'light amplification by stimulated emision of radiation' (বাংলায় উদ্দীপিত; বিকিরণের সাহায্যে আলোকের বিবর্ধন) এই ইংরাজি শব্দগুচ্ছের আদ্যক্ষর দিয়ে গঠিত । সাধারণ আলোক উৎস, যেমন বিজলী বাতি (Incamdesecent lamp) থেকে যে আলো পাওয়া যায় সেই আলো সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে, এর কোন সুসম্বদ্ধতা (Coherence) নেই এবং সাধারণত এই আলোয় অনেক তরঙ্গদৈর্ঘ্যও থাকে । কিন্তু লেজার এমন একটি অভিনব আলোক উৎস যা' প্রায় একবর্ণী, অতি সমান্তরাল, একমুখী, অত্যন্ত শক্তিশালী ও সুসম্বদ্ধ (coherent) আলোক রশ্মি সৃষ্টি করতে পারে।

লেজার অবিষ্কারের পিছনে এক ঐতিহাসিক পটভূমিকা আছে। গত শতাব্দীর চতুর্থ দশকের শেষের দিকে মাইক্রো তরঙ্গের সঙ্গে অণু পরমাণুর পারস্পরিক ক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করেছিলেন মার্কিন পদার্থ বিজ্ঞানী চার্লস্ টাউনস্ (Charles Townes)। ১৯১৭ সালেই আইনস্টাইন তাপগতিবিদ্যার সাহায্য নিয়ে বলেছিলেন যে স্বতঃস্ফূর্ত বিকিরণ (spontaneous emission) ছাড়াও অণু বা পরমাণু থেকে ফোটন নির্গত হওয়ার আর একটি উপায় হ'ল - উদ্দীপিত বিকিরণ (Stimulated emission) যা' পরে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার মাধ্যমেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে । ১৯৫৪ সালে টাউনস্ উদ্দীপিত বিকিরণের ধারণাকে প্রয়োগ করে মাইক্রো তরঙ্গের বিবর্ধক তৈরি করতে সফল হয়েছিলেন। রশিয়ার প্রখোরভ (Prochorov) এবং বাসভ (Basov) প্রায় একই সময়ে অনুরূপ যন্ত্র তৈরি করেন । এর বৈশিষ্ট্য হল যে এই যন্ত্র দিয়ে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন সুসম্বদ্ধ মাইক্রো তরঙ্গের সৃষ্টি করা যায় । টাউনস্ এই যন্ত্রের নাম দেন মেজার (Maser) যা হ'ল Microwave Amplification by stimulated Emission of Radiation শব্দগুচ্ছের আদ্যক্ষর দিয়ে সৃষ্টি । এই সাফল্যের পরে পদার্থ বিজ্ঞানীদের মনে স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন এসেছিল যে মাইক্রোতরঙ্গ থেকে অনেকটা ক্ষুদ্রতর দৈর্ঘ্যের আলোক তরঙ্গের ক্ষেত্রে এই প্রচেষ্টা সফল হবে কিনা। ১৯৫৮ সালে টাউনস্ ও আর্থার শ্যালো (Arthur Schawlow) আলোর ক্ষেত্রে বিবর্ধক তৈরির জন্য কি কি শর্ত পালন করতে হবে তা নির্ণয় করেন । কিন্তু সাফল্য এলো আরও পরে। ১৯৬০ সালে থিয়োডোর মেইম্যান (Theodore Maiman) সর্বপ্রথম সার্থক আলোকীয় মেজার বা লেজার তৈরি করতে সক্ষম হন। আলোক বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই সাফল্য এক যুগান্তকারী ঘটনা হিসাবে চিরকাল বিবেচিত হবে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে মেজার ও লেজার আবিষ্কারের বিশেষ অবদানের জন্য টাউনস্, প্রঘোরভ ও বাসভ কে পদার্থ বিজ্ঞানে ১৯৬৪ সালে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।

লেজারের কার্যপ্রণালী ও অন্যান্য তথ্য আমরা 11.2 – 11.4 এ আলোচনা করেছি।

আমাদের আলোচ্য দ্বিতীয় যুগান্তকারী আবিষ্কার হ'ল হলোগ্রাম ও হলোগ্রাফ পদ্ধতি । ক্যামেরা দিয়ে যখন গাছপালা, জীবজন্তু, মানুষ, ঘরবাড়ি বা কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি তোলা হয় তখন ত্রি-মাত্রিক বস্তু থেকে নির্গত আলো ফিল্মে দ্বিমাত্রিক পর্দায় ফেলা হয় । লক্ষ্যবস্তু থেকে যে আলো আসে তা' ফটো ফিল্মের নেগেটিভে আলোর তীব্রতা অনুযায়ী অভিলেখন সৃষ্টি করে । আলোর ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত আলোক তরঙ্গের বিস্তার ও দশাকে নথিভুক্ত না করে তা তরঙ্গের তীব্রতাকে নথিভুক্ত করে । নেগেটিভ ফিল্ম থেকে পজিটিভ প্রিন্ট নেওয়ার পর যে ছবি আমরা দেখি তা' ত্রি-মাত্রিক কোন বস্তুর দ্বিমাত্রিক পর্দার ওপরে লিখিত একটি নথি । আলোকচিত্রে বস্তুর ত্রিমাত্রিক অবস্থা সংরক্ষিত হয় না। এর ফলে চোখের অবস্থানের পরিবর্তন করে অলোকচিত্রের বস্তুর অবস্থানগত কোন পরিবর্তন করা যাবে না। হলো গ্রাম তৈরি করে হলোগ্রাফ পদ্ধতির মাধ্যমে আলোকচিত্রের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করা সম্ভবপর হয়েছে । হলোগ্রামের সাহায্যে প্রকৃত ত্রি-মাত্রিক প্রতিবিম্ব গঠন করা সম্ভব হয়েছে যা' দ্রষ্টার অবস্থানের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যে মনে হবে আমরা প্রকৃত কোন ত্রিমাত্রিক লক্ষ্য বস্তু খালি চোখে দেখছি।

হলোগ্রাফ পদ্ধতি উদ্ভাবনের ইতিহাস বেশ চিত্তার্কষক। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ পদার্থ বিজ্ঞানী ডেনিস গেবর (Dennis Gabor) ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে যে প্রতিবিম্ব পাওয়া যায় তার উন্নতি বিষয়ে গবেষণা করছিলেন। প্রতিবিম্বের বিভেদনের (Resolution) কি ভাবে উন্নতি করা যায় সে বিষয়ে চিন্তা করতে করতে হলোগ্রাফ পদ্ধতির ধারণা তাঁর মাথায় আসে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ সনের মধ্যে এ বিষয়ে তাঁর একধিক বিস্তারিত গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয় । কিন্তু সেই সময়ে আলোক উৎসের সুসম্বদ্ধ দৈর্ঘ্য (coherence length) খুব কম হওয়ায় হলোগ্রাফ পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ খুবই কঠিন ছিল । সেইজন্য প্রথমে এই পদ্ধতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি । কিন্তু ১৯৬০ সালে লেজার আবিষ্কারের পর এ পদ্ধতির ব্যাপক বিকাশ ঘটে কারণ লেজার থেকে নির্গত অলোর সুসম্বদ্ধ দৈর্ঘ্য অনেক বেশী। কয়েক বছরের মধ্যেই বৈজ্ঞনিক গবেষণায় কারিগরী শিল্পে এবং দৈনন্দিন জীবনেও হলোগ্রাম ও হলোগ্রাফ পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়।

ত্রিমাত্রিক লেন্স বিহীন আলোকচিত্র বা হলোগ্রাফ পদ্ধতির অসাধারণ আবিষ্কারের জন্য ডেনিস গেবরকে ১৯৭১ সালে পদার্থ বিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কারে সম্মনিত করা হয়। বর্তমানে হলোগ্রাফ পদ্ধতির ওপর গবেষণা ও তার প্রয়োগ নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন গবেষণাগারে বহু বিজ্ঞানী নিযুক্ত আছেন।

10.5 এ আমরা হলোগ্রাম ও হলোগ্রাফ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছি।

উদ্দেশ্য ঃ

এই একক পাঠ করে আপনি

আধুনিক আলোক বিদ্যার দুই যুগান্তকারী আবিষ্কার লেজার ও হলোগ্রাফ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন। লেজারের কার্যপ্রণালীর ভিত্তি হিসাবে উদ্দীপিত বিকিরণ আইনস্টাইন গুণাংক, জনসংখ্যার বিপরীত, ক্রমতা আলোর বিবর্ধন, অনুনাদগহ্বর ইত্যাদি মৌলিক বিষয়গুলি সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে পারবেন ।

- বিবিধ লেজার ও লেজারের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে জানতে পারবেন ।
- হলোগ্রাম ও হলোগ্রাফ পদ্ধতির তাত্ত্বিক ভিত্তি সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞানলাভ করবেন।
- হলোগ্রাম ও হলোগ্রাফ পদ্ধতির নানা ব্যবহার সম্পর্কে জানবেন

11.2 লেজার কার্যপ্রণালী

11.2.1 ভূমিকা

লেজার কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা করার জন্য আমাদের কয়েকটি বিষয় জানতে হবে। একটি হ'ল অণু পরমাণু ফোটন বিকিরণ ও শোষণ। কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে আমারা জানি যে অণু বা পরমাণু বিভিন্ন পৃথক শক্তিস্তরে থাকতে পারে। অণু বা পরমাণু থেকে ফোটন নির্গত হওয়ার একটা উপায় হ'ল অণু বা পরমাণু উচ্চতর শক্তি অবস্থা E_2 থেকে নিম্নতর শক্তি অবস্থা E_1 স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে (spontaneous emission) নেমে আসা। ফোটনের কম্পাংক ν হলে $h\nu = E_2 - E_1$ (h প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক) বিপরীতভাবে E_1 শক্তি স্তরে অবস্থিত কোন অণু বা পরমাণু $h\nu$ শক্তির কোন ফোটন শোষণ করলে ঐ বস্তুকণা E_2 শক্তিস্তরে উন্নীত হবে । স্বতঃস্ফূর্ত বিকিরণের ফলে যে সব ফোটন পাওয়া যায় তাদের পরস্পরের দশার (phase) মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সম্পর্ক থাকেনা। এই কারণে এভাবে যে আলো পাওয়া যায় তার প্রকৃতি হ'ল অসম্বদ্ধ (Incoherent) । অণু পরমাণুর বিভিন্ন শক্তিস্তরের মধ্যে ওঠা নামার এই দুই উপায় ছাড়াও তৃতীয় আর একটি পদ্ধতি হ'ল উদ্দীপিত বিকিরণ (stimulated emission) প্রক্রিয়া। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সাহায্যে এই প্রক্রিয়া বুঝতে পারা যায়। কিন্তু তার আগেই আইনস্টাইন ১৯১৭ সালে এই তৃতীয় প্রক্রিয়ার কথা বলেন যার বিশেষত্ব হ'ল এই যে $h\nu = E_2 - E_1$ শক্তির কোন ফোটন থাকলে তা' অণু বা পরমাণুকে E_2 শক্তিস্তর থেকে E_1 শক্তির স্তরে নেমে আসতে উদ্দীপিত করতে পারে। এভাবে একটি $h\nu$ ফোটন আর একটি $h\nu$ ফোটন সৃষ্টি করতে সাহায্য করে এবং এভাবে একটি $h\nu$ ফোটনের জায়গায় দু'টি $h\nu$ ফোটন পাওয়া যাবে। এই প্রক্রিয়ার বিশেষভাবে লক্ষনীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে উদ্দীপক ফোটন ও নির্গত ফোটন সম্পূর্ণভাবে সদৃশ। উভয় ফোটনেরই একই দিক নির্দেশ, একই সমাবর্তন ও একই দশা থাকে। এভাবে দুটি সুসম্বদ্ধ ফোটন

পাওয়া যায়। এই দুটি ফোটন যদি E_2 স্তরে আছে এমন আরও দু'টি অণু বা পরমাণুর ওপর আপতিত হয় তা হলে উদ্দীপিত বিকিরণ প্রক্রিয়ায় আরও দুটি সুসম্বদ্ধ ফোটন পাওয়া যাবে এবং এভাবে ফোটনের সংখ্যা দাঁড়াবে চার। এই চারটি ফোটন যদি আবার আরও চারটি অণু বা পরমাণুকে E_2 স্তর থেকে E_1 স্তরে নিয়ে যেতে উদ্দীপিত করে তা'হলে মোট আটটি একমুখী সুসম্বদ্ধ ফোটন পাওয়া যাবে। এই প্রক্রিয়া বারংবার প্রয়োগ করে অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল সংখ্যায় সুসম্বদ্ধ ফোটন পাওয়া সম্ভব হতে পারে এবং এভাবে একমুখী তীব্র শক্তি সম্পন্ন সুসম্বদ্ধ আলোকরশ্মি সৃষ্টি করা যেতে পারে। (চিত্র **11.1**)

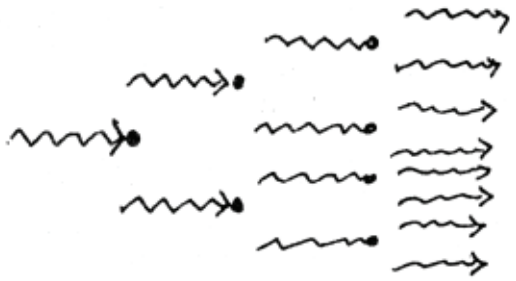

(চিত্র **11.1**)

লেজার রশ্মি সৃষ্টিতে উদ্দীপিত বিকিরণ প্রক্রিয়া নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া সাফল্যের সঙ্গে কাজ করতে পারে তখনই যখন নিম্নতর শক্তিস্তর E_1এ থাকা অণু বা পরমাণুর তুলনায় উচ্চতর শক্তিস্তর E_2-তে বেশী সংখ্যায় অণু বা পরমাণু থাকবে। এই চাহিদা কিন্তু সাধারণ অবস্থার বিপরীত। E_1 স্তরে n_1 এবং E_2 স্তরে n_2 অণু বা পরমাণু থাকলে সাধারণ অবস্থায় $n_1 > n_2$ হবে। কিন্তু লেজার তৈরী করতে হলে প্রয়োজন $n_2 > n_1$। এই বিশেষ অবস্থাকে বলা হয় 'জনসংখ্যার বিপরীত ক্রমতা' (Population inversion)। এই শর্ত পালন করার জন্য কি বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয় তা' আমরা পরে আলোচনা করব।

এই সংক্ষিপ্ত সাধারণ ভূমিকার পরে আমরা তত্ত্বের সাহায্য নিয়ে আরও বিশদভাবে লেজারের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে আলোচনা করব।

11.2.2 আইনস্টাইন গুণাংক (Einstein Coefficients) ও আলোর বিবর্ধন

আমরা প্রথমে স্বতঃস্ফূর্ত বিকিরণ ও উদ্দীপিত বিকিরণ সম্পর্কে আইনস্টাইনের তত্ত্ব আলোচনা করে আলোর বিবর্ধন গণনা করব।

মনে করি দু'টি শক্তিস্তর আছে 1 নং ও 2 নং যাদের শক্তির মান যথাক্রমে E_1 ও E_2 এবং একক আয়তনে N_1 পরমাণু 1নং শক্তিস্তরে ও N_2 পরমাণু 2নং শক্তিস্তরে অবস্থান করছে। কোন পরমাণু নিম্নতর শক্তিস্তর E_1 থেকে বিকিরণ শোষণ করে উচ্চতর শক্তিস্তর E_2-তে চলে যেতে পারে। এই উত্তরণের হার

নির্ভর করছে ঐ দুই শক্তিস্তরের শক্তি পার্থক্যের সঙ্গে যুক্ত কম্পাংক ν এবং বিকিরণ শক্তির ঘনত্ব $u(\nu)$ এর ওপর। $u(\nu)d\nu$ হ'ল ν ও $\nu+d\nu$ কম্পাংকের মধ্যে একক আয়তনে যে বিকিরণ শক্তি আছে তার মান। এই উত্তরণের হার N_1 ও $u(\nu)$ এর সঙ্গে একই সাথে সমানুপাতিক। একক আয়তনে একক সময়ে যে সব পরমাণু শক্তি শোষণ করে 1নং স্তর থেকে 2নং স্তরে উত্তীর্ণ হয় সেই সংখ্যা হ'ল $B_{12}N_1U(\nu)$। এখানে B_{12}সমানুপাতিক গুণক।

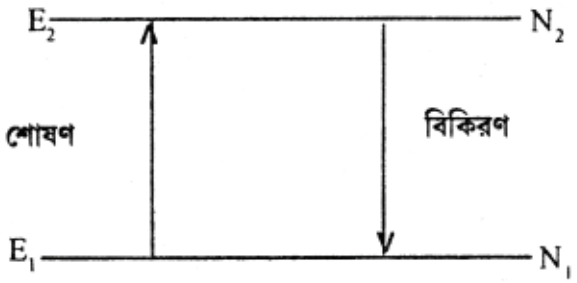

চিত্র **11.2**

শোষণের বিপরীত প্রক্রিয়াতে পরমাণু উত্তেজিত স্তর E_2 থেকে E_1 স্তরে নেমে আসে ও ν কম্পাঙ্কের ফোটন ত্যাগ করে। এই প্রক্রিয়ার বিষয় ব্যাখ্যা করতে আইনস্টাইন সর্বপ্রথম উদ্দীপিত বিকিরণের ধারণার সূত্রপাত করেন। তাঁর মত হ'ল এই যে কোন পরমাণু ν উচ্চতর শক্তিস্তর থেকে নিম্নস্তর স্তরে দু'ভাবে নেমে আসতে পারে। একটি উপায় হ'ল স্বতঃস্ফূর্ত বিকিরণ এবং দ্বিতীয় উপায় হ'ল উদ্দীপিত বিকিরণ। স্বতঃস্ফূর্ত বিকিরণের সময় কোন পরমাণুর নিম্নতর শক্তি স্তরে নেমে আসার সম্ভাব্যতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে যে দুটি শক্তিস্তরের মধ্যে এই পরিবর্তন হচ্ছে তার ওপর কিন্তু কোনভাবেই বিকিরণ শক্তির ঘনত্বের ওপর নয়। তাই স্বতঃস্ফূর্ত বিকিরণের হার অর্থাৎ একক সময় ও একক আয়তনে স্বতঃস্ফূর্ত বিকিরণের সংখ্যা হবে N_2A_{21}। এখানে A_{21} হ'ল সমানুপাতিক গুণক। উদ্দীপিত বিকিরণের ক্ষেত্রে নিম্নতর স্তরে পরিবর্তনের হার ν কম্পাংকে বিকিরণ শক্তির ঘনত্বের ওপর সরাসরি সমানুপাতিক। এই কারণে উদ্দীপিত বিকিরণের হার হবে $N_2B_{21}.U(\nu)$। এখানে B_{21} হল উদ্দীপিত বিকিরণের ক্ষেত্রে সমানুপাতিক গুণক। A_{21}, B_{12}, ও B_{21} এই তিন সমানুপাতিক গুণক আইনস্টাইন গুণাংক (Einstein coefficients) নামে পরিচিত। এদের মান পরমাণু নির্ভর। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সাহায্যে যে কোন পরমাণুর ক্ষেত্রে আইনস্টাইন গুণাংক গননা করা সম্ভব। আইনস্টাইন কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সূত্রপাতের আগেই সঠিকভাবে উদ্দীপিত বিকিরণের ধারণা দেন।

তাপীয় সাম্য অবস্থায় E_1 থেকে E_2 স্তরে ওঠার হার বিপরীত প্রক্রিয়ায় E_2 থেকে E_1 স্তরে নামার হারের

সমান হবে অর্থাৎ

$$N_1B_{12}U(\nu) = N_2A_{21} + N_2B_{21}U(\nu)$$

অথবা $$U(\nu) = \frac{A_{21}}{\frac{N_1}{N_2}B_{12} - B_{21}} \quad \text{..... (11.1)}$$

বোলৎস্‌মান সূত্র অনুযায়ী T পরম তাপমাত্রায় দুই স্তরে থাকা পরমাণুর সংখ্যার অনুপাত হবে

$$N_1/N_2 = \exp\left(\frac{E_2 - E_1}{KT}\right) = \exp\left(\frac{h\nu}{KT}\right) \text{... (11.2)}$$

K বোলৎস্‌মান ধ্রুবাংক।

সুতরাং (10.1) কে লেখা যায়,

$$U(\nu) = \frac{A_{21}}{B_{12}\exp\left(\frac{h\nu}{KT}\right) - B_{21}}$$

$$= \frac{A_{21}}{B_{21}\left[\frac{B_{12}}{B_{21}}\exp\left(\frac{h\nu}{KT}\right) - 1\right]} \quad \text{..... (11.3)}$$

প্ল্যাঙ্কের সূত্রানুযায়ী বিকিরণ শক্তির ঘনত্বের পরিমাপ হল,

$$U(\nu) = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \cdot \frac{1}{\exp\left(\frac{h\nu}{KT}\right) - 1} \quad \text{.....(11.4)}$$

(10.3) ও (10.4) তুলনা করে আমরা পাই,

$$A_{21}/B_{21} = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \quad \text{এবং} \quad B_{12} = B_{21} \text{..... (11.5)}$$

(11.5) থেকে দেখা যাচ্ছে যে উদ্দীপিত বিকিরণ ও উদ্দীপিত শোষণের সম্ভাব্যতা সমান। এখানে লক্ষণীয় যে উদ্দীপিত বিকিরণের ধারণা বাদ দিলে U(ν) এর গাণিতিক রূপ কখনই প্ল্যাঙ্কের সূত্রের মত হবে না।

তাপীয় সাম্য অবস্থায় স্বতঃস্ফূর্ত বিকিরণ ও উদ্দীপিত বিকিরণের সংখ্যার অনুপাত হ'ল,

$$\frac{A}{BU(\nu)} = \exp(h\nu / KT) - 1 \quad \text{..... (11.6)}$$

যদি $h\nu/KT << 1$ অর্থাৎ $\nu << \frac{KT}{h}$ তা হ'লে $\exp\left(\frac{h\nu}{KT}\right) - 1 << 1$ এবং $A/BU(\nu) << 1$ হবে অর্থাৎ উদ্দীপিত বিকিরণের সংখ্যা স্বতঃস্ফূর্ত বিকিরণের সংখ্যা থেকে অনেক বেশী হবে। পক্ষান্তরে $h\nu/KT >> 1$ বা $\nu >> \frac{KT}{h}$ হলে, বিপরীত অবস্থা দেখা যাবে অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত বিকিরণের সংখ্যা উদ্দীপিত বিকিরণের সংখ্যা থেকে অনেক বেশী হবে। সাধারণ আলোক উৎসের জন্য তাপমাত্রা মোটামুটি $T \sim 10^3$ K° ধরা যেতে পারে।

এক্ষেত্রে $\frac{KT}{h} = \frac{1.3807 \times 10^{-23}(J/K°) \times 10^3(K°)}{6{\cdot}62618 \times 10^{-34}(J\ sec)}$

$= 2{\cdot}08 \times 10^{13}\ sec^{-1}$

সাধারণ আলোক তরঙ্গের কম্পাংক $\nu \sim 6 \times 10^{14}\ sec^{-1}$ ধরা যেতে পারে। অর্থাৎ এখানে $\nu << \frac{KT}{h}$ এই শর্ত পালিত হচ্ছে অতএব আলোর কম্পাংকে আলোক উৎস থেকে মূলতঃ স্বতঃস্ফূর্ত বিকিরণের মাধ্যমে আলো পাওয়া যাবে। এই কারণে সাধারণ আলোক উৎস থেকে সুসম্বদ্ধ আলো পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

লেজারের কার্যপ্রণালী অনুধাবন করার জন্য আমাদের জানতে হবে আলোর বিবর্ধন কীভাবে করা যেতে পারে। এতক্ষণ পরমাণুর বিভিন্ন শক্তিস্তরকে আমরা E_1, E_2 .....ইত্যাদি দ্বারা চিহ্নিত করেছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন শক্তিস্তরের শক্তির একটি মান না হয়ে তার একটি বিস্তার থাকে। এর পিছনে কয়েকটি কারণ আছে ঃ

(১) উষ্ণতার জন্য পরমাণুদের গতি আছে এবং সেই কারণে তাদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে স্থির অবস্থায় পরমাণু যে শক্তিস্তরে থাকতে পারে সেই মান থেকে কিছুটা বিচ্যুতি ঘটে।

(২) হাইসেন বার্গের অনির্দেশ্যনীতির জন্য ফোটনের কম্পাংক $\nu = \left(E_2 - E_1\right)/h$ একটি না হয়ে তার একটি বিস্তার থাকে।

৩) ডপলার ক্রিয়ার জন্যও ফোটনের কম্পাংকের বিস্তার হতে পারে।

চিত্র 11.3 এ 1নং ও 2 নং শক্তিস্তরের বিস্তার দেখান হয়েছে। পরমাণুর শক্তিস্তরের বিস্তারের জন্য

2 নং স্তর থেকে 1 নং স্তরে পরিবর্তনের ফলে যে বর্ণালি রেখার সৃষ্টি হয় তা কম্পাংক ν এর ওপর নির্ভরশীল এবং এই বিষয়টি প্রকাশ করা হয় পরিমিত বর্ণালি রেখা আকৃতির অপেক্ষক (Normalized line shape function) $g(\nu)$ দিয়ে।

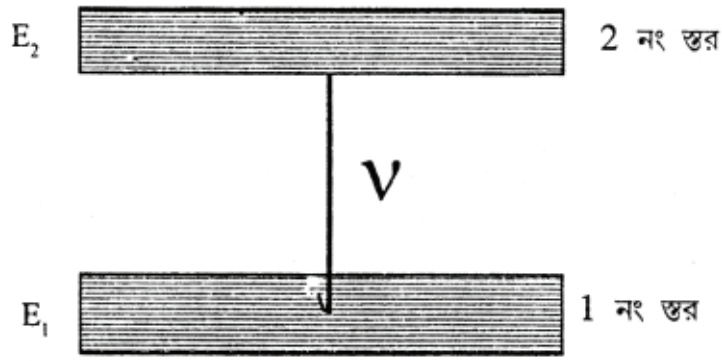

চিত্র **11.3**

$g(\nu)$ এর সংজ্ঞা অনুসারে $\int g(\nu)d\nu = 1$ প্রতি একক আয়তনে প্রতি একক কম্পাংক ব্যবধানে 1 নং ও 2 নং স্তরে পরমাণু সংখ্যা যথাক্রমে $n_1(\nu)$ ও $n_2(\nu)$ হলে, $g(\nu)$ এর সাহায্যে আমরা লিখতে পারি

$n_1(\nu) = N_1 g(\nu)$ এবং $n_2(\nu) = N_2 g(\nu)$

1নং ও 2নং শক্তিস্তরের মধ্যে প্রতি একক আয়তনে একক সময়ে ν ও $\nu+d\nu$ কম্পাংকের ফোটন শোষিত হওয়ায় শক্তি ব্যয়ের পরিমাপ হল: $h\nu B_{12} n_1(\nu)d\nu U(\nu)$

এবং উদ্দীপিত বিকিরণের মাধ্যমে ν ও $\nu+d\nu$ কম্পাংকের ফোটন নির্গত হওয়ার শক্তিবৃদ্ধির পরিমাপ হল $h\nu B_{21} n_2(\nu)d\nu U(\nu)$

তা'হলে মাধ্যমে একক আয়তনে একক সময়ে ν ও $\nu+d\nu$ কম্পাংকের শক্তির ঘনত্বের পরিবর্তনের হারকে লেখা যায় $\frac{d}{dt}[u(\nu)d\nu] = h\nu Bu(\nu)\left[n_2(\nu) - n_1(\nu)\right]d\nu$ ..... (11.7)

এখানে $B = B_{12} = B_{21}$

dt সময়ে আলো মাধ্যমের মধ্যে dx দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে।

সুতরাং $dx = vdt$, v হল মাধ্যমে আলোর গতিবেগ।

$v = C/\mu$, C =শূন্যস্থানে আলোর গতিবেগ এবং

μ মাধ্যমের প্রতিসরণ গুণাংক। ν কম্পাংক আলোর তীব্রতা ও শক্তির ঘনত্বের মধ্যে সম্পর্ক হ'ল $I(\nu) = vU(\nu)$

সুতরাং (11.7) থেকে পাওয়া যায়,

$$\frac{d}{dx}\left[u(\nu)d\nu\right] = \frac{h\nu}{v}Bu(\nu)\left[n_2(\nu) - n_1(\nu)\right]$$

উভয়পক্ষ ν দিয়ে গুণ করে আমরা পাই,

$$\frac{d}{dx}\left[u(\nu)d\nu\right] = \frac{h\nu}{v}Bu(\nu)\left[n_2(\nu) - n_1(\nu)\right]d\nu$$

অথবা $\frac{dI(\nu)}{I(\nu)} = -\alpha(\nu)dx$ ..... (11.9)

এখানে $\alpha(\nu) = \frac{\mu}{c}h\nu B\left[n_1(\nu) - n_2(\nu)\right]$

$$= \frac{\mu}{c}h\nu B\left[N_1 - N_2\right]g(\nu) \quad \text{.....(11.10)}$$

(11.9) থেকে সমাকলনের সাহায্যে পাওয়া যায়,

$I(\nu) = I_\nu(x=0)e^{-\alpha(\nu)x}$ ..... (11.11)

(11.11) সমীকরণ নির্ণয় করছে মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে x দূরত্বে অগ্রসর হওয়ার সময় আলোক রশ্মির তীব্রতা কিভাবে পরিবর্তিত হয়। তাপীয় সাম্যাবস্থায় নিম্নতর শক্তি অবস্থার পরমাণু সংখ্যা উচ্চতর শক্তি অবস্থার পরমাণু সংখ্যা থেকে বেশী হবে। সুতরাং $N_1 > N_2$ (11.10) থেকে আপনি লক্ষ্য করবেন যে $\alpha\nu$ এক্ষেত্রে একটি ধনাত্মক রাশি এবং সেই কারণে আলোক রশ্মির তীব্রতা মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে আলোক রশ্মি অগ্রসর হওয়ার সময়ে নিম্নতর শক্তিস্তরে অবস্থিত পরমাণুকে উচ্চতর শক্তিস্তরে অবস্থিত পরমাণুতে নিয়ে যেতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং এভাবে আলোকরশ্মি থেকে শক্তি শোষিত হয়। কিন্তু যদি কোনভাবে এমন অবস্থা সৃষ্টি করা যায় যে $N_2 > N_1$ তা'হলে $\alpha\nu$ ঋণাত্মক রাশি হবে এবং (11.11) অনুসারে আলোকরশ্মি মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হওয়ার সময়ে আলোকরশ্মির শক্তি বৃদ্ধি পাবে। এই বিশেষ অবস্থাকে বলা হয় আলোর বিবর্ধন। এ-অবস্থা পেতে গেলে প্রয়োজনীয় নিম্নতর শক্তি স্তরের তুলনায় উচ্চতর শক্তিস্তরে অধিক সংখ্যায় পরমাণুর অবস্থান করার শর্ত। এই অবস্থার নামকরণ করা হয়েছে 'জনসংখ্যার বিপরীত ক্রমতা' (Population Inversion)।

11.2.3 লেজার কার্যকরী করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

আলোর বিবর্ধন ও জনসংখ্যার বিপরীত ক্রমতা সম্পর্কে আপনি জেনেছেন। এখন আমরা আপনাকে সরাসরি লেজারের কার্যপ্রণালীর একটি বিবরণ দেব যা' থেকে এ-বিষয়ে আপনি একটি সঠিক ধারনা করতে পারবেন।

যে কোন লেজার যন্ত্রের তিনটি মূল অংশ আছে

১। একটি সক্রিয় মাধ্যম ২। আলোক অনুনাদক (Optical resonator) ৩। আলোক বা অন্য পাম্পিং ব্যবস্থা।

সক্রিয় মাধ্যম ঃ

সক্রিয় মাধ্যম হ'ল অণু, পরমাণু বা আয়নের সমবায়ে সৃষ্ট কোন কঠিন, তরল বা বায়বীয় পদার্থ। এই মাধ্যম আলোর বিবর্ধক হিসাবে কাজ করে। আপনি আগেই জেনেছেন যে বিবর্ধক হিসাবে সফল হতে গেলে জনসংখ্যার বিপরীত ক্রমতার অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে।

কিভাবে তা' করা যায়? দু'টি শক্তিস্তরের মধ্যে জনসংখ্যার বিপরীত ক্রমতা সৃষ্টি করার জন্য তিনস্তর এবং চারস্তর ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়া হয়।

চিত্র 10.4 এ তিনস্তর লেজার ব্যবস্থা প্রদর্শিত হয়েছে।

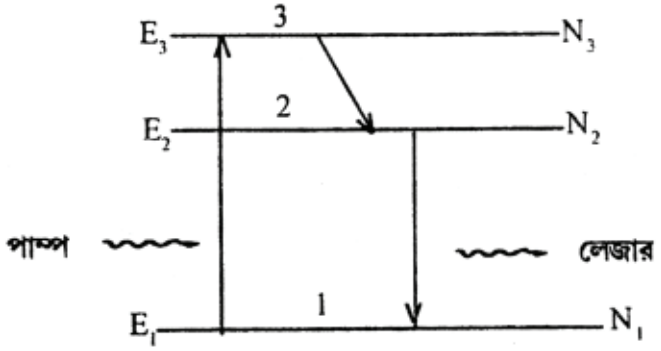

চিত্র **11.4**

1 নং স্তর ভূমিস্ত স্তর। 2 নং ও 3 নং স্তর উত্তেজিত স্তর। আলোক পাম্পের সাহায্যে 1 নং স্তর থেকে পরমাণুদের 3 নং উত্তেজিত স্তরে উত্তোলিত করা হয়। সেখান থেকে পরমাণুরা অতি দ্রুত অবিকিরণ প্রক্রিয়ায় 2 নং স্তরে নেমে আসে । এভাবে পাম্পের সাহায্যে পরমাণুকে 1 নং স্তর থেকে 3 নং স্তরের মধ্যে দিয়ে 2 নং স্তরে নিয়ে আসা হয়। 2 নং স্তরটি মিতস্থায়ী (Metastable) হতে হবে। (জীবনকাল~10^{-3}sec) 3 নং স্তর থেকে 2 নং স্তরে নেমে আসা অতিদ্রুত হ'লে অধিকাংশ পরমাণুই 3নং থেকে 1নং স্তরের বদলে 2 নং

স্তরে নেমে আসবে। 2 নং এবং 1 নং স্তরের মধ্যে জনসংখ্যার বিপরীত ক্রমতা সৃষ্টি হয় এবং লেজার প্রক্রিয়া এই দুই স্তরের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে।

চিত্র 11.5 এ চারস্তর লেজার ব্যবস্থা দেখান হয়েছে।

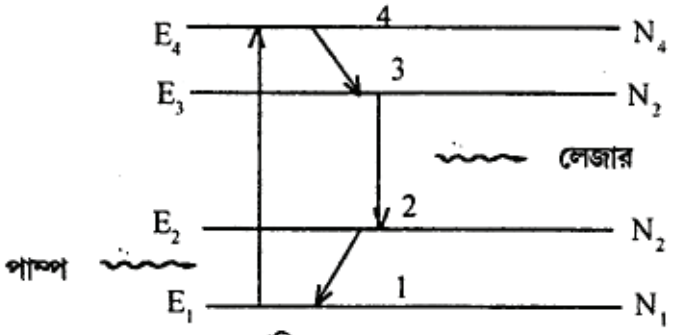

(চিত্র নং 11.5)

1 নং স্তর ভূমিস্থ স্তর ও 2, 3, 4 নং স্তরগুলি পরমাণুর উত্তেজিত স্তর। আলোক পাম্পের সাহায্যে পরমাণুকে 1 নং স্তর থেকে 4নং স্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে অতি দ্রুত অবিকিরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা পরিবর্তনের মাধ্যমে ৩নং স্তরে নেমে আসে। 3 নং স্তর মিতস্থায়ী স্তর (জীবনকাল $\sim 10^{-3}$ sec) এই স্তরটি লেজারের উচ্চতর স্তর ও 2 নং স্তরটি লেজারের নিম্নতর স্তর। নিম্নতর স্তরটির স্বল্প জীবনকাল হওয়া প্রয়োজন কারণ পরমাণু 2 নং স্তর থেকে 1 নং স্তরে যাওয়ার পরে পাম্পের সাহায্যে আবার 4 নং স্তরে উত্তোলিত হতে পারে 2 নং স্তর থেকে 1 নং স্তরে যাওয়ার পরে পাম্পের সাহায্যে আবার 4 নং স্তরে উত্তোলিত হতে পারে। 2 নং স্তর থেকে 1 নং স্তরে যাওয়ার হার যদি 2 নং স্তরে পরমাণুর অবস্থানের হার থেকে বেশী হয় তবে স্বল্প পাম্প শক্তিতেই 2-3 স্তরের মধ্যে জনসংখ্যার বিপরীতক্রমতা সৃষ্টি করা সম্ভবপর। 2 নং স্তর ও 3 নং স্তরের মধ্যে জনসংখ্যার ক্রমতার পরিবর্তন কি হারে পাম্প করা হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে।

সাধারণভাবে বলা যায় যে তিন স্তর ব্যবস্থার তুলনায় চারস্তর ব্যবস্থায় অনেকটা সহজেই জনসংখ্যার বিপরীত ক্রমতা অবস্থাটি সৃষ্টি করা যায়।

আমরা আগেই দেখেছি যে কোন মাধ্যমে জনসংখ্যার বিপরীত ক্রমতা সৃষ্টি করতে পারলে আলোক বিবর্ধন করা সম্ভব। প্রায় একবর্ণী ও তীব্র শক্তিসম্পন্ন লেজার রশ্মি পেতে গেলে মাধ্যমকে কম্পক (Oscillator) হিসাবে কাজ করতে হবে এবং তার জন্য উৎপাদিত বিকিরণশক্তির একটি অংশকে পুনরায় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহারের জন্য ফেরত পাঠাতে হবে। এই ফেরত পাঠানোর কাজটি করা হয় সক্রিয় মাধ্যমের দুই প্রান্তে দু'টি প্রতিফলক বা দর্পন বসিয়ে। দর্পন দুটি সমতলীয় বা বক্রতলীয় হতে পারে। এই ব্যবস্থাকে বলা হয় আলোক অনুনাদক (optical resonator) বা আলোক অনুনাদ গহ্বর (Optical resonant cavity)

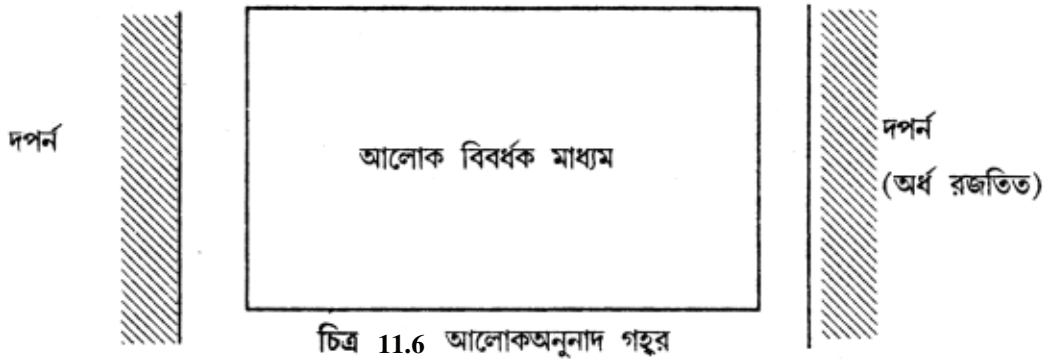

চিত্র **11.6** আলোকঅনুনাদ গহ্বর

লেজার ব্যবস্থায় আলোক অনুনাদ গহ্বরই মূল অংশ। লেজার চালু করার পর প্রথমে বিভিন্ন দিকে স্বতঃস্ফূর্ত ফোটনের বিকিরণ হয় এবং একই সঙ্গে উদ্দীপিত ফোটনও সৃষ্টি হয়। গহ্বরের অক্ষরেখার প্রায় সমান্তরাল দিকে যেসব ফোটন ধাবমান তারা ছাড়া বাকী সমস্ত ফোটনই অল্প সময়ের মধ্যে অনুনাদ গহ্বরের পার্শ্বদেশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। এদিকে অক্ষরেখার কাছাকাছি যে সব ফোটন ধাবমান তাদের তৈরী আলোকরশ্মি দুই দপর্ণে প্রতিফলিত হয়ে অসংখ্যবার কার্যকরী মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করে এবং যেহেতু কার্যকরী মাধ্যমে আলোক বিবর্ধনের শর্ত পালিত হয় সেই কারণে এই অসংখ্যবার যাতায়াতের ফলে রশ্মির তীব্রতা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। শেষ পর্য্যন্ত অর্ধ-রজতিত দপর্ণের মধ্যে দিয়ে অতি সমান্তরক (collimating) তীব্র লেজার রশ্মির নির্গমন হয়। দুই প্রতিফলকের মধ্যে কার্যকরী মাধ্যম অনুনাদ গহ্বরের মত কাজ করে। এখানে দুই প্রতিফলকে নিস্পন্দ বিন্দু (Nodal points) সৃষ্টি হবে এবং স্থির তরঙ্গের অনুনাদ হবে এমনভাবে যে দুই প্রতিফলকের মধ্যে পূর্ণসংখ্যার অর্ধতরঙ্গ থাকবে। L দুই প্রতিফলকের মধ্যে দূরত্ব হ'লে

$$m.\frac{\lambda}{2} = L \qquad \therefore \lambda = \frac{2L}{m} \qquad \text{..... (11.12)}$$

এখানে λ = মাধ্যমে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য = λ_0/μ

μ মাধ্যমের প্রতিসরণ গুণাংক। λ_0 = শূন্যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য

কম্পাংক $\nu_m = \frac{v}{\lambda} = \frac{v}{(2L/m)} = \frac{mv}{2L}$ ..... (11.13)

m একটি পূর্ণসংখ্যা। বিভিন্ন m এর জন্য গহ্বরের ভিতরে বিভিন্ন কম্পনের ধরণ (mode) সৃষ্টি হবে। দু'টি পরপর কম্পনের ধরণের মধ্যে কম্পাংকের অন্তর হ'ল

$$\Delta\nu = \nu_{m+1} - \nu_m = \frac{v}{2L} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

গ্যাস লেজারের ক্ষেত্রে লেজারের দৈর্ঘ্য 1 মিটার ধরা হ'লে

$\Delta\nu = 150MH_3$

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে লেজার থেকে যে আলো পাওয়া যায় তা' বিশেষভাবে একবর্ণী। এটা কিভাবে ঘটে? আমরা জানি স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত পারমাণবিক পরিবর্তনের ফলে বর্ণালী রেখার সৃষ্টি হয়। বর্ণালী রেখা এক বিস্তৃত কম্পাংকের মধ্যে প্রসারিত থাকে যার নাম ব্যান্ড। এই ব্যান্ডের কম্পাংকের প্রসারের মধ্যেই অনুনাদ গহ্বরে বিভিন্ন স্থায়ী ধরণের সৃষ্টি হয়। কিন্তু প্রত্যেকটি ধরণের যে কম্পাংকের প্রসার আছে তা' বর্ণালী রেখার প্রসারের তুলনায় নগন্য। লেজারের অনুনাদ গহ্বর থেকে এক বা একাধিক স্থায়ী ধরণ অনুযায়ী একটি বা কয়েকটি সরু ব্যান্ডের আলোর নির্গত হবে। চুনি লেজার উদাহরণ হিসাবে নেওয়া যাক। এই লেজারের বর্ণালীরেখার ব্যান্ড হ'ল 330 $GH_3 (1GH_3 = 10^9 H_3)$ কিন্তু লেজার গহ্বরের ব্যান্ডের প্রসার কম্পাংকের হিসাবে মাত্র 30 MH_3।

চিত্র 11.7 এতে কম্পাংক অনুসারে সাধারণ বর্ণালী রেখার আকৃতি প্রদর্শিত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে অনুনাদ গহ্বরে সৃষ্ট সূচিমুখ সদৃশ বিবিধ ধরণের কম্পাংকের প্রসারও দেখানো হয়েছে।

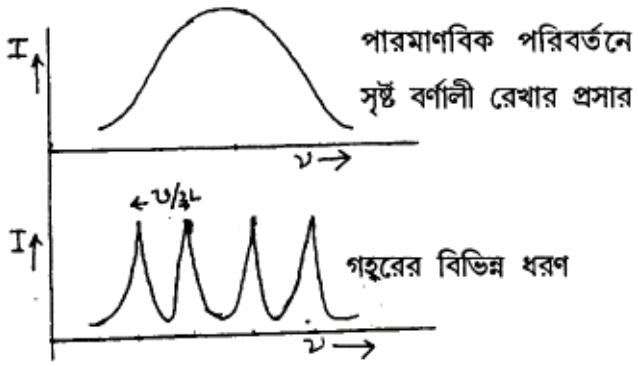

চিত্র 11.7

আমরা এতক্ষণ লেজার গহ্বর আলোচনায় গহ্বরের দুই প্রান্তে দু'টি সমান্তরাল সমতলীয় দর্পনের কথা বলেছি। এ-ছাড়া আরও কার্যকরী বিভিন্ন ব্যবস্থা আছে। চিত্র 11.8 এ চার প্রকার দর্পণের অবস্থানে দেখান হয়েছে।

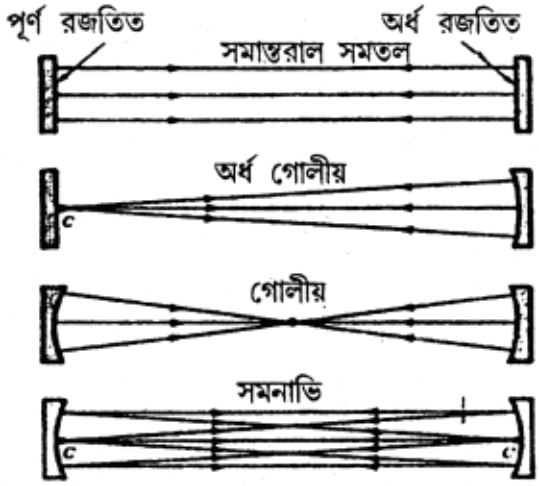

চিত্র 11.8 লেজারে ব্যবহার হয় এমন চাররকম প্রান্তদর্পণ

আলোক ও অন্য পাম্পিং ব্যবস্থা ঃ

লেজার চালু রাখার জন্য কার্যকরী মাধ্যমের অণু পরমাণুর বিভিন্ন শক্তিস্তরে অবস্থানের সময়ে 'জনসংখ্যা বিপরীত ক্রমতা' অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে। একাধিক প্রক্রিয়ায় এটা করা হয়ে থাকে। প্রথমে আমরা বলছি আলোক পাম্পিং ব্যবস্থার কথা। এখানে ফোটনের সাহায্যে পরমাণুকে নিম্নতর শক্তিস্তর থেকে উচ্চতর শক্তিস্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। ফোটনের কম্পাংক $\nu = (E_1 - E_0)/h$ হ'লে, বই কম্পাংকের আলো শোষণ করে পরমাণু E_0 স্তর থেকে E_1 স্তরে উন্নীত হবে। আলোক পাম্পিং ব্যবস্থা কঠিন পদার্থের লেজার অথবা তরল রঞ্জক লেজারের (Liquid dye Laser) ক্ষেত্রে বেশি উপযুক্ত। কোন শক্তিশালী আলোক উৎস থেকে আলো কার্যকরী মাধ্যমে শোষিত হলে মাধ্যমের পরমাণুরা উচ্চতর শক্তিস্তরে চলে যায়। আলোক উৎস হ'ল লেজার রড বা সিলিন্ডারের চারপাশে জড়ানো চমক বাতি (Flash lamp) ।

গ্যাস ও অর্ধপরিবাহী লেজারে বৈদ্যুতিক পাম্পিং ব্যবস্থা ব্যবহৃত হয়। যখন গ্যাসীয় মিশ্রণে বৈদ্যুতিক মোক্ষণ (Electric discharge) চালানো হয় তখন কিছু আয়ন ও মুক্ত ইলেকট্রন সৃষ্টি হয়। আয়নের তুলনায় ইলেকট্রনের অধিক গতিশক্তির জন্য ইলেকট্রনই চার্জহীন পরমাণুকে সংঘর্ষের মাধ্যমে উচ্চতর শক্তিস্তরে নিয়ে যায়।

11.2.4 কাল ও দেশ সম্পর্কীয় সুসম্বদ্ধতা (Temporal and spatial coherence)

লেজার সম্পর্কে আলোচনায় আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছি যে এর আলো খুবই সুসম্বন্ধ ও প্রায়

একবর্ণী। আলোর সুসম্বদ্ধতা বিষয়ে একটি সহজ ধারণা দেওয়ার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে সংযোজিত হ'ল।

+x অক্ষরেখায় অসীম দৈর্ঘ্যের একটি সমতল তরঙ্গমালার সমীকরণ হল—

$$\psi(x,t) = A\cos(kx - \omega t + \varphi) \quad \text{..... (11.15)}$$

যে কোন x-এ ψ এর মান সর্বদাই $(-\infty<t<\infty)$ সাইনবক্রীয় (sinusoidal) থাকবে। এটি একটি আদর্শ অবস্থা। এখানে তরঙ্গের একটিই কম্পাংক $(\nu = \frac{\omega}{2\pi})$ । যে কোন দু'টি নির্দিষ্ট বিন্দুর মধ্যে দশার অন্তর সর্বদাই কাল নিরপেক্ষ। আবার কোন নির্দিষ্ট x এর মানে কোন নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে দশার অন্তর t এর ওপর নির্ভর করবে না। তরঙ্গের দশার এই বিশেষ ধর্মকে বলা হচ্ছে **নিখুঁত কাল সুসম্বদ্ধতা** (Perfect temporal coherence) । তরঙ্গের রশ্মির দিক নির্দেশের লম্বতলে অবস্থিত যে কোন দু'টি বিন্দুর মধ্যে দশার অন্তর কাল নিরপেক্ষ। এই ধর্মকে বলা হয় **নিখুঁত দেশ সুসম্বদ্ধতা** (Perfect spatial coherence)। সাধারণ আলোক উৎসের ক্ষেত্রে এই আদর্শ তরঙ্গের ধর্ম পালিত হয় না। কারণ এখানে যে আলোর বিকিরণ হয় তা হল সসীমদৈর্ঘ্যের তরঙ্গমালা। পরমাণু থেকে আলো বিকিরণ করার সময় পরমাণু উত্তেজিত অবস্থা থেকে নিম্নতর অবস্থায় যেতে সময় নেয় আনুমানিক 10^{-9} sec । এই সময়ে আলো 3 মিটার মত পথ অতিক্রম করে। এটা হল পরমাণু থেকে যে আলোর বিকিরণ হয় তার সঙ্গে যুক্ত তরঙ্গমালার দৈর্ঘ্য। এই সসীম দৈর্ঘ্যের তরঙ্গমালার ফুরিয়ে বিশ্লেষণ করলে কম্পাংকের একটি বিস্তার পাওয়া যাবে যাকে বলা হয় **বর্ণালী রেখার স্বাভাবিক বিস্তার** (Natural spectral line width)। এছাড়া তাপীয় আলোক উৎসে পরমাণুদের এলোমেলো গতি এবং আলোর অনিয়মিত বিকিরণের জন্য বর্ণালী রেখা আরও চওড়া হয়ে যায়। এ ছাড়া আছে ডপলার ক্রিয়া এবং এই কারণে যে বিস্তার হয় তাকে বলা হয় ডপলার বিস্তার। এভাবে বর্ণালী রেখার ব্যান্ডের প্রসার $\Delta\nu$ সৃষ্টি হয়। আমরা লিখতে পারি

$$\Delta\nu = \frac{1}{\tau_c} \quad \text{..... (11.16)}$$

এখানে τ_c-কে বলা হয় আলোক তরঙ্গের **সুসম্বদ্ধ সময়** (Coherence time)। এই সময়ে আলো যে দুরত্ব অতিক্রম করে তাকে বলা হয় সুসম্বদ্ধ দৈর্ঘ্য L (Coherence length) ।

$$L = C\tau_c = \frac{C}{\Delta\nu} \quad \text{..... (11.17)}$$

সাধারণ আলোক উৎসের ক্ষেত্রে বর্ণালী রেখার বিস্তার $\Delta\nu \sim 10^{10} H_z$ । এই আলোক উৎসের তুলনায় লেজারের

বিষয়টি পৃথক। লেজার যখন চালু করা হয় তখন তার আলোক অনুনাদ গহ্বরে বিভিন্ন অনুদৈর্ঘ্য ধরণ উদ্দীপিত হয় যার প্রত্যেকটির সাথে যুক্ত আছে নির্দিষ্ট কম্পাংক। লেজার যদি একটি ধরণে অনুনাদিত হয় তা' হলে যে আলো পাওয়া যাবে তা হবে মূলতঃ একটি সাইন তরঙ্গ। কিন্তু এর সাথে অনিয়মিত স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনের জন্য আলো যুক্ত হয়ে লেজার আলোর কম্পাংকের একটা বিস্তার দেখা যায় যদিও সাধারণ আলোক উৎসের তুলনায় তা' নগন্য।

একটি সুনিয়ন্ত্রিত লেজারে $\Delta\nu \sim 500H_z$ হতে পারে। তাহলে $\tau_c \sim 2\times10^{-3}\,\text{sec}$ হবে এবং সুসম্বন্ধ দৈর্ঘ্য হবে $C\tau_c \sim 6\times10^7\,\text{cm} = 600\ \text{Km}$

লেজারের আলোর সুসম্বন্ধ দৈর্ঘ্য খুব বেশী হওয়ার জন্য জোর ব্যবহার করে সুদীর্ঘ পথান্তর (path difference) নির্ভর আলোর ব্যতিচার পরীক্ষা করা হয়েছে। দুটি লেজার আলোক উৎসের সাহায্যে সাফল্যের সঙ্গে আলোক স্বরকম্প (Optical beat) প্রদর্শন করা সম্ভব হয়েছে। এই কারণে এই আলোর দুটি ধর্ম আমরা উল্লেখ করতে পারি ঃ (১) এই আলোর দেশ সুসম্বদ্ধতা নিখুঁত না হলেও তার কাছাকাছি। পরীক্ষায় এটা প্রদর্শিত হয়েছে। (২) আলোকরশ্মির দিক নির্দেশ খুবই নির্দিষ্ট।

11.3 বিবিধ লেজার

১৯৬০ সালে প্রথম চুনি লেজারের অবির্ভাবের পর নানা প্রয়োজনে গত কয়েক দশকে বিভিন্ন ধরণের বহু লেজার তৈরী হয়েছে। এই লেজার তৈরীতে কঠিন, গ্যাসীয়, তরল এই তিন অবস্থার বিভিন্ন সক্রিয় মাধ্যমই ব্যবহার করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। আমরা আপনার জন্য প্রধানতঃ দুটি সুপরিচিত লেজারের কার্যপ্রণালী বিষয়ে একটি প্রাথমিক বিবরণ দেব।

11.3.1-তে চুনি লেজার ও 11.3.2-তে হিলিয়াম-নিয়ন লেজার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 11.3.3 -তে খুব সংক্ষেপে আরও কয়েকটি লেজারের উল্লেখ করা হয়েছে।

11.3.1 চুনি লেজার (Ruby laser)

১৯৬০ সালে সর্বপ্রথম সার্থকভাবে যে লেজারটি তৈরী হয়েছে তা হল টি. এইচ মেইমেনের চুনি লেজার। এর মধ্যে আছে চুনির একক ক্রিস্টাল (Single Crystal) যার দুই প্রান্ত সমতল। একটি প্রান্ত সম্পূর্ণভাবে রজতিত (Silvered) এবং অপর প্রান্ত অর্ধরজতিত করা হয়েছে এই দুটি প্রান্ত নিয়ে একটি অনুনাদী গহ্বর (Resonant cavity) তৈরী হয়েছে। চুনির মধ্যে আছে এল্যুমিনিয়াম অক্সাইড এবং অন্ততঃ পক্ষে 0.05% এল্যুমিনিয়াম পরমাণুর পরিবর্তে ক্রোমিয়াম পরমাণু। চিত্র 11.9 এ চুনি ক্রিস্টালে অবস্থিত ক্রোমিয়াম আয়নের বিভিন্ন শক্তিস্তরের অবস্থান দেখান হয়েছে।

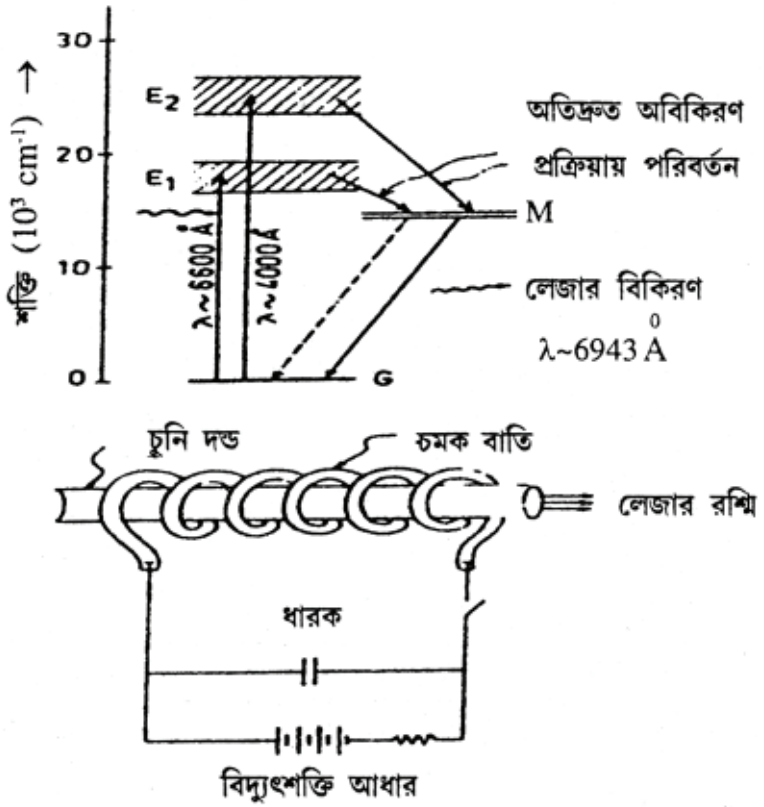

চিত্র **11.9** চুনি লেজার

চমক বাতি (Flas lamp) থেকে নির্গত আলো শোষণ করে ক্রোমিয়াম আয়ন E_1, E_2 শক্তিব্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত শক্তিস্তরে পৌঁছায়। সেখান থেকে অতি দ্রুত অবিকিরণ পরিবর্তনের মাধ্যমে মিতস্থায়ী স্তর M এ চলে যায়। E1, E2 শক্তিব্যান্ডে অবস্থিত শক্তিস্তরের আয়ু খুবই সীমিত ($\angle 10^{-9}$ sec) মিতস্থায়ী স্তর M-এর আয়ু তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী 10^{-3} sec এর মত। চুনি ক্রিস্টালটি একটি দন্ডের আকারে থাকে যার দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ 2 মিমি থেকে 10 মিমি হয়। দন্ডটির চারপাশ জেনন (Xenon) চমকবাতি দিয়ে জড়ানো থাকে। চমকবাতিটি একটি ধারকের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ধারকটি কয়েক হাজার জুলের শক্তি কয়েক মিলি সেকেন্ডের মধ্যে ক্ষরিত করে। এই প্রক্রিয়ায় চমকবাতিটি কয়েক মেগাওয়াটের শক্তি বিকিরণ করে। এই শক্তির একটি অংশ ভূমিস্তরে অবস্থিত ক্রোমিয়াম আয়ন শোষণ করে এবং E_1 বা E_2 শক্তিস্তরে আরোহণ করে। E_1 ও E_2 Å শক্তিস্তরে আরোহণ করার জন্য যথাক্রমে 6600Å ও 4000Å এর আলো দরকার হয়। ক্রোমিয়াম আয়ন খুব দ্রুত অবিকিরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উত্তেজিত স্তর থেকে মিতস্থায়ী স্তর M এ নেমে আসে। মিতস্থায়ী

স্তরের আয়ু দীর্ঘ হওয়ায় এই স্তরে থাকা পরমাণুর সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং এইভাবে শেষে M ও G স্তরের মধ্যে জনসংখ্যার বিপরীত ক্রমতা (population inversion) সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় স্বতঃস্ফূর্ত ফোটন বিকিরণের দ্বারা লেজার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ক্রোমিয়াম পরমাণু মিতস্থায়ী স্তর M থেকে ভূমিস্থ স্তর G তে স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তনের দ্বারা 6943 Å দৈর্ঘ্যের লাল আলো বিকিরণ করে।

চুনি দন্ডের দুই প্রান্তের প্রতিফলক দিয়ে বারবার প্রতিফলনের সাহায্যে 6943Å তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো দন্ডের ভিতরে অনেকটা পথ যায়। এর ফলে দন্ডের মধ্যে M স্তরে বর্তমান অন্য ক্রোমিয়াম পরমাণুর সঙ্গে এই সব ফোটনের মিথস্ক্রিয়া (Interaction) অনেকটা বেড়ে যায়। এখানে যে আলোকরশ্মি দুই প্রান্ততলের ওপর লম্বভাবে আপতিত হয় সেই রশ্মিই কেবলমাত্র বারে বারে প্রতিফলিত হতে পারে। সুতরাং চুনিদন্ডের অক্ষের সমান্তরালভাবে যে রশ্মি গমন করে তার শক্তি উদ্দীপিত বিকিরণের কারণে অনেকটাই বিবির্ধিত হয়। এই রশ্মির একটি অংশ লেজার রশ্মি হিসাবে অধরজতিত তল দিয়ে নির্গত হয়। আলোক পাম্প হিসাবে চমকবাতি কাজ করার জন্য লেজার রশ্মি অবিচ্ছিন্নভাবে নির্গত না হয়ে ঝলকে ঝলকে নির্গত হয়। চুনি লেজারে খুব উচ্চ ক্ষমতার লেজার রশ্মির ঝলক তৈরী করা সম্ভব।

11.3.2 হিলিয়াম-নিয়ন লেজার (Helium-Neon Laser)

গ্যাস মাধ্যম ব্যবহার করে প্রথম যে লেজারটি তৈরী হয়েছিল তা হল হিলিয়াম-নিয়ন-লেজার। আমেরিকার বেল টেলিফোন পরীক্ষাগারে ১৯৬১ সালে আলী জাভান ও তাঁর সহকর্মীরা এই লেজার তৈরী করেন।

কঠিন বস্তুর লেজার-এ চমকবাতির সাহায্যে আলোক পাম্প পদ্ধতি প্রয়োগ করে লেজার মাধ্যমে জনসংখ্যার বিপরীত ক্রমতা সৃষ্টি করা হয়। গ্যাস লেজারের ক্ষেত্রে আলোক পাম্প পদ্ধতি একেবারেই কার্যকরী নয় কারণ গ্যাসের পরমাণু খুব সুনির্দিষ্ট শক্তিস্তরে যাকে অপর পক্ষে কঠিন বস্তুর লেজারে শক্তিস্তরগুলি সুনির্দিষ্ট না হয়ে এক একটি গুচ্ছ তৈরী করে। গ্যাস লেজারের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার বিপরীত ক্রমতার জন্য বিদ্যুৎ ক্ষরণ হল একটি বিশেষ কার্যকরী পদ্ধতি।

হিলিয়াম-নিয়ন-লেজারে আছে একটি লম্বা ও সরু ক্ষরণ নল (1 cm ব্যাস ও 80 cm দীর্ঘ) যার মধ্যে 1 mm পারদ চাপযুক্ত হিলিয়াম গ্যাস ও তার সঙ্গে 0·1 mm পারদ চাপযুক্ত নিয়ন গ্যাস প্রবেশ করানো হয়েছে। এই গ্যাস মিশ্রণটি হল লেজার মাধ্যম যার দুপাশে দর্পণ বসানো আছে। এভাবে একটি অনুনাদী গহ্বর তৈরী করা হয়েছে। একটি দর্পণ সম্পূর্ণভাবে ও অন্য দর্পণটি আংশিকভাবে আলো প্রতিফলিত করে। কোন গ্যাস মিশ্রণের মধ্যে ডিসচার্জ পাঠালে ইলেকট্রনরা ত্বরণের ফলে নলের মধ্যে দিয়ে চলে যায় এবং হিলিয়াম পরমাণুদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে সেই পরমাণুদের উচ্চতর শক্তিস্তরে উন্নীত করে।

চিত্র 11.10 হিলিয়াম ও নিয়নের কিছু শক্তিস্তরের অবস্থান দেখান হয়েছে।

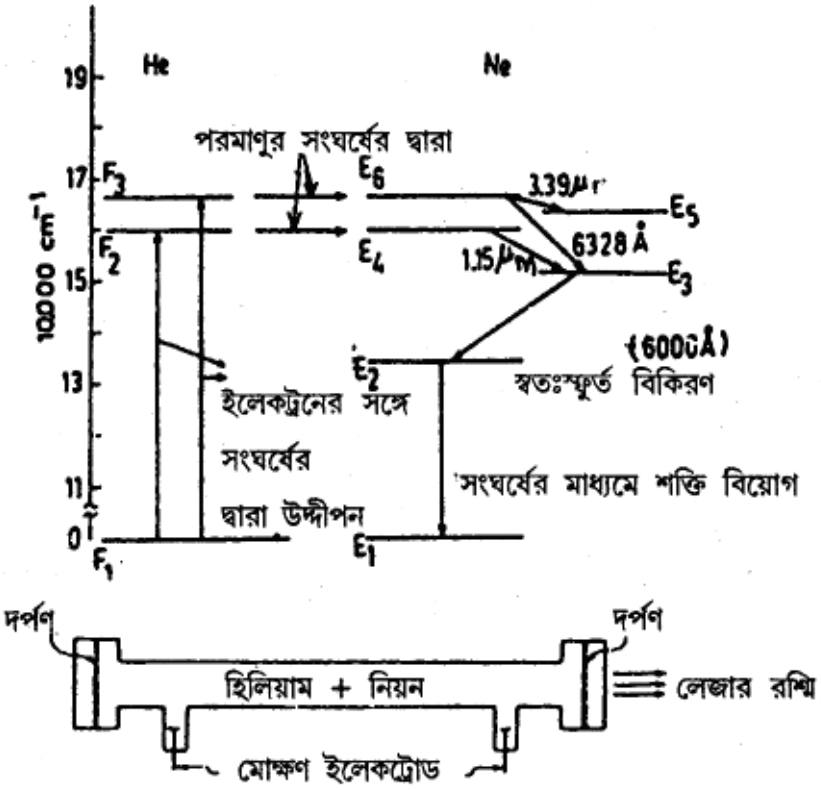

চিত্র 11.10 হিলিয়াম নিয়ন লেজার

হিলিয়াম পরমাণুদের সহজেই F_2, F_3 উত্তেজিত স্তরে উন্নীত করা যায়। এই স্তরগুলি মিতস্থায়ী এবং সেইজন্য হিলিয়াম পরমাণু নিম্নতরস্তরে অবরোহণের পূর্বে এই সব স্তরে তুলনামূলকভাবে অধিকতরস্থায়ী ভাবে অবস্থান করে। নিয়নের কিছু উত্তেজিত স্তর হিলিয়ামের F_2, F_3 স্তরের অনুরূপ। এর ফলে F_2, F_3 স্তরে অবস্থান করছে এমন হিলিয়াম পরমাণু E_1 স্তরে নিয়ন পরমাণুর সঙ্গে সংঘর্ষে শক্তির বিনিময় করে। নিয়ন পরমাণু E_4, E_6 ইত্যাদি স্তরে উন্নীত হয় এবং হিলিয়াম পরমাণু ভূমিস্থ স্তরে ফিরে যায়। হিলিয়াম পরমাণু F_2, F_3 স্তরে বেশী সময় থাকে বলে এই ধরণের প্রক্রিয়ার উচ্চ সম্ভাব্যতা আছে। গ্যাস মিশ্রণে ক্রমাগত ক্ষরণ পাঠিয়ে নিয়নের উত্তেজিত স্তর E_4 এবং E_6 এ অবস্থানের সংখ্যা ক্রমাগতই বাড়ানো হয়। এই উপায়ে E_4 (বা E_6) শক্তিস্তর এবং নিম্নতর শক্তিস্তর E_5 E_3-র মধ্যে জনসংখ্যার বিপরীত ক্রমতার অবস্থার সৃষ্টি করা সম্ভব হয় বিভিন্ন স্তরে সংক্রমণের (Transimssion) ফলে 3.39 μm, 1.15 μm এবং 6328 Å তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ফোটন নির্গত হয়। প্রথম দুটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অবলোহিত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত এবং তৃতীয় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হল হিলিয়াম নিয়ন লেজারের সুপরিচিত লাল আলো।

E_3 স্তর থেকে নিয়ন পরমাণু স্বতঃস্ফূর্তভাবে E_2 স্তরে নেমে যায় 6000Å এর একটি ফোটন নির্গত করে। এরপর নলের গাত্রে সংঘর্ষের ফলে নিয়ন পরমাণু E_1 স্তরে নেমে আসে।

5 থেকে 10 ওয়াট ক্ষমতা জোগান দিয়ে হিলিয়াম-নিয়ন লেজার থেকে 1-50 মিলিওয়াট ক্ষমতা পাওয়া যায়।

কঠিন বস্তুর লেজারের তুলনায় গ্যাস লেজার থেকে যে আলো পাওয়া যায় তা আরও একবর্ণী ও একদিক নির্দেশক। এই ধরণের লেজারে নিরবচ্ছিন্ন আলো পাওয়া যায়।

11.2.3 আরও কয়েকটি লেজার

চুনি লেজারের পর আরও নানা কঠিন বস্তুর লেজার তৈরী হয়েছে। এসব লেজারের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিস্তার 170_{nm} থেকে 3900_{nm}। মূল বস্তু কাচ বা ইট্রিয়াম অ্যালিউমিনিয়াম গার্নেট (Yttrium Aluminium Garnet সংক্ষেপে-YAG) এর সঙ্গে নিওডাইমিয়াম (Neodymium) আয়ন Nd^{3+} যুক্ত করে যথাক্রমে Nd-doped glass ও Nd-doped YAG লেজার তৈরী হয়েছে। লেজার রশ্মি ঝলকে বা অবিচ্ছিন্নভাবে নির্গত হতে পারে। তরংগ দৈর্ঘ্য 1060nm.

হিলিয়াম-নিয়ন গ্যাস লেজার ছাড়া কার্বন-ডাই-অক্সাইড(CO_2), নইট্রোজেন(N_2), আগর্ন(Ar) ক্রিপটন(Kr) ইত্যাদি গ্যাস লেজার তৈরী হয়েছে ।

অর্ধপরিবাহী লেজার বা ডায়োড লেজার আয়তনে খুব ছোট হয়। এই ধরনের লেজারের নানা প্রয়োজনে ব্যাবহার আছে।

উদাহরণঃ গ্যালিয়াম আরসেনাইড (Ga As) লেজার। ডাই লেজার (Dye Laser) তৈরী করা হয়েছে রঞ্জক পদার্থের দ্রবণ ব্যবহার করে। এ ধরনের লেজার নির্গত লেজার রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রিত করা যায়।

11.4 লেজারের নানা ব্যবহারিক প্রয়োগ

লেজার রশ্মির দিকনির্দেশ খুবই নির্দিষ্ট হওয়ার জন্য কোন দীর্ঘ সুড়ঙ্গপথের দিশা ঠিক করতে লেজার ব্যবহার করা হয়েছে। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দু মাইল দীর্ঘ রৈখিক ত্বরায়কের বিভিন্ন অংশের সঠিক অবস্থান ঠিক করতে লেজার ব্যবহৃত হয়েছে।

লেজার রশ্মি খুবই সমান্তরাল হওয়ায় এই রশ্মিকে খুব ছোট জায়গায় ফোকাস করা যায়। এর ফলে অনেকটা আলোকশক্তি খুব ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করা সম্ভবপর হয়েছে। এভাবে বিভিন্ন পদার্থে অতিসূক্ষ্ম ছিদ্র করতে বা উচ্চগলনাংকের বিভিন্ন ধাতুর পাতকে কাটতে লেজার ব্যবহার করা হয়।

লেজার রশ্মির সাহায্যে কোন দূরত্ব খুব সঠিকভাবে মাপা সম্ভব। মার্কিন মহাকাশচারীরা চাঁদে অবতরণের পর সেখানে প্রতিফলক স্থাপন করেছিলেন। পৃথিবী থেকে লেজার রশ্মি চাঁদের প্রতিফলকে প্রতিফলিত হয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসার সময়ের ব্যবধান থেকে পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব এক মিটারের মধ্যে মাপা সম্ভবপর হয়েছে যা' অন্য উপায়ে মাপলে দূরত্বের অনিশ্চয়তা অন্ততঃপক্ষে 80 km এর কম হত না।

লেজারের সাহায্যে গতিশীল কোন বস্তুর যেমন বিমান বা রকেটের যাত্রাপথকে খুব নিখুঁত ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এভাবে ক্ষেপণাস্ত্রের গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করে অনেক দূরের লক্ষ্যবস্তুকে ঠিকমত আঘাত করা যায়।

লেজারের সঙ্গে আলোক তন্তু ব্যবহার করে যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়েছে। বাহক আলোক তরঙ্গের অতিউচ্চ কম্পাংকের জন্য (10^{14} -10^{15} H_3) বহু বাক্ সংকেত (speech signals) সংখ্যা 10^{11}-10^{12} একই সঙ্গে পাঠানো সম্ভব হয়েছে।

আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল ত্রিমাত্রিক ছবি তৈরীর ক্ষেত্রে হলোগ্রাফ প্রযুক্তিতে লেজারের ব্যবহার লেজারের সাহায্যে সংযোজন রিঅ্যাকটার তৈরী ও আইসোটোপ পৃথকীকরণ সম্পর্কে নানাভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে।

লেজার অত্যন্ত তীব্র শক্তি সম্পন্ন আলোক রশ্মি হওয়ায় সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের বিস্তারও খুব বেশী হবে। এই কারণে লেজার রশ্মির সাহায্যে বিভিন্ন পদার্থের অরৈনিক আলোক সংক্রান্ত ধর্মকে (Non-linear Optical properties) অনুসন্ধান করা সম্ভবপর হয়েছে।

বিশুদ্ধ গবেষণায় লেজারের নানা প্রয়োগ আছে। সাম্প্রতিককালের দু'টি খুব উল্লেখযোগ্য গবেষণা ক্ষেত্র আমরা উল্লেখ করব যেখানে লেজার ব্যবহার করা হয়েছে। পদার্থবিজ্ঞানের 1997 সনের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল লেজার শীতলীকরণ ও নিস্তড়িৎ পরমাণুকে ধরার বিষয়ে (Laser cooling & trapping of neutral atoms) । লেজার রশ্মির সাহায্যে পরমাণুর গতিকে নিয়ন্ত্রণে এনে গতিশক্তি নির্ভর পরমাণুর তাপমাত্রা চরম শূন্যের খুবই কাছে মাইক্রো কেলভিন তাপমাত্রায় (10^{-6} k°) আনা সম্ভব হয়েছে।

1999 রসায়নের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ফেমটো সেকেন্ড বর্ণালীর (Femto second spectoscopy) সাহায্যে অতি দ্রুত রাসায়নিক বিক্রিয়ার বিভিন্ন পরিবর্তিত অবস্থাকে পরিমাপ করার জন্য। এই গবেষণায় অতি উচ্চ কম্পাংকের ঝলক লেজার ব্যবহার করা হয়েছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে লেজারের ব্যবহার নিয়ে নানা গবেষণা হচ্ছে। আমরা এখানে একটি প্রয়োগের উল্লেখ করব। এক্সাইমার লেজার (Excimer laser) দিয়ে কর্নিয়ার আকৃতির সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটিয়ে স্বল্প দৃষ্টি বা দীর্ঘদৃষ্টি জনিত দৃষ্টির ত্রুটিকে সংশোধন করা হয়েছে।

11.5 হলোগ্রাম ও হলোগ্রাফ পদ্ধতি

11.5 ভূমিকা

প্রস্তাবনায় হলোগ্রাম ও হলোগ্রাফ পদ্ধতির পরিচয় দিতে আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে এ-হল ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব গঠনের একটি বিশেষ কার্যকরী উপায় যেখানে লেন্সের কোন ব্যবহার নেই।

এখানে সাধারণভাবে এই পদ্ধতির কার্যপ্রণালী আপনার অবগতির জন্য উপস্থাপিত করছি।

এই পদ্ধতির দুটি পর্যায় আছে।

1. প্রথমে কোন লক্ষ্যবস্তু থেকে একবর্ণ বা প্রায় সেইমত আলো বিচ্ছুরণ করিয়ে সেই আলোর সঙ্গে নজির হিসাবে ব্যবহৃত একটি সুসম্বদ্ধ তরঙ্গের সঙ্গে ব্যাতিচার ঘটিয়ে যে ব্যাতিচার ফ্রিজের সৃষ্টি হয় তার আলোকচিত্র নেওয়া। অলোকচিত্রে এই ব্যাতিচার ফ্রিজের যে নকশা সৃষ্টি হয় তাকে ডেনিস গেবর নাম দিয়েছিলেন 'হলোগ্রাম' (Hologram)। এই নামকরণের তাৎপর্য আপনি ক্রমেই বুঝতে পারবেন।

2. দ্বিতীয় পর্যায় হল আলোক ক্ষেত্রে বা প্রতিবিম্বের পুর্নগঠন (Reconstruction) । এবার 1 নং পদ্ধতিতে যে হলোগ্রাম তৈরী হয়েছে তার মধ্যে কোন সুসম্বদ্ধ আলোর রশ্মিগুচ্ছ পাঠান হয়। এবার যে বিবর্তন সৃষ্টি হয় তার সাহায্যে প্রতিবিম্বের পুর্নগঠন হয়।

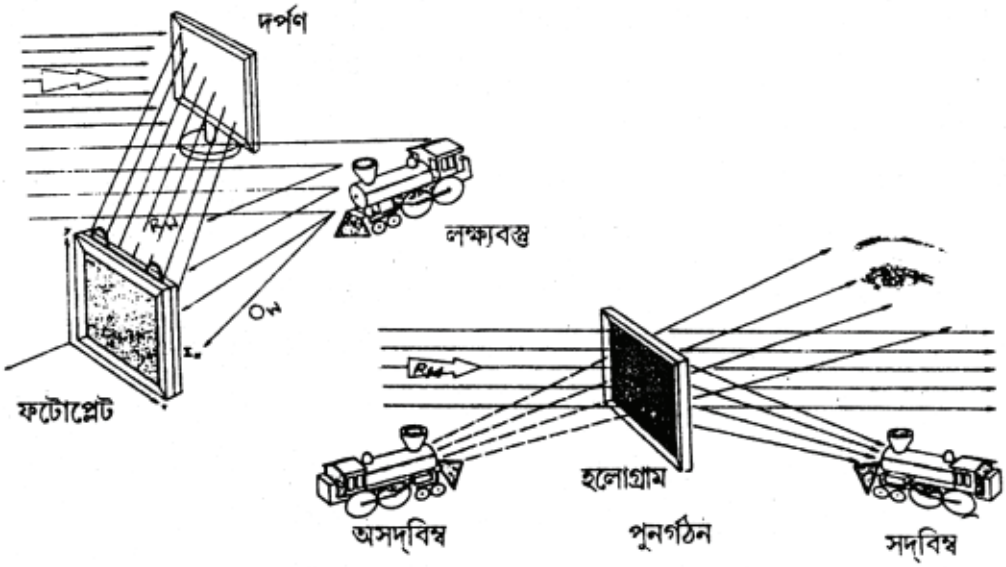

চিত্র 11.11 হলোগ্রাফ পদ্ধতিতে অভিলেখন (Recording) ও প্রতিবিম্বের পুনর্গঠন (Reconstruction)

চিত্র 11.11-এ এই দুই পর্যায় একটি উদাহরণের সাহায্যে দেখানো হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ে হলোগ্রাম কিভাবে তৈরী হচ্ছে আমরা দেখব। একটি **পশ্চাদ্‌পট** বা নজির আলোক তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। এটি উপযুক্ত উৎস থেকে নেওয়া সুসম্বদ্ধ আলোক তরঙ্গ যা সাধারণতঃ সমতল তরঙ্গ হিসাবে দর্পনে প্রতিফলিত হয়ে তির্যকভাবে Σ_H তলে (এখানে xy তল) ফটোপ্লেটের ওপর আপতিত হচ্ছে। একই সঙ্গে লক্ষ্যবস্তু (এখানে একটি খেলনা রেল ইঞ্জিন) থেকে বিক্ষিপ্ত আলো O_w ফটোপ্লেটে এসে পড়ছে। নজির আলোক তরঙ্গ ও লক্ষ্যবস্তু থেকে বিক্ষিপ্ত আলো ব্যাতিচারের মাধ্যমে ফটোপ্লেটে ব্যাতিচার ফ্রিজ তৈরী করছে। এভাবে ফটোপ্লেটে লক্ষ্যবস্তু থেকে আসা আলোর বিস্তার ও দশা পূর্ণভাবে সঞ্চিত হচ্ছে। ফটোপ্লেটকে রাসায়নিক উপায়ে তৈরী করে যে স্থায়ী অভিলেখন সৃষ্টি হয় তাকে ডেনিস গেবর **হলোগ্রাম** নাম দিয়েছিলেন। গ্রীক শব্দ 'হলো'র (Holo) অর্থ হল 'সমগ্র বা সম্পূর্ণ'। এখানে ফটোপ্লেটে লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কিত পূর্ণতথ্য সঞ্চিত থাকে। এই তাৎপর্য স্মরণ করেই গেবর এই হলোগ্রাম নামটি রেখেছিলেন। এবার আপনি হলোগ্রাম কথাটির বিশেষ ব্যবহারের কারণ উপলব্ধি করছেন।

দ্বিতীয় পর্যায়কে বলা হয় পুনর্গঠন (Reconstruction)। কারণ এ পর্যায়ে হলোগ্রাম থেকে লক্ষ্যবস্তুর পূর্ণ চিত্রগ্রহণ করা হয়। হলোগ্রামকে যে আলোক তরঙ্গ দিয়ে আলোকিত করা হয় তাকে বলে পুনর্গঠন আলোক তরঙ্গ। এই আলোক তরঙ্গ প্রথম পর্যায়ে ব্যবহৃত নজির তরঙ্গ বা অনুরূপ আলোক তরঙ্গ। চিত্র 11.11 এই আলোক তরঙ্গ R_w দিয়ে হলোগ্রামকে আলোকিত করা হয়েছে। হলোগ্রামের মধ্যে দিয়ে বিবর্তনের ফলে যে যে আলোক তরঙ্গ পাওয়া যাবে তার মধ্যে একটি হ'ল লক্ষ্যবস্তু থেকে আসা আলোক তরঙ্গ। হলোগ্রামে চোখ রাখলে সেই আলোক তরঙ্গ চোখে পড়বে এবং দ্রষ্টার মনে হবে যেন প্রকৃত লক্ষ্যবস্তুকেই সে দেখছে। এই আলোকতরঙ্গ হল কল্পিত প্রতিবিম্বের সাথে যুক্ত। অপর আলোক তরঙ্গ বাস্তব প্রতিবিম্ব তৈরী করছে। চিত্র 11.11 দুটি অবস্থাই দেখানো হয়েছে। 3-D হলোগ্রাফ পদ্ধতির আর একটি উদাহরণ চিত্র 11.12 এ দেওয়া হয়েছে।

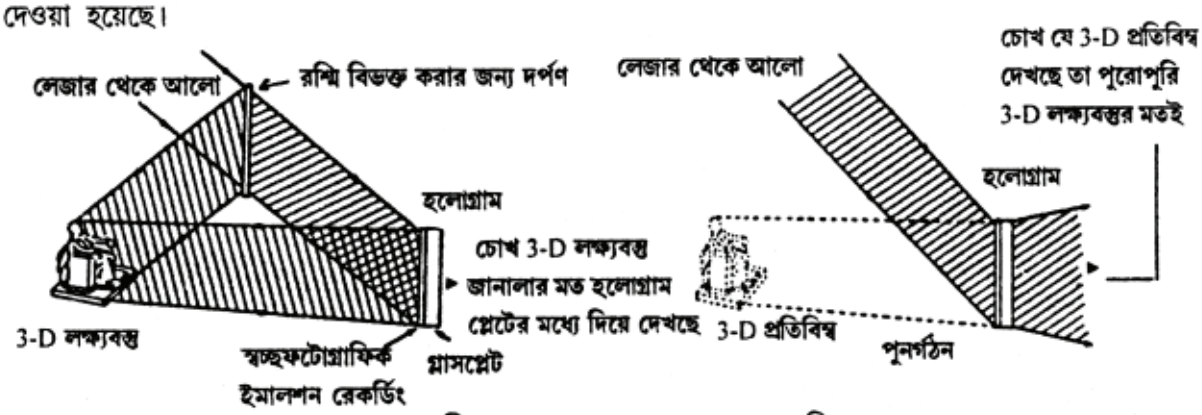

চিত্র **11.12** 3-D হলোগ্রাফ পদ্ধতি

11.5.2 তত্ত্ব

সাধারণভাবে হলোগ্রাম তৈরী ও পুনর্গঠনের বিষয়টি আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম। সেই বিষয়টি আর একটু বিশদভাবে এবার গণিতের সাহায্য নিয়ে আপনার সামনে উপস্থাপিত করছি।

পশ্চাদ্‌পট আলোকতরঙ্গ বা নজির আলোকতরঙ্গ যা' সাধারণত: Σ_H তলে তির্যকভাবে আপতিত সমতল তরঙ্গ তার গাণিতিক রূপ হল:

$$R(x,y,t) = A\cos\left(2\pi\nu t + \phi(x,y)\right) \quad \text{..... (11.18)}$$

ν হ'ল তরঙ্গের কম্পাংক। সমতল তরঙ্গ হওয়ার জন্য তরঙ্গের বিস্তার A একটি ধ্রুবক কিন্তু Σ_H তলে তির্যকভাবে আপতিত হওয়ার জন্য দশা $\phi(x,y)$ অবস্থান (x,y)এর ওপর নির্ভর করে। এবার লক্ষ্যবস্তু থেকে যে আলোক তরঙ্গ Σ_H তলে আসছে তার গাণিতিক রূপ লেখা যায়

$$O(x,y,t) = B(x,y)\cos\left[2\pi\nu t + \psi(x,y)\right] \quad \text{..... (11.19)}$$

এখানে তরঙ্গের বিস্তার ও দশা দুইই (x,y)-এর জটিল অপেক্ষক। কারণ O(x,y,t,) একটি অনিয়মিত তরঙ্গ ফ্রন্ট নির্দেশ করছে। লক্ষ্যবস্তু থেকে আসা এই তরঙ্গ ফ্রন্টের পরিমাপ যেভাবে অবস্থানের ওপর নির্ভর করে তার দ্বারাই লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য এখানে যেন কোন সাঙ্কেতিক ভাষায় লিপিবদ্ধ করা আছে। এখন দুই আলোক তরঙ্গ R(x,y,t) ও O(x,y,t) Σ_H তলে উপরিপাত করে। এর ফলে যে ব্যাতিচার হয় তা' দিয়ে Σ_H তলে আলোক দীপ্তির বন্টন I(x,y) নিয়ন্ত্রিত হয়। ফটোপ্লেটের ইমালশনের মাধ্যমে এই আলোকদীপ্তির বন্টন যে ভাবে লিপিবদ্ধ হয় তা I (x,y)-এর সমানুপাতিক ধরা যেতে পারে।

এখন $I(x,y) = \langle (R+O)^2 \rangle$ ..... (11.20) $\langle\ \rangle$ চিহ্ন সময়ের গড় বুঝায়।

$$I(x,y) = \langle (R+O)^2 \rangle$$

$$= \left\langle \left\{ A\cos\left(2\pi\nu t + \phi(x,y)\right) + B(x,y)\cos\left(2\pi\nu t + \psi(x,y)\right)\right\}^2 \right\rangle$$

$$= A^2\left\langle \cos^2\left(2\pi\nu t + \phi(x,y)\right)\right\rangle + B^2(x,y)\left\langle \cos^2\left(2\pi\nu t + \psi(x,y)\right)\right\rangle$$

$$+ 2AB(x,y)\left\langle \cos\left(2\pi\nu t + \phi(x,y)\right)\cos\left(2\pi\nu t + \psi(x,y)\right)\right\rangle$$

$$= \frac{1}{2}A^2 + \frac{1}{2}B^2(x,y) + AB(x,y)\left\{\left\langle \cos\left(4\pi\nu t + \phi(x,y) + \psi(x,y)\right)\right\rangle + \left\langle \cos\left(\phi(x,y) - \psi(x,y)\right)\right\rangle\right\}$$

$$= \frac{A^2}{2} + \frac{B^2}{2}(x,y) + AB(x,y)\cos(\phi(x,y) - \psi(x,y)).....(10.21)$$

অনুশীলনী

প্রমাণ করুন যে

$$\langle \cos^2(2\pi\nu t + \phi(x,y)) \rangle = \frac{1}{2}$$

$$\langle \cos^2(2\pi\nu t + \psi(x,y)) \rangle = \frac{1}{2}$$

$$\langle \cos(4\pi\nu t + \phi(x,y) + \psi(x,y)) \rangle = 0$$

(11.21) এর প্রথম দু'টি পদে লক্ষ্যবস্তু থেকে আসা আলোর দশা $\psi(x,y)$ অনুপস্থিত ও সেই কারণে এই দু'টি পদ আকর্ষণীয় নয়। কিন্তু তৃতীয় পদটিতে আপনি লক্ষ্য করবেন যে ফটোগ্রাফিক প্লেট আলোর তীব্রতার অভিলেখনে লক্ষ্যবস্তু থেকে আসা আলোক তরঙ্গের বিস্তার B(x,Y) ও দশা $\psi(x,y)$ বিশেষভাবে উপস্থিত আছে। যদিও এই অভিলেখন ও লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে প্রকৃত কোন সাদৃশ্য নেই কিন্তু অভিলেখনে লক্ষ্যবস্তু থেকে আসা আলোর বিস্তার ও দশা পূর্ণভাবে সঞ্চিত আছে। এই কারণে ডেনিস গেবর এই ফটোপ্লেটের নাম দিয়েছিলেন হলোগ্রাম। এই নামকরণের তাৎপর্য আপনি আগেই জেনেছেন।

কোন তৈরী (Processed) হলোগ্রামের মধ্যে আলো যাওয়ার পরিমাণ I (x,y) এর সঙ্গে সমানুপাতিক করা সম্ভবপর। এই কারণে হলোগ্রামের মধ্যে আলোর উত্তরণাংক (Transmittance) ধ্রুবক বাদ দিলে লেখা যায়, $t(x,y) = I(x,y)$ এখন এই হলোগ্রামকে ν কম্পাংকের পুনর্গঠন আলোক তরঙ্গ $R_w(x,y,t)$ দিকে আলোকিত করা হ'ল।

এখানে $R_w(x,y,t) = R_{ow}(x,y)\cos(2\pi\nu t + \phi(x,y)).....(10.22)$

হলোগ্রাম থেকে যে আলো পাওয়া যাবে তা' হ'ল $t(x,y)\,R_w(x,y,t)$

$$= \left\{ \frac{A^2}{2} + \frac{B^2}{2}(x,y) + AB(x,y)\cos(\phi(x,y) - \psi(x,y)) \right\} \times R_{ow}(x,y)\cos(2\pi\nu t + \phi(x,y))$$

$$= \frac{1}{2}\left(A^2 + B^2(x,y)\right) R_{ow}(x,y)\cos\left(2\pi\nu t + \phi(x,y)\right)$$

$$+AB(x,y)R_{ow}(x,y)\cos\left(2\pi\nu t + \phi(x,y)\right) \times \cos\left(\phi(x,y) - \psi(x,y)\right)$$

$$= \frac{1}{2}\left(A^2 + B^2(x,y)\right) R_w(x,y,t) + \frac{1}{2} AB(x,y) R_{ow} \cos\left(2\pi\nu t + 2\phi(x,y) - \psi(x,y)\right)$$

$$+\frac{1}{2} AB(x,y)R_{ow}(x,y)\cos\left(2\pi\nu t + \psi(x,y)\right) \quad \text{..... (11.23)}$$

(11.23) তিনটি আলাদা পদে বিভক্ত। প্রত্যেকটি পদ হ'ল হলোগ্রাম থেকে যে আলো আসছে তার একটি অংশ। হলোগ্রামকে একটি জটিল গ্রেটিং হিসাবে মনে করা যায়। $\frac{1}{2}\left(A^2 + B^2(x,y)\right) R_w(x,y,t)$ পদটি হ'ল পুনর্গঠন আলোক তরঙ্গের বিস্তার মডলুন (Amplitude modulated) রূপ যা' সরাসরি অবিচ্যুত অবস্থায় চলে এসেছে। এই পদটিকে বিবর্তন গ্রেটিং-এর শূন্যক্রম বিবর্তন ফ্রিঞ্জ হিসাবে ধরা যায়।

তৃতীয় পদটি হলোগ্রাম তৈরী করার সময় লক্ষ্যবস্তু থেকে যে আলো এসেছিল তারই মতন। যখন হলোগ্রাম থেকে আসা এই আলোর দিকে তাকানো যায় তখন লক্ষ্যবস্তুর একটি পুনর্গঠিত ত্রি-মাত্রিক ছবি চোখের সমানে ভেসে উঠবে। চোখ সরালে এই ত্রিমাত্রিক লক্ষ্যবস্তুরও স্থান পরিবর্তন হবে।

দ্বিতীয় পদটি হ'ল পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্ট অপর একটি প্রতিবিম্ব। এটি একটি বাস্তব প্রতিবিম্ব যার আলোকচিত্র নেওয়া সম্ভব।

হলোগ্রাম তৈরী করতে হলে একটি বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। যদি স্থায়ী অবস্থার লেজার ব্যবহার করে হলোগ্রাম তৈরী করা হয় তা' হলে যতক্ষণ হলোগ্রাম তৈরী করা হচ্ছে সে সময়ে অপটিক্যাল যন্ত্রপাতি যে টেবিলে রাখা হয় সেখানে কোন কম্পনই হতে দেওয়া চলবে না। সেইজন্য একেবারেই কাঁপবে না এ-ধরণের ভারী গ্রেনাইট টেবিল বা স্টীলের টেবিল ব্যবহার করা হয়। এই সাবধানতার কারণ আলোক তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের একচতুর্থাংশের সমান কম্পন হলেও হলোগ্রাম পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাবে। বর্তমানে উন্নত ফটোগ্রাফিক ফিল্ম ও চমক লেজার যেমন চুনি লেজার ব্যবহার করে তাৎক্ষণিক হলোগ্রাম তৈরী সম্ভব হয়েছে।

আমাদের এই আলোচনা শেষ করার আগে হলোগ্রামের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। কোন বস্তু থেকে আলো যদি প্রতিফলনের পর চারিদিকে ছাড়িয়ে যায় তা হ'লে ঐ বস্তুর প্রতি বিন্দু থেকে আলো হলোগ্রামের সর্বত্র পৌঁছে যাবে। এই কারণে হলোগ্রামের প্রতি অংশ সমগ্র বস্তু থেকে আলো পাবে। সুতরাং এ ধরণের তৈরী হলোগ্রামকে নানা অংশে ভাঙলেও প্রতি অংশই লক্ষ্য বস্তুকে সম্পূর্ণভাবে

পুর্নগঠন করতে পারবে। তবে একটা সীমাবদ্ধতা আছে। হলোগ্রামের অংশ যত ছোট হবে ততই পুনর্গঠিত প্রতিবিম্বে বিভাজন কম হবে।

11.5.3 ব্যবহারিক প্রয়োগ

হলোগ্রাম ও হলোগ্রাফ পদ্ধতির বহু ব্যবহার আছে যা' ভবিষ্যতে আরও বাড়বে। এখানে স্থানাভাবে কয়েকটি মাত্র ব্যবহারের কথাই আমরা সংক্ষেপে বলব। গত দু-তিন দশক ধরেই বিভিন্ন বাণিজ্যিক পণ্যে, ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদিতে হলোগ্রামের বিপুল ব্যবহারের সাথে অনেকেই পরিচিত। কিন্তু এই ব্যবহার মূলতঃ ছবি হিসাবে।

হলোগ্রাফ পদ্ধতির একটি বিশেষ প্রয়োগ শিল্পে হয়েছে। এটি হ'ল কোন ক্ষতি না করে বস্তু সামগ্রীর পরীক্ষা করা। এভাবে খুব সূক্ষ্ম ত্রুটি ধরা সম্ভব। যেমন বিমানের পাখার গঠনে কোন সূক্ষ্ম ত্রুটি আছে কিনা হলোগ্রাফ পদ্ধতিতে তা দ্রুত পর্যবেক্ষণ করা যায়।

কোন আয়তনের মধ্যে গভীরতা অনুযায়ী তথ্য হলোগ্রামে সঞ্চিত রাখা সম্ভবপর হয়েছে। এই ক্ষমতার জন্য অতি সূক্ষ্ম কণিকা নিয়ে ক্ষণিক কোন ঘটনাকে অনুসন্ধান করতে হলোগ্রাম ব্যবহার করা যায়। সাধারণ অনুবীক্ষণ যন্ত্রে অতি সূক্ষ্ম কণিকার অবস্থান নির্ণয় করে তাকে পর্যবেক্ষণ করা খুবই কঠিন। কিন্তু হলোগ্রামে যদি ঐ ঘটনার একটি অভিলেখ সঞ্চিত রাখা যায় তা'হলে পরে কোন সুবিধামত সময়ে পুনর্গঠনের সাহায্যে পুরো ঘটনা ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়।

ব্যাতিচারমিতির (Interferometry) সাহায্যে হলোগ্রাফ পদ্ধতিকে বিশেষ কার্যকরী করা সম্ভব হয়েছে। দু'বার আলোকসম্পাত হলোগ্রাফ ব্যাতিচারমিতির প্রযুক্তি অনুযায়ী প্রথমে বস্তু থেকে আসা আলোক তরঙ্গ এবং নজির আলোক তরঙ্গ দিয়ে ফটোগ্রাফ প্লেটে আলোকসম্পাত করা হয়। তারপর বস্তুর পীড়নের পর ফটোগ্রাফ প্লেটকে আবার বস্তু থেকে আসা আলোক তরঙ্গ ও নজির আলোকতরঙ্গের প্রভাবে রাখা হয়। ফটোগ্রাফ প্লেট থেকে হলোগ্রাম তৈরী করার পর পুনর্গঠন আলোক তরঙ্গ দিয়ে হলোগ্রামকে আলোকিত করলে দুই বস্তু তরঙ্গের সৃষ্টি হবে। একটি বস্তু তরঙ্গ বস্তুর অপীড়িত অবস্থাকে প্রকাশ করবে এবং অপর বস্তু তরঙ্গ বস্তুর পীড়িত অবস্থাকে প্রকাশ করবে। এই দুই বস্তু তরঙ্গ ব্যতিচারের মধ্যে দিয়ে ব্যতিচার ফ্রিঞ্জ তৈরী করবে। এই ব্যতিচার ফ্রিঞ্জের চেহারা থেকে বস্তুর পীড়নের পরিমাপ করা যায়।

হলোগ্রামকে তথ্য সঞ্চয়ের একটি ভাল উপায় হিসাবে ধরা যায়। 8mm পুরু হলোগ্রাম 550 পৃষ্ঠার তথ্য সঞ্চয় করে রাখা সম্ভব হয়েছে। হলোগ্রাফ পদ্ধতির আর একটি সম্ভাব্য প্রয়োগ হল ত্রি-মাত্রিক চলচ্চিত্র ব্যবস্থার রূপায়ণে।

11.6 সংক্ষিপ্তসার

একক 11 পাঠ করে আপনি জেনেছেন যে লেজার এক অভিনব আলোক উৎস যা' প্রায় একবর্ণী, অতিসমান্তরাল, একমুখী, শক্তিশালী ও সুসম্বদ্ধ আলোকরশ্মি সৃষ্টি করতে পারে।

- লেজার কথাটি 'light amplification by stimulated emission of radiation' এই ইংরাজি শব্দগুচ্ছের
- আদ্যক্ষর দিয়ে গঠিত।
- আপনি উদ্দীপিত বিকিরণ, আইনস্টাইন গুণাংক, জনসংখ্যার বিপরীত ক্রমজ, আলোক বিবর্ধন ইত্যাদি মৌলিক
- ধারণাগুলি জেনেছেন এবং লেজার গঠনে এই ধারণাগুলির গুরুত্ব অনুধাবন করেছেন।
- লেজারের তিনটি মূল অংশ আছে
  1. সক্রিয় মাধ্যম
  2. আলোক অনুবাদ গহ্বর
  3. পাম্পিং ব্যবস্থা
- লেজারের কার্যপ্রণালী বিষয়ে জেনেছেন
- বিভিন্ন ধরনের লেজারের বিষয়ে জেনেছেন
- লেজারের নানা ব্যবহারিক প্রয়োগ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছেন
- হলোগ্রাম ও হলোগ্রাফ পদ্ধতির মূল ধারণার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন
- হলোগ্রাফ পদ্ধতির দুই পর্যায় হল ১। রেকর্ডিং ২। পুনর্গঠন
- হলোগ্রাফ পদ্ধতির বিভিন্ন প্রয়োগ সম্পর্কে জেনেছেন।

11.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

1. বর্ণালী রেখার কম্পাংকের বিস্তারের সঙ্গে সুসম্বদ্ধ সময় (τ_c) এর মধ্যে সম্পর্ক হল বিসমানুপাতিক (Inversly proportional)

একটি একমাত্রিক সমতল তরঙ্গ যার অস্তিত্ব স্বল্প সময়ের জন্য উদাহরণ হিসাবে নিয়ে ফুরিয়ে বিশ্লেষণের সাহায্যে তরঙ্গের এই ধর্ম প্রমাণ করুন।

11.8 উত্তরমালা

সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

1. একটি একমাত্রিক সমতল তরঙ্গ x অক্ষরেখায়। তরঙ্গটির অস্তিত্ব $-\frac{\tau_c}{2} < t < \frac{\tau_c}{2}$ সময়ের জন্য $x = 0$

বিন্দুতে তরঙ্গের সমীকরণ হল

$$\psi(x=0,t)=Ae^{iw_0 t},\ -\frac{\tau_c}{2}<t<\frac{\tau_c}{2}=0,\ |t|>\frac{\tau_c}{2}$$

এই সসীম তরঙ্গমালাকে প্রকাশ করা যায় বিভিন্ন কম্পাংকের ($\nu = w/2\pi$) অসীম সমতল তরঙ্গের উপরিপাতের দ্বারা।

সাধারণভাবে আমরা লিখতে পারি, $\psi(x=0,t)=\int_{-\infty}^{\infty}F(\omega)e^{i\omega t}d\omega$ ..... (11.8.1)

আবার ফুরিয়ে সমাকল উপপাদ্যের সাহায্যে আমরা লিখতে পারি,

$$F(\omega)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\psi(x=0,t)e^{-i\omega t}dt \quad \text{..... (11.8.2)}$$

F(ω) হল ω কম্পাংকের সমতল তরঙ্গের বিস্তার তে $\psi(x=o,t)$ প্রতিস্থাপিত করে

$$F(\omega)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\frac{\tau_c}{2}}^{\frac{\tau_c}{2}}Ae^{i(\omega_o-\omega)t}dt$$

$$\therefore F(\omega)=\frac{1}{2\pi}.A.\frac{e^{i(\omega_o-\omega)t_{c/2}}-e^{-i(\omega_o-\omega)t_{c/2}}}{i(\omega_o-\omega)}=\frac{A}{\pi}\frac{\sin\left\{(\omega_o-\omega)\frac{\tau_c}{2}\right\}}{(\omega_o-\omega)}$$

$$=\frac{A\tau_c}{2\pi}\frac{\sin\left\{(\omega_o-\omega)\frac{\tau_c}{2}\right\}}{\left\{(\omega_o-\omega)\frac{\tau_c}{2}\right\}}$$

F(ω)এর বিপরীতে ω এর লেখচিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। (চিত্র 11.13)। এখানে লক্ষ্যণীয় যে F(ω)এর শীর্ষমান ω_o কে ঘিরে তীক্ষ্ণভাবে উপস্থিত।

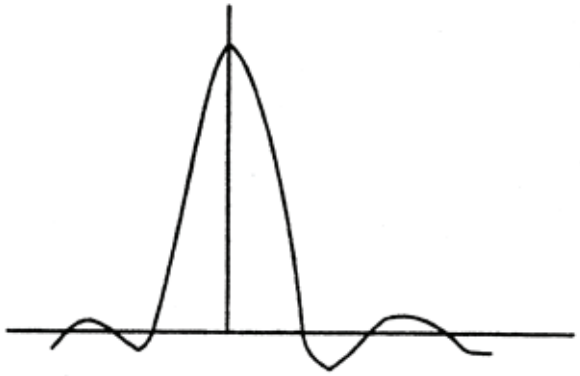

চিত্র **11.13**

ω_o এর দু'পাশে F(ω) এর বিস্তৃতির পরিমাপ করতে হলে প্রয়োজনীয় শর্ত হ'ল

$$\sin\left\{(\omega_o - \omega)\frac{\tau_c}{2}\right\} = 0$$

$$\therefore (\omega_o - \omega)\frac{\tau_c}{2} = \pi,\ \Delta\omega = \omega - \omega_o,\quad \Delta\omega\frac{\tau_c}{2} = \pi,\quad \Delta\omega = 2\pi\Delta\nu$$

$\therefore 2\pi\Delta\nu = \frac{2\pi}{\tau_c}$ $\therefore \Delta\nu = \frac{1}{\tau_c}$ কম্পাংকের প্রসার $\Delta\nu$ সুসম্বদ্ধ সময় τ_c এর বিসমানুপাতিক ।

একক 12 ❑ আলোকীয় তন্তু

গঠন

12.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

12.2 আলোকীয় তন্তু কি ?

12.3 আলোকীয় তন্তুর গঠন কি রকম ?

12.4 আলোকীয় তন্তু কত প্রকার ?

12.5 আলোকীয় তন্তুর ব্যবহারিক সুযোগগুলি কি কি ?

12.5.1 যোগাযোগে আলোকীয় তন্তু

12.5.2 যোগাযোগ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে আলোকীয় তন্তু

12.5.3 আলোকীয় তন্তুর সাহায্যে একটি সম্পূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা

12.6 স্টেপইনডেক্স আলোকীয় তন্তুর নিউম্যারিকাল অ্যাপারচার কত ?

12.7 সারাংশ

12.8 প্রশ্নাবলী

12.9 কিছু বইয়ের নাম

12.1প্রস্তাবনা

এর আগে আপনারা অলোকের প্রতিসরণ সম্পর্কে জেনেছেন। আলো ঘন মাধ্যম দিয়ে চলার পথে যদি লঘু মাধ্যমে আপতিত হয় আর সেই আপতন কোণ উভয় মাধ্যমের অন্তর্গত সংকট কোণের থেকে বেশি হলে আলো পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের ফলে প্রথম মাধ্যমে চলে আসে। এই ঘটনার ব্যবহারিক প্রয়োগ আলোকীয় তন্তুর সাহায্যে যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমরা দেখতে পাই। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা আলোকীয় তন্তু সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাবো। আলোকীয় তন্তুর প্রকার ভেদ জানার সাথে সাথে আমরা ওই তন্তুর ব্যবহারিক প্রয়োগও জানতে পারবো। আলোকীয় তন্তুর যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োগ সম্পর্কে আমরা অবহিত হবো। সর্বশেষে যে কোনো স্টেপইনডেক্স আলোকীয় তন্তুর নিউম্যারিক্যাল অ্যাপারচার সম্বন্ধে আমরা ধারণা পাবো।

উদ্দেশ্য ঃ বর্তমান পাঠের উদ্দেশ্য হল আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় আলোকীয় তন্তু ও অপটো ইলেকট্রনিক্স যে

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তার সম্পর্কে কিছু জানা।

12.2 আলোকীয় তন্তু কি?

আলোকীয় তন্তু হল এক ধরনের অত্যন্ত সরু চুলের মত নিরেট কাচের নল। যে নলের ব্যাস 125 থেকে 150 মাইক্রন (মাইক্রোমিটার)। আলোকীয় তন্তু বা optical fibre-এর ব্যাস সমগ্র দৈর্ঘ্য জুড়ে একই থাকে। আর এই তন্তুর দৈর্ঘ্য কয়েক মিটার থেকে কয়েক শ পা কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। এই আলোক তন্তুকে আমরা একটি সুন্দর ওয়েভ গাইড (wave guide) হিসেবেও ভাবতে পারি। আলোক রশ্মিকে যদি উপযুক্তভাবে এই তন্তুর মধ্যে প্রবেশ করানো হয়, তাহলে অতি স্বচ্ছন্দে সেই রশ্মি আলোক তন্তুকে মাধ্যম করে বহুদূর পর্যন্ত তন্তুর সরলরৈখিব পথে বা বক্ররৈখিক পথে এগিয়ে যেতে পারে। প্রতি কিলোমিটার যাওয়ার জন্য আলোক রশ্মির এই তন্তু পথে শোষণও অত্যন্ত কম হয়। বিভিন্ন পলিমার দিয়েও তন্তু তৈরি করা যায়।

12.3 আলোকীয় তন্তু গঠন কি রকম ?

আলোকীয় তন্তুর গঠন কিন্তু অদ্ভুত। এই তন্তুর মাধ্যম তৈরি হয় দুটি ভিন্ন ভিন্ন প্রতি সরাংক (refractive index) - বিশিষ্ট একই মাধ্যম দিয়ে। অর্থাৎ যদি কাচ মাধ্যম দিয়ে তন্তু তৈরি করা হয় তাহলে দুটি ভিন্ন প্রতিসরাংকের কাচ দরকার হবে একটি আলোক তন্তু তৈরি করতে। একই ভাবে যদি পলিমার মাধ্যম হয় তাহলে দুটি ভিন্ন প্রতি সরাংকের একই পলিমার প্রয়োজন হবে একটি আলোকীয় তন্তু তৈরি করতে। 12.1 চিত্রে আমরা একটি আলোকীয় তন্তুর দ্বিমাত্রিক ব্যবচ্ছেদ দেখাচ্ছি।

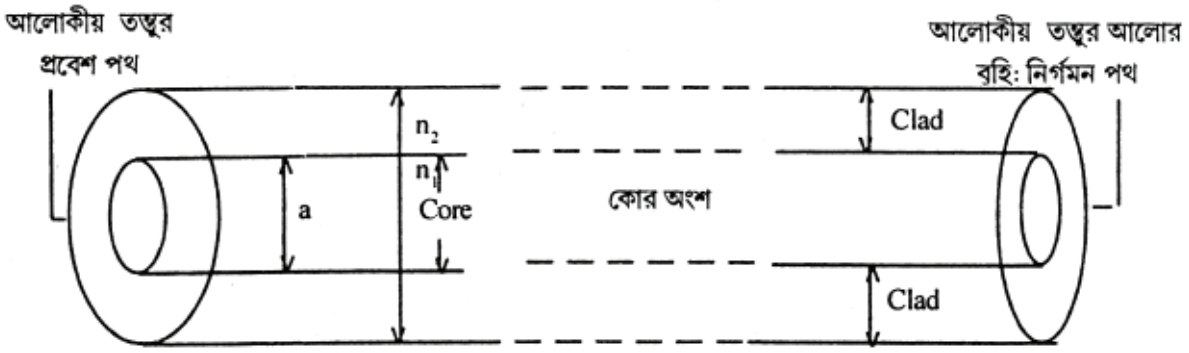

চিত্র 12.1 : একটি আলোক তন্তু।

এই চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি আলোক তন্তুর অন্তস্থল বা কোর (core) অংশটি n_1 প্রতিসরাংকের কাঁচ দিয়ে তৈরী এবং বহিরাংশটি (cladding part) n_2 প্রতিসরাংকের কাঁচ দিয়ে তৈরি। কোরের ব্যাস যদি a হয় তবে কোর সমেত ক্লাডের ব্যাস b । এই ধরনের আলোক তন্তুকে বলা হয় স্টেপ ইনডেক্স আলোকীয় তন্তু (step index optical

fibre) । কোর অংশের ব্যাস যেমন সমগ্র তন্তু বরাবর একই থাকে তেমনই কোর সমেত ক্লাডের ব্যাস সমগ্র তন্তু জুড়ে একই থাকে বা সমান থাকে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সমগ্র তন্তু বরাবর কোর সমেত ক্লাডের ব্যাস 'b' হবে এবং কেবলমাত্র কোরের ব্যাস সমগ্র তন্তু বরাবর 'a' ই থাকবে।

এখানে একটি বিষয় বলা অত্যন্ত জরুরি। সেটি হল 'b' যেমন 'a'র তুলনায় বড় অর্থাৎ b > a, তেমনি 'n_1' কিন্তু 'n_2'র তুলনায় বড় হবে। অর্থাৎ অর্থাৎ $n_1 > n_2$ স্টেপ ইনডেক্স আলোক তন্তুর ক্ষেত্রে কোরের প্রতিসরাংক অবশ্যই ক্লাডের প্রতি সরাংকের বেশি হতে হবে। আমরা 12.2 চিত্রে কিভাবে আলোকরশ্মি আলোকীয় তন্তুকে মাধ্যম করে প্রবাহিত হয় তা দেখাচ্ছি। তবে অবশ্যই স্টেপ আলোকীয় তন্তুর ক্ষেত্রে। এই ধরনের একটি স্টেপ ইনডেক্স আলোকীয় তন্তু দেখানো হয়েছে ২ নং চিত্রে। এই তন্তুতে ডট্ চিহ্ন দেওয়া রেখাটি (dotted line) এই

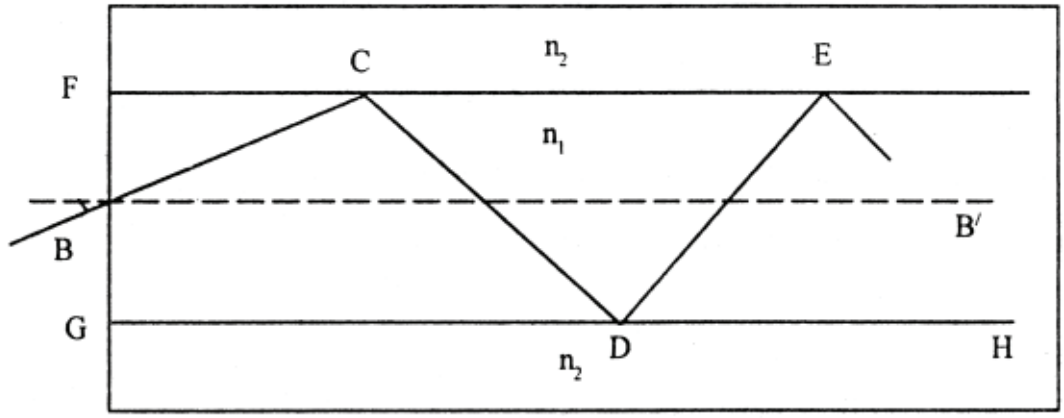

চিত্র 12.2 : আলোকীয় তন্তুর মধ্য দিয়ে আলোর প্রবাহ। তন্তুটিকে একটি দ্বিমাত্রিক তলে দৈর্ঘ্য বরাবর ব্যবচ্ছেদ দেখান হয়েছে।

আলোক মাধ্যমের মাঝ-বরাবর গিয়েছে। এই রেখাটিই হল আলোকীয় অক্ষ রেখা। অর্থাৎ আলোকীয় তন্তু বা অপটিক্যাল ফাইবারটি যে নিরেট ঘন সিলিন্ডার দিয়ে তৈরি তার অক্ষটিই হল এই রেখাটি। 12.2 চিত্রে তন্তুর একটি দৈর্ঘ্য বরাবর ব্যবচ্ছেদ দেখানো হয়েছে। এই তন্তুর কোরটি 'n_1' প্রতিসরাংকের কাচ মাধ্যম এবং ক্ল্যাড বা কভার (cover) টি 'n_2' প্রতি সরাংকের কাচ মাধ্যম। ধরা যাক AB একটি আলোক রশ্মি, যা তন্তুর প্রবেশ পথে কোরের আলোক অক্ষের B বিন্দুতে পতিত হয়। এর পর আলোক রশ্মিটি প্রতিসরিত হয়ে BC রেখা ধরে কোর ও ক্ল্যাডের বাউন্ডারী (boundary) সম্বলিত বক্রতলের C বিন্দুতে পড়ে। এখানে AB রশ্মিকে এমনভাবে এবং এমন দিকে ফেলা হয় অর্থাৎ θ কোণের এমন একটি মানে AB কে পতিত করা হয়; যাতে BC রশ্মি FCE রেখা সূচিত কোর ও ক্ল্যাডের বাউন্ডারীর বক্রতল থেকে অভ্যন্তরীন পূর্ণ প্রতিফলন (Total internal reflection) হতে পারে। এইভাবে আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন হলে BC রশ্মির সমগ্র অংশটি কোর থেকে ক্ল্যাডে না প্রতিসরিত হয়ে আবার কোরে

ফিরে আসে এবং CD পথে প্রবাহিত হয়। CD রশ্মি এবার GDH রেখা দ্বারা সূচিত বক্রতলের (এই বক্রতলটিও কোর ও ক্ল্যাডের বাউন্ডারীর বক্রতল) D বিন্দু থেকে পুনরায় অভ্যন্তরীন পূর্ণ প্রতিফলন হয় এবং DE পথে রশ্মিটি এগিয়ে যায়। দ্বিতীয় অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের কারন FCE রেখা ও GDH রেখা সম্পূর্ণ সমান্তরাল। এইভাবে কোর ও ক্ল্যাডের মিলনস্থল (Boundary) থেকে বার বার অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন হয়ে রশ্মিটি বহুদূর এগিয়ে যায় এবং সবশেষে তন্তুর বহির্মুখ থেকে নির্গমন হয়। যেহেতু অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের দ্বারা রশ্মিটি কোরের মধ্যেই অন্তর্নিহিত থাকে সেই কারণে আলোক রশ্মিটির তীব্রতার পরিমাণও খুব কম হয় না, যখন এটি তন্তু মাধ্যমে প্রবাহিত হয়।

12.4 আলোকীয় তন্তু কত প্রকার?

এবার আমরা আলোচনা করব যে আলোকীয় তন্তু সাধারণত কত প্রকার হয়। উত্তরটি হল চার প্রকার। 3 নং চিত্রে এই চার ধরনের তন্তু বা optical fibre দেখানো হয়েছে।

৩ (ক) চিত্রে আমরা যে ধরণের আলোকীয় তন্তু দেখতে পাচ্ছি তার নাম এক মোড বিশিষ্ট স্টেপ ইনডেক্স আলোকীয় তন্তু (single mode step index optical fibre) । এই তন্তুর কোরের ব্যাস 5 মাইক্রোমিটার (μm) থেকে 10 মাইক্রোমিটার (μm) পর্যন্ত হয়। কিন্তু কোর সমেত সমগ্র তন্তুর ব্যাস 125 মাইক্রোমিটার। এই ৩ (ক) চিত্রের ডান দিকে এই ধরনের তন্তুর প্রতিসরাংক প্রোফাইল (refractive index profile) দেখানো হয়েছে। এখানে তন্তুর আলোকীয় অক্ষরেখা থেকে তন্তুর পরিধির উভয় দিকে $\frac{a}{2}$ দূরত্ব পর্যন্ত n_1 প্রতিসরাংক (অর্থাৎ সমগ্র কোর মাধ্যম জুড়ে n_1 প্রতিসরাংক) বিশিষ্ট মাধ্যম এবং উভয় দিকে (Y অক্ষে) $\frac{a}{2}$ দূরত্ব থেকে $\frac{b}{2}$ দূরত্ব পর্যন্ত মাধ্যমের প্রতিসরাংক n_2 (অর্থাৎ সমগ্র ক্লাড বা কভার জুড়ে n_2 প্রতিসরাংকের মাধ্যম) এবং Y অক্ষ উভয়দিকে $\frac{b}{2}$ দূরত্ব হতে সমগ্র ক্ল্যাডের বাইরের অংশ n_0 প্রতি সরাংকের মাধ্যম। এই n_0 প্রতিসরাংকের মাধ্যমটিকে আমরা বায়ু মাধ্যম হিসেবেও ভাবতে পারি যদি ক্ল্যাড বা কভারের পরের মাধ্যমটি বায়ু থাকে। কিছু কিছু তন্তুর এই কভারের পরের মাধ্যম টি থাকে একটি প্লাস্টিক বা পলিমার। অর্থাৎ আলোকীয় তন্তুটি একটি প্লাস্টিক বা পলিমার আবরণ (জ্যাকেট) দ্বারা আবৃত থাকে। সেক্ষেত্রে n_0 হবে ওই প্লাস্টিকের প্রতিসরাংক। এই ৩(ক) এবং ৩ (খ) চিত্রের ডানদিকে অঙ্কিত ওই আলোকীয় তন্তুগুলির প্রতিসরাংক প্রোফাইল (refractive index profile)-টিকে দেখতে অনেকটা সিঁড়ি বা স্টেপের (step) মত, সেই কারণে এই ধরনের আলোকীয় তন্তুকে স্টেপ ইনডেক্স তন্তু (step index optical fibre) বলে। এক মোড বিশিষ্ট স্টেপ ইনডেক্স আলোকীয় তন্তু তার ধর্ম অনুযায়ী কেবল একটিমাত্র মোডের আলো পরিবহণ করতে সক্ষম। নিখুঁত যোগাযোগ ব্যবস্থার (communication system), তা যে অ্যানালগ যোগাযোগ ব্যবস্থাই (analog communication system) হোক বা ডিজিট্যাল যোগাযোগ ব্যবস্থা (digital communication system) হোক এই এক মোড বিশিষ্ট তন্তু খুবই উপযোগী।

এবার আমরা আসি 12.3(খ) চিত্রের বেলায়। এই চিত্রে একটি বহু মোড বিশিষ্ট স্টেপ ইনডেক্স (multimode optical fibre) দেখানো হয়েছে। এই আলোকীয় তন্তুর কোরের ব্যাস ৩ (ক) চিত্রে দেখানো আলোকীয় তন্তুর কোরের ব্যাসের তুলনায় অনেকটা বেশি। কিন্তু প্রতিসরাংক সম্পর্কিত অন্যান্য ধর্ম বহু মোড বিশিষ্ট স্টেপ ইনডেক্স আলোকীয় তন্তু উভয় ক্ষেত্রে একই। অর্থাৎ দুটিই স্টেপ ইনডেক্স আলোকীয় তন্তু। এই তন্তু এক সংঙ্গে অনেকটা আলোক পরিবহনে সক্ষম। কারণ আলোকের অনেক মোড পরিবহন করতে পারে এই তন্তু। এই তন্তুর ব্যবহারও অনেক। যেখানেই বেশি আলোক পরিবহনের দরকার সেখানেই এই তন্তু ব্যবহার করা হয়। যেমন ধরা যাক এন্ডোস্কোপিতে সেখানে যে আলোকীয় তন্তু ব্যবহার করা হয় তা এই ধরনের তন্তু। প্রতিবিম্ব (image) পরিবহনেও এই তন্তুর খুব ব্যবহার হয়। এরকম আরও অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে বহু মোড বিশিষ্ট আলোকীয় তন্তুর ব্যবহার হয়। কিন্তু নিঁখুত উচ্চপলিস্ কম্পাংকের ডিজিট্যাল যোগাযোগ ব্যবস্থায় (high pulse frequency based digital communication system) বহু মোড বিশিষ্ট স্টেপ-ইনডেক্স আলোকীয় তন্তুর তুলনায় এক মোড বিশিষ্ট স্টেপ-ইনডেক্স আলোকীয় তন্তুর প্রয়োগ অনেক বেশি। এই বহু মোড বিশিষ্ট তন্তুর কোরের ব্যাস 40 থেকে 50 মাইক্রোমিটার। কিন্তু সমগ্র তন্তুর ব্যাস 125 মাইক্রোমিটারই থাকে।

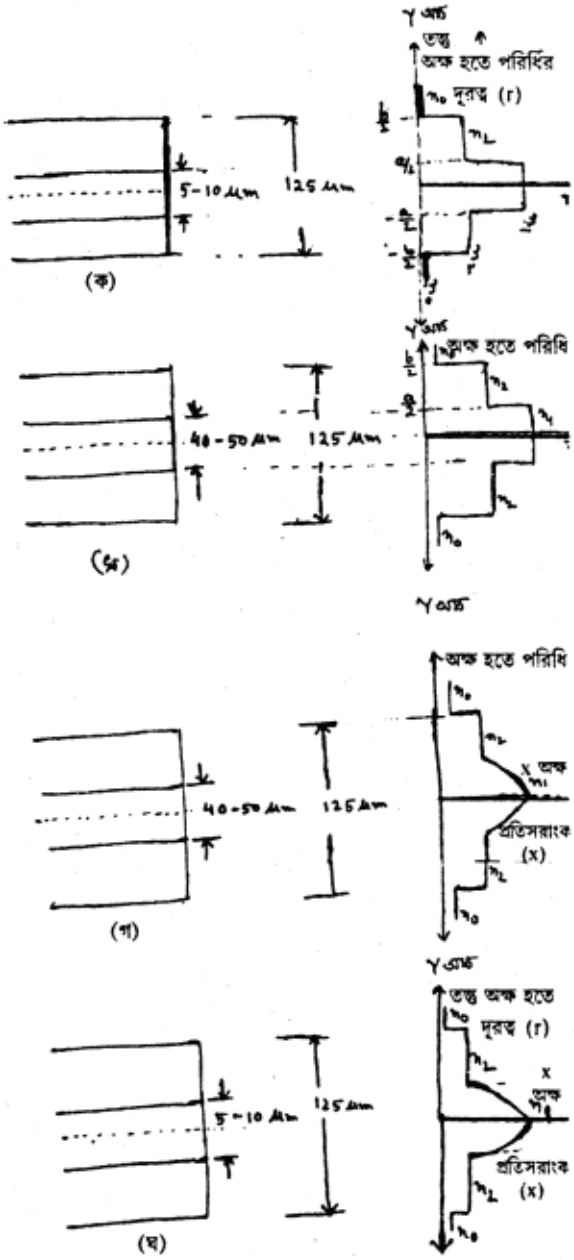

চিত্র 12.3 : বিভিন্ন প্রকারের আলোকীয় তন্তু

এবার আমরা আসব 12.3 (c) চিত্রের ক্ষেত্রে। এখানে যে ধরনের আলোকীয় তন্তু দেখানো হয়েছে তার নাম বহু মোড বিশিষ্ট গ্রেডেড ইনডেক্স আলোকীয় তন্তু। এই তন্তুর কোরের ব্যাস 40 থেকে 50 মাইক্রোমিটার থাকে এবং সমগ্র তন্তুর ব্যাস 125 মাইক্রোমিটার হয়। 12.3 (c) চিত্রের ডান দিকে এই ধরনের তন্তুর প্রতিসরাংক প্রোফাইল দেখানো হয়েছে। এর প্রতিসরাংক প্রোফাইল স্টেপ ইনডেক্সের প্রতিসরাংক প্রোফাইল থেকে আলাদা। এই বহু মোড বিশিষ্ট গ্রেডেড ইনডেক্স আলোকীয় তন্তুর (multimode graded index optical fibre) অক্ষে প্রতিসরাংক সব থেকে বেশি (n_1)। তারপর তন্তু অক্ষ থেকে পরিধির দিকে ব্যাস বরাবর প্রতিসরাংক ধীরে ধীরে তন্তু অক্ষের উভয় দিকেই কমতে থাকে। এইভাবে কমতে কমতে কোর এবং ক্লাডের সংযোগকারী তল (Boundary level) পর্যন্ত প্রতিসরাংক কমে। n_2-ই হল ক্লাড মাধ্যমের প্রতিসরাংক। ক্লাডের বাইরে থাকে বায়ু বা প্লাস্টিক জ্যাকেটের আবরণের প্রতিসরাংক n_0। এই তন্তুর কোর মাধ্যমের প্রতিসরাংক আলোক অক্ষ থেকে আলোক অক্ষের উভয় দিকে ধীরে ধীরে বা একটি গ্রেড (grade) অনুসরণ করে কমে বলে এই ধরনের তন্তুর নাম গ্রেডেড ইনডেক্স বহু মোড বিশিষ্ট তন্তু (graded index multimode fibre)। এই ধরনের তন্তু তৈরি করা খরচ সাপেক্ষ। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে প্রতিবিম্ব পরিবহণ পর্যন্ত সমস্ত ক্ষেত্রেই এই তন্তুর ব্যবহার অত্যন্ত উপযোগী।

এবার আমরা সর্বশেষ ধরনের আলোকীয় তন্তুর কথা বলব। সেটি দেখানো হয়েছে 3(d) চিত্রে। এই আলোকীয় তন্তুটি হল এক মোড বিশিষ্ট গ্রেডেড ইনডেক্স আলোকীয় তন্তু (single mode graded index optical fibre)। এই তন্তুটির প্রতিসরাংক প্রোফাইল 3(c) চিত্রে দেখানো বহু মোড বিশিষ্ট গ্রেডেড ইনডেক্স আলোকীয় তন্তুটির মতই। পার্থক্য হল এই এক মোড বিশিষ্ট গ্রেডেড ইনডেক্স তন্তুটির কোর ব্যাসার্ধ 4 থেকে 5 মাইক্রোমিটার পর্যন্ত। এবং এই ধরনের তন্তু কেবলমাত্র একটি মোড বহন করতে সক্ষম। তার ফলে এই তন্তু বেশি ক্ষমতার আলোক পরিবহণ করতে পারে না। কিন্তু ডিজিট্যাল যোগাযোগে অসাধারণ ব্যবহারিক সুবিধা পাওয়া যায় এই তন্তু দ্বারা। এই তন্তু অতি উচ্চ কম্পাংকের ডিজিট্যাল পালস (high frequency digital pulse) পরিবহণ করতে পারে অনেক দূর পর্যন্ত। আবার অতি উচ্চ ক্ষমতার আলোক পালসও পাঠানো যায় এই তন্তুর মাধ্যমে। একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলতেই হবে, যে এক মোড বিশিষ্ট গ্রেডেড ইনডেক্স তন্তু তৈরি করা বেশ খরচ সাপেক্ষ।

এবার আমরা 4 নং চিত্র দ্বারা দেখাব স্টেপ ইনডেক্স আলোকীয় তন্তু ও গ্রেডেড ইনডেক্স আলোকীয় তন্তুতে কিভাবে আলোক রশ্মি প্রবাহিত হয়। 4ক চিত্রে স্টেপ ইনডেক্স তন্তুতে ও 4(B) চিত্রে গ্রেডেড ইনডেক্স তন্তুতে আলোক প্রবাহ দেখানো হয়েছে। স্টেপ ইনডেক্স তন্তুতে আলোক প্রবাহের বিষয়টি আগেও (2নং চিত্রে) বলা হয়েছে। তাই প্রথমে আমরা 4(B) চিত্রে গ্রেডেড ইনডেক্স তন্তুতে কিভাবে আলোক রশ্মি প্রবাহিত হয় তার বর্ণনা করব।

এই 4(B) চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি FO, F'O, F"O, F"O চারটি আলোক রশ্মি গ্রেডেড ইনডেক্স তন্তুর প্রবেশ

পথে O বিন্দুতে পতিত হচ্ছে। FO এবং F'O দুটি রশ্মি কোণে তন্তুর মুখে পতিত হচ্ছে। FO রশ্মি OA''' B C'''

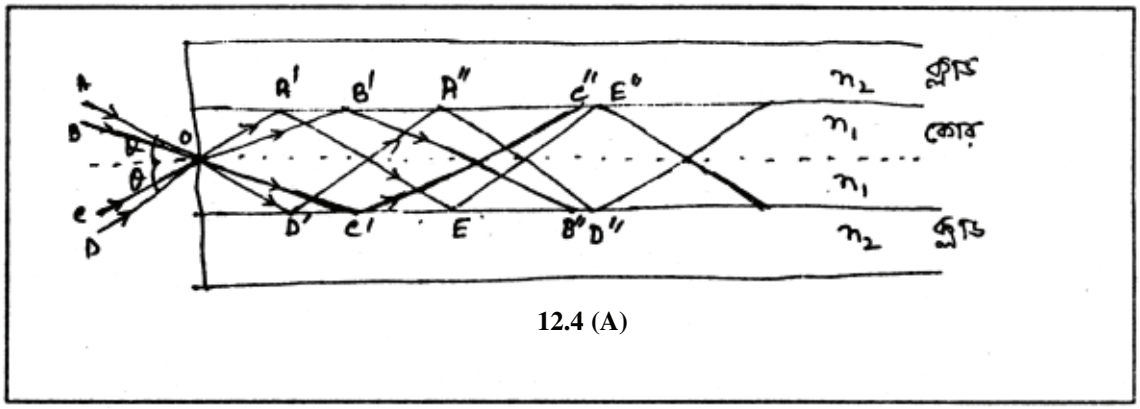

12.4 (A)

DE''' পথে প্রবাহিত হয়। FO রশ্মি তন্তুতে প্রবেশ করে একটি দিকে প্রবাহিত না হয়ে ক্রমশ তন্তুর আলোক অক্ষের দিকে বেঁকতে থাকে। এইভাবে বেঁকতে বেঁকতে A''' বিন্দুতে রশ্মিটি আলোক অক্ষের সমান্তরাল হয় এবং আরও বেঁকতে বেঁকতে B বিন্দুতে তন্তুর আলোক অক্ষকে স্পর্শ করে এবং অতিক্রম করে। তার পর ওই রশ্মি আবারও বেঁকতে শুরু করে ও একইভাবে C''' D E''' পথে প্রবাহিত হয়। এইরকম ভাবে FO, F'O, F''O, 3 F'''O প্রত্যেকেই প্রবাহিত হয়। F'O রশ্মি প্রবাহিত হয় O A''B C''D E'' পথে। F''O রশ্মি প্রবাহিত হয় O A' B C' DE'

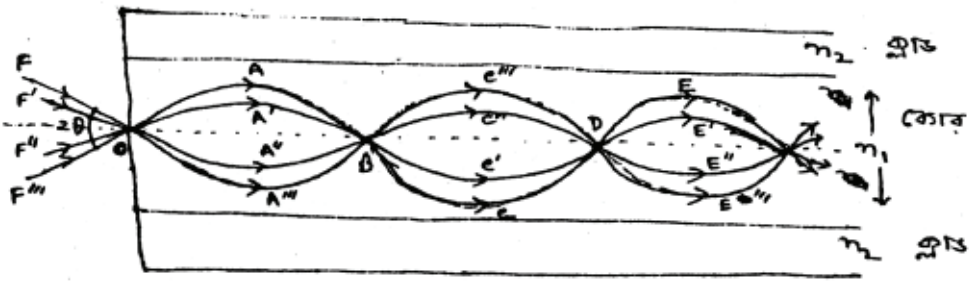

12.4 নং চিত্র : (A) স্টেপ ইনডেক্স আলোকীয় তন্তুতে আলোক প্রবাহ

(B) গ্রেডেড ইনডেক্স আলোকীয় তন্তুতে আলোক প্রবাহ

পথে। আর F'''O রশ্মি প্রবাহিত হয় O A B C D E পথে। রশ্মিগুলি তন্তুর মধ্যে প্রবেশ করে ক্রমশই তন্তুর

আলোক অক্ষের দিকে বেঁকতে থাকার কারণ হল তন্তু কোরের প্রতিসরাংক তন্তুর আলোক অক্ষে সর্বোচ্চ এবং তা ক্রমশ কমে একটি গ্রেড অনুযায়ী যাতে ওই অক্ষ থেকে তন্তুটির পরিধির দিকে তার ব্যাসার্ধ নির্দেশিত পথে এগোন যায় এবং সবথেকে কম হয় কোর ও ক্লাডের মিলনস্থলে (Boundary)। তারপর ক্লাডে একটি নির্দিষ্ট প্রতিসরাংক থাকে। তাই প্রতিসরণের সরল নিয়মানুযায়ী তন্তুর কোরের মধ্যে আলোক রশ্মির এই বেঁকে যাওয়ার ঘটনাটি ঘটে। কিন্তু এখানে একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে O বিন্দুতে যদি রশ্মিগুলি একসংগে পতিত হয়, তাহলে একটি আদর্শ গ্রেডেড ইনডেক্স তন্তুতে ওই রশ্মিগুলি বিভিন্ন পথ ধরে যাওয়ার পর B বিন্দুতে আবার একইসংগে মিলিত হয় এবং আবার যাত্রা শুরু করে বিভিন্ন পথ ধরে রশ্মিগুলি যাওয়ার পর আবার একই সংগে D বিন্দুতে মিলিত হয় এইভাবে রশ্মিগুলি তন্তুর কোরের মধ্যে এগিয়ে যায়। এখানে O, B, ইত্যাদি মিলন বিন্দুগুলি তন্তুর আলোক অক্ষের ওপর অবস্থিত। আরও একটি কথা এখানে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হল যে কোনো রশ্মিই এই গ্রেডেড ইনডেক্স তন্তুর মধ্যে এইভাবে প্রবাহিত হবে না। কেবলমাত্র সেই রশ্মিগুলিই তন্তুর মধ্য দিয়ে এইভাবে যাবে যারা তন্তুর নিউম্যারিক্যাল অ্যাপারচার (Numerical aperture) নির্দেশিত ঘন কোণ (solid angle) এর মধ্যে পতিত হয়েছে। যদি θ তন্তুর নিউম্যারিক্যাল অ্যাপারচার (numerical aperture) নির্দেশিত ঘন কোণ হয় তাহলে 2θ ঘনকোণের মধ্যে যে সব রশ্মি পড়বে তারাই তন্তুর মধ্য দিয়ে ঐ ভাবে প্রবাহিত হবে। কিন্তু ঐ 2θ ঘন কোণের বাইরের O বিন্দুতে পতিত রশ্মিগুলি তন্তু মধ্যে প্রবেশ করলেও, প্রবেশের পরেই তন্তু থেকে বেরিয়ে যাবে। তারা 12.4(B) চিত্রে দেখান পথে কোরের মধ্যে প্রবাহিত হবে না।

এবার আমরা 12.4(A) চিত্রে আলোক রশ্মি প্রবাহ সম্বন্ধে দু-চার কথা বলব। এটি একটি স্টেপ ইনডেক্স আলোকীয় তন্তু। এই তন্তুর প্রবেশ মুখে AO, BO, CO এবং DO চারটি আলোক রশ্মি পতিত হচ্ছে দেখানো হয়েছে। এই রশ্মিগুলি তন্তুর কোর মাধ্যমের মধ্য দিয়ে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের নিয়মানুযায়ী প্রবাহিত হয়। এই রশ্মিগুলি তন্তুর মধ্যে প্রবেশ করে তন্তুর কোর ও ক্লাডের সংযোগকারী বক্রতল হতে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন হতে গেলে রশ্মিগুলিকে তন্তুর প্রবেশ-মুখে তন্তুর আলোক অক্ষের সাথে একটি নির্দিষ্ট ও সর্বোচ্চ কোণের কম হতে হবে। ধরা যাক, এই সর্বোচ্চ কোণটি θ। অর্থাৎ তন্তুর আলোক অক্ষ 4(A) চিত্রে ..... ডটেড (dotted) রেখা দ্বারা দেখানো হয়েছে। 1) কে ঘিরে $\theta + \theta = 2\theta$ ঘন কোণের (solid angle) মধ্যে যে সমস্ত আলোক রশ্মি পড়ে কেবল মাত্র সেই রশ্মিগুলিই তন্তুর কোর ও ক্লাডের সংযোগকারী বক্রতল থেকে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের সুযোগ পাবে। এর বাইরে অর্থাৎ তন্তুর আলোক অক্ষের সংগে θ কোণের বেশী কোণে আপতিত রশ্মিগুলি ওই বক্রতল থেকে কোনোভাবেই অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের সুযোগ পাবে না এবং তার ফলে 2θ ঘনকোণটির মধ্যস্থ আপতিত আলোকরশ্মিগুলি তন্তুর কোর মাধ্যম অবলম্বন করে আলোকীয় তন্তুর প্রবেশ মুখ থেকে বহির্মুখে ধাবিত হবে তন্তুর দৈর্ঘ্য বরাবর। আর যে সমস্ত রশ্মি ওই 2θ ঘনকোণটির বাইরে তন্তুঅক্ষের সংগে θ কোণের বেশি কোণে আপতিত

হয় তারা এইভাবে প্রবাহিত হবে না। অর্থাৎ আলোকীয় তন্তু দ্বারা ওই রশ্মিগুলি প্রবাহের ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যাত হবে। এই 2θ কোণটিই তন্তুর অ্যাপারচার কোণ (aperture angle) এবং Sinθ কে বলা হয় আলোকীয় তন্তুর নিউম্যারিক্যাল অ্যাপারচার (numerical aperture)। আমরা পরবর্তী কালে দেখাব $\text{Sin}\,\theta = (n^2_1 - n^2_2)^{\frac{1}{2}}$, যেখানে n_1 হল তন্তুর কোর মাধ্যমের প্রতিসরাংক এবং n_2 হল তন্তুর ক্লাড মাধ্যমের প্রতিসরাংক। এখানে ধরা হয়েছে তন্তুর বাইরে বায়ু অবস্থিত, যার প্রতিসরাংক $n_0=1$। একটি আলোকীয় তন্তুর নিউম্যারিক্যাল অ্যাপারচার জানা অত্যন্ত জরুরি। কারণ নিউম্যারিকাল অ্যাপারচারই বলে দেবে তন্তুর অ্যাপারচার কোণ কত বেশি বা কম এবং অ্যাপারচার কোণ (aperture angle) বেশি হলে আলোকীয় তন্তুটি বেশি আলো বহন করে নিয়ে যাবে এবং অ্যাপারচার কোণ কম হলে তন্তুটি কম আলো বহন করে নিয়ে যাবে।

আলোকীয় তন্তুর মধ্য দিয়ে আরও এক ধরনের আলোক রশ্মি প্রবাহিত হয়। এই রশ্মিগুলি তন্তুর আলোক অক্ষকে স্পর্শ না করে তন্তুর প্রবেশ মুখ দিয়ে প্রবেশ করে তার কোর ও ক্লাডের সংযোগকারী বক্রতলে আপতিত হয় ও অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন হয়। এইভাবে একবার অভ্যন্তরীণ পূর্ণ ফলিত হয়ে আবারও উল্টো দিকের তলে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলিত হয় এবং তারপর বারে বারে ওই সংযোগকারী তলে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলিত হয়ে তন্তুর কোরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। এইভাবে তন্তুর কোর মাধ্যমের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আলোকীয় তন্তুর বহির্মুখ থেকে নির্গমণ হয়। এই রশ্মিগুলির নাম স্কিউ রশ্মি (skew rays)। স্কিউ রশ্মির অ্যাপারচার কোণ (aperture angle) পূর্বোক্ত রশ্মিগুলির অ্যাপারচার কোণের তুলনায় বেশি হয়। আগের রশ্মিগুলিকে (যেগুলি তন্তুর আলোক অক্ষকে স্পর্শ করে বারেবারে তন্তুর কোর ও ক্লাডের সংযোগকারী বক্রতল থেকে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলিত হয়ে তন্তুর প্রবেশ মুখ থেকে বহির্মুখের দিকে এগিয়ে যায়) বলা হয় মেরিডিওন্যাল রশ্মি (meridional rays)। 12.5 চিত্রে এই স্কিউ রশ্মির প্রবাহ দেখানো হয়েছে।12.2এবং 12.4 চিত্রে দেখানো রশ্মিগুলি মেরিডিওন্যাল রশ্মি।

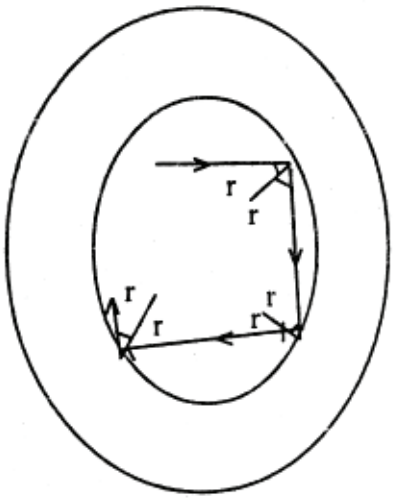

চিত্র **12.5** ঃ স্টেপ ইনডেক্স আলোকীয় তন্তুর প্রস্থচ্ছেদে স্কিউ রশ্মি প্রবাহটি দেখান হয়েছে।

এখানে প্রবেশ মুখে এই স্কিউ রশ্মির প্রস্থ বরাবর প্রবাহটি অঙ্কিত করা হয়েছে। এই স্কিউ রশ্মির প্রবাহটি তুলনামূলক ভাবে জটিল তত্ত্ব দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। যেখানে - মেরিডিওন্যাল রশ্মির প্রবাহের তত্ত্ব অনেক সরল তত্ত্ব (theory) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

এবার আমরা আলোচনা করব আলোকীয় তন্তুকে সংকেত পরিবহণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে যোগাযোগ ব্যবস্থায় কি কি সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়।

12.5 আলোকীয় তন্তুর ব্যবহারিক সুযোগগুলি কি কি?

ব্যবহারের ক্ষেত্রে আলোকীর তন্তুর ব্যবহার অনেক অনেক সুবিধাজনক। প্রচলিত তড়িৎ পরিবাহী মাধ্যম (electrically conducting media) গুলির তুলনায় আলোকীয় তন্তু সংকেত পরিবহন (signal carrying) ও যোগাযোগ (communication) ব্যবস্থায় অনেক উপযোগী। আমরা এবার এক এক করে এই বিষয়গুলি বলব।

12.5.1 যোগাযোগে আলোকীয় তন্তু

(1) আলোকীয় তন্তুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সংকেতের প্রবাহজনিত ক্ষতির (মাধ্যম দ্বারা শোষণ, স্ক্যাটারিং বা ছড়িয়ে যাওয়া জনিত ক্ষয়, মাধ্যম থেকে বেরিয়ে যাওয়া বা লিকেজ leakage জনিত ক্ষয়) অত্যন্ত কম। অর্থাৎ তন্তুর প্রবেশ মুখে ঢোকা সংকেত দূরত্বের সংঙ্গে অনেক অনেক কম হারে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তাই আলো তন্তুর মধ্য দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত অনেক কম বাধায় যেতে পারে।

(2) তন্তুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সংকেতটি যেহেতু আলোক সংকেত তাই তন্তুকে কোনও তড়িৎ বিভব (electric potential) যুক্ত বা তড়িৎ প্রবাহ (electric current) যুক্ত স্থানের মধ্য দিয়ে নিয়ে গেলে তন্তুর মধ্যস্থ সংকেতটি ওই তড়িৎ বিভব বা প্রবাহ দ্বারা কোনওভাবে প্রবাহিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। এই ধরনের স্থানের মধ্য দিয়ে কোনো তড়িৎ পরিবাহী তারের মধ্যস্থ পাঠান সংকেত অবশ্যই প্রভাবিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(3) তেমনই কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে আলোকীয় তন্তুকে নিয়ে গেলে তার মধ্যস্থ সংকেত কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। বিনা দ্বিধায় আলোক রশ্মি তন্তুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়।

(4) একটি পরিবাহী কত ভাল তথ্য পরিবহণে সক্ষম তা বিচার করার একটি বড় উপায় হল পরিবাহিটি কত উচ্চ কম্পাংকের সংকেত ভালভাবে পরিবহণ করতে পারে। এই বিষয়টিকে বলা হয় পরিবাহিটির চ্যানেল ব্যান্ড উইডথ্ (channel band width)। প্রচলিত তড়িৎ পরিবাহী তারের তুলনায় আলোকীয় তন্তুর ব্যান্ড উইডথ্ (band width) কয়েক লক্ষগুণ বেশি। তন্তু যেহেতু আলোক পরিবহন করে এবং আলোকের কম্পাংক প্রায় 10^{15} হার্জ (10^{15} Hartz) তাই এই আলোকীয় তন্তুর চ্যানেল ব্যান্ড উইডথ্ প্রায় 10^{15} কে।

(5) একটি পরিবাহী কত ভাল সংকেত পরিবহন করতে পারে তা বিচার করার আরও একটি বড় উপায় হল পরিবাহিটির মধ্য দিয়ে একসংগে কত বেশি সংকেত পাঠানো যাচ্ছে। প্রচলিত তড়িৎ পরিবাহী তারের মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক, ইলেকট্রনিক বা ইলেকট্রিক্যাল (electronic or electrical) সংকেত একসংগে পাঠানো যায় আলোক

তন্তুর মধ্য দিয়ে তার তুলনায় অনেক অনেক গুণ সংকেত একসঙ্গে পাঠানো হয়। কারণ সংকেতগুলি এখানে যেহেতু আলোক রশ্মি দ্বারা গঠিত তাই তারা কেউ কারোর সঙ্গে মিশে যায় না। তারা প্রত্যেকে নিজেদের স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে আলোকীয় তন্তুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। কিন্তু তড়িৎপ্রবাহী তারের মধ্য দিয়ে এরকম ভাবে একই সংঙ্গে অনেক সংকেত পাঠাতে গেলে সংকেতগুলি মিশে যায় এবং তারা পরস্পরের স্বতন্ত্রতা নষ্ট করে দেয়।

(6) আলোক তন্তুর মধ্য দিয়ে পাঠানো সংকেতগুলিকে বিভিন্ন মাল্টিপ্লেক্সিং করা যায়। এই মাল্টিপ্লেক্সিং সময় বিভাগীয় (টাইম ডিভিশন-time division), তরংগ দৈর্ঘ্য বিভাগীয় (wave length division). ইত্যাদি হতে পারে। এই সব মাল্টিপ্লেক্সি (multiplexing) অত্যন্ত সহজে করা যেতে পারে আলোকীয় তন্তুর মধ্য দিয়ে পাঠানো সংকেতগুলির মধ্যে। প্রচলিত তড়িৎপরিবাহী তারের মধ্য দিয়ে যত বেশি চ্যানেল মাল্টিপ্লেক্সিং করা যায় আলোকীয় তন্তুর মধ্য দিয়ে আরও অনেক অনেক বেশী চ্যানেল মাল্টিপ্লেক্সিং করা যায়। একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা (communication system) কত উন্নত তা উন্নত মাল্টিপ্লেসিং ব্যবস্থার নিরিখে বিচার করা যায়। মাল্টিপ্লেক্সিং করতে গেলে স্যাম্পলিং ব্যবস্থা একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। আলোকীয় তন্তুতে এই স্যাম্পলিং (sampling) ব্যবস্থা খুব সহজেই করা যায়।

(7) আলোকীয় তন্তু তৈরির বিষয়টি অত্যন্ত কম খরচ সাপেক্ষ। কারণ এই তন্তুর কাঁচামাল হল সিলিকা (SiO_2)। বালি (sand) এই সিলিকার উৎস। বালি প্রকৃতিতে অনেক বেশি পাওয়া যায়। তাই আলোকীয় তন্তুর কাঁচামাল পাওয়ার খরচও অত্যন্ত কম। যদি প্লাস্টিক বা পলিমার দিয়ে এই তন্তু তৈরি হয় তাহলেও খরচ খুব কম। তন্তু তৈরির যন্ত্রটি নির্মাণ করতে যা ব্যয় হয় সেটিই প্রধান ব্যয়।

(8) আলোকীয় তন্তু ওজনেও খুব হালকা। এই তন্তু ভেঙে গেলে প্রতিস্থাপনযোগ্য। দুটি তন্তুকে জুড়ে দেওয়ারও ভাল ব্যবস্থাও আছে।

(9) আলোকীয় তন্তুর মধ্য দিয়ে মডিউলেটেড সংকেত (modulated signal) সহজেই পাঠানো যায়। সেটা অ্যামপ্লিটিউড্ মডিউলেশন (amplitude modulation), কম্পাংক মডিউলেশন (frequency modulation) এবং ফেজ মডিউলেশন (phase modulation) যাই হোক না কেন।

(10) আলোকীয় তন্তুর মধ্য দিয়ে সংকেত পাঠানোর জন্য যে আলোক উৎস দরকার হয় তাও অত্যন্ত কম খরচ সাপেক্ষ। এই উৎসগুলি হল লাইট্ এমিটিং ডায়োড্ (light emitting diode) বা সংক্ষেপে এল.ই.ডি. (L.E.D), ইনজেকশন লেজার ডায়োড (injection laser diode) বা সংক্ষেপে আই.এল.ডি. (I.L.D.), সাধারন আলোক উৎস ইত্যাদি। এল.ই.ডি. বা আই. এল. ডি. থেকে আসলে খুব কম তড়িৎশক্তি লাগে। এই তড়িৎশক্তি মিলিওয়াট (milli-watt) হারে।

(11) আলোকীয় তন্তুর বহির্মুখ থেকে নির্গমন হওয়া আলোক শক্তি ও প্রবেশ মুখে ঢোকা আলোক শক্তির অনুপাত হল ইনপুট-আউটপুট অনুপাত। যেকোনও যোগাযোগ ব্যবস্থায় এই অনুপাত যত বেশি হয় ততই কাম্য। আলোকীয় তন্তুতে এই অনুপাত (ratio) অত্যন্ত বেশি অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থার তুলনায়।

(12) আলোকীয় তন্তু থেকে নির্গমন হওয়া আলোকে চিহ্নিতকরণ (detection) ব্যবস্থাটিও ভাল এবং কম খরচ সাপেক্ষ। ফোটো ডায়োড (photo diode), ফোটো ডিটেকটর (photo detector), ফোটো ট্রানসিস্টার (Photo transistor), পি. আই. এন. ফোটো ডায়োড (PIN Photodiode) ইত্যাদি অপটোইলেকট্রনিক ব্যবস্থার দ্বারা খুব সহজেই আলোকীয় তন্তু দ্বারা পরিবাহিত ও বহির্মুখে আগত আলোক সংকেতকে সনাক্ত করা যায়।

(13) যোগাযোগ ব্যবস্থার (communication system) সিগ্‌ন্যাল টু নয়েজ রেসিও (signal to noise ratio) একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যোগাযোগ ব্যবস্থায় যোগাযোগের চ্যানেল থেকে বেরন সংকেতের মধ্যে প্রকৃত সংকেত কত আছে এবং গোলমাল সৃষ্টিকারী সংকেত (noise) কতটা আছে তাদের অনুপাতই হল ওই সিগ্‌ন্যাল টু-নয়েজ রেসিও (signal to noise ratio)। যোগাযোগ ব্যবস্থায় এই রেসিও বা অনুপাতটি বেশি হওয়াই কাম্য। আলোকীয় তন্তুতে এই অনুপাতটি স্বভাবতই প্রচলিত ব্যবস্থার তুলনায় অনেক বেশি। এটি বেশি হলে আলোকীয় তন্তুর আউটপুটে (output) প্রকৃত সংকেত অনেক বেশি হবে এবং গোলমাল সৃষ্টিকারী সংকেত অনেক কম থাকবে।

আলোকীয় তন্তুকে যোগাযোগের ব্যবহারে উপরিউক্ত সুবিধাগুলি আমরা একের পর এক বললাম। এছাড়াও আরও অনেক সুবিধা আছে। আলোকীয় তন্তুকে যোগাযোগ ব্যবহারের সুবিধা এতই বেশি যে সব সুবিধা আমরা এখনও কাজে লাগাতে পারিনি। এবার আমরা অন্যান্য ক্ষেত্রে আলোকীয় তন্তুকে ব্যবহারের সুবিধাগুলি বলব।

12.5.2 যোগাযোগ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে আলোকীয় তন্তু

(14) আলোকীয় তন্তুকে সনাক্তকারী বা চিহ্নিতকারী ব্যবস্থা (detection system) বা সেনসর (sensor) হিসেবেও ব্যবহার করা যায় এবং খুব ভালভাবে অন্য সংকেতকে সনাক্তকরণের (detection) কাজ করতে পারে এই আলোকীয় তন্তু। কোনও তড়িৎ বিভব (electric potential), চাপ (pressure), অতি ক্ষুদ্র দূরত্ব (very small distance), তাপমাত্রা (temperature), ঘনত্ব, গতিবেগ ইত্যাদি সনাক্তকরণ ও মাপার কাজে আলোক তন্তুকে ভালভাবে ব্যবহার করা যায়।

(15) বিভিন্ন বিনোদনমূলক ব্যবস্থা (amusement system), খেলনা (toys) ইত্যাদিতে আলোকীয় তন্তুকে ভালভাবে ব্যবহার করা যায়।

(16) যেসব স্থান সাধারণভাবে আলোকিত করা অসুবিধাজনক সে সমস্ত স্থান আলোকীয় তন্তু দ্বারা আলোকিত করা যায়। চিকিৎসাশাস্ত্রে অপারেশনের আগে শরীরের অভ্যন্তরে কোনও-কোনও স্থান আলোকিত করে দেখার প্রয়োজন হয় বাইরে থেকে। সে-সব ক্ষেত্রে একটি মাল্টিমোড আলোকীয় তন্তুকে মুখগহ্বর বা অন্যান্য কোনও স্থান দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এবং তারপর তন্তু দ্বারা আলো পাঠিয়ে অভ্যন্তরটি আলোকিত করা হয় এবং অন্য একটি আলোক তন্তু দিয়ে সেই স্থান দেখা হয়। তাই চিকিৎসাশাস্ত্রে আলোক তন্তুর ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(17) কোনো প্রতিবিম্বকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে এই তন্তু দ্বারা।

12.5.3 আলোকীয় তন্তুর সাহায্যে একটি সম্পূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা

6নং চিত্রে আমরা একটি সম্পূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থার চিত্র দেখাচ্ছি। 6নং চিত্রে 'A' ইউনিটে যে তথ্যটি পাঠাতে হবে সেটি নেওয়া হল। তথ্যটি শব্দ বা ছবি বা দুটোই হতে পারে। এর পর 'B' ইউনিটে 'A' ইউনিটের তথ্যটিকে ইলেকট্রনিক সংকেতে রূপান্তরিত করা হয়। 'C' ইউনিটে 'B' ইউনিট থেকে আগত সংকেতকে প্রয়োজন অনুসারে মডিউলেট করা হয়। মডিউলেটেড সংকেতটিকে 'D' ইউনিটে আলোক উৎসের মধ্যে পাঠিয়ে আলোক সংকেত পরিবর্তন করা হয়। 'B' ইউনিটের পাওয়া আলোক সংকেতকে 'E' ইউনিটে আলোকীয় তন্তুর মধ্যে পাঠানো হয়। অপর পারে আলোকীয় তন্তু থেকে পাওয়া সংকেতকে 'F' ইউনিটে বৈদ্যুতিন বা ইলেকট্রনিক সংকেতে পরিবর্তন করা হয়। সেই C ইউনিটের সংকেতকে 'G' ইউনিটে পরিবর্ধন বা অ্যামপ্লিফিকেশন (amplification)।

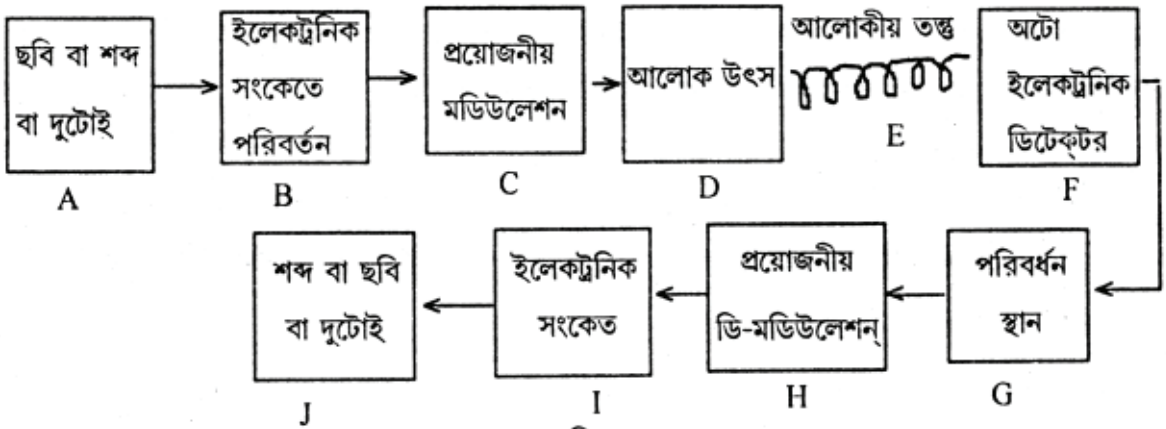

6 নং চিত্র :

আলোকীয় তন্তুকে ব্যবহার করে যোগাযোগ করা হয়। বর্ধিত বৈদ্যুতিন সংকেতকে 'H' ইউনিটে ডিমডিউলেশন (Demodulation) করা হয়। 'I' -ইউনিটে ডিমডিউলেটেড সংকেত থেকে প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনিক সংকেত বা বৈদ্যুতিন সংকেতকে উদ্ধার করা হয়। এই প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনিক সংকেত থেকে A-ইউনিটের ছবি বা শব্দ বা

দুটোই উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া শব্দ বা ছবি 'J' ইউনিটে পাওয়া যাবে। এখানে একটা কথা বলা বিশেষভাবে বলা দরকার 'A , B, C, D' এই চারটি ইউনিট প্রেরক ব্যবস্থা (sending system) এবং 'F, G, H, I, J ' এই পাঁচটি ইউনিট গ্রাহক ব্যবস্থা (receiving system) নামে পরিচিত। 'E' ইউনিটটি যোগাযোগ চ্যানেল। একটি সম্পূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থায় যোগাযোগ চ্যানেলের (communication channel) উভয় প্রান্তেই একটি করে প্রেরক ব্যবস্থা ও গ্রাহক ব্যবস্থা থাকবে। এই ধরনের যোগাযোগকে বলে ডুপ্লেক্স (duplex) যোগাযোগ (communication)।

12.6 স্টেপ ইনডেক্স আলোকীয় তন্তুর নিউম্যারিক্যাল অ্যাপারচার কত?

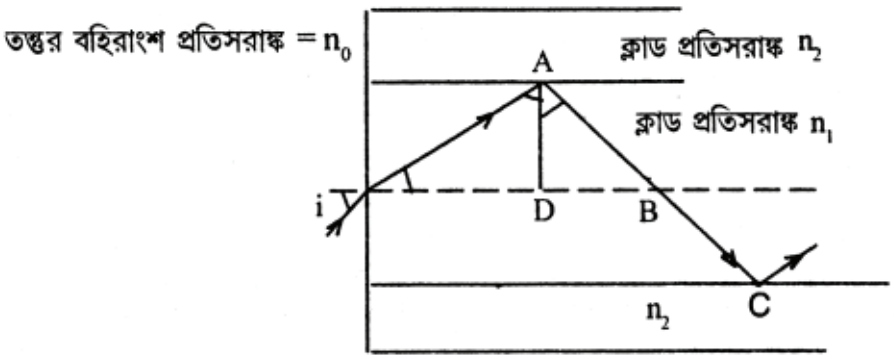

চিত্র 12.7

ধরা যাক FO একটি আলোক রশ্মি একটি স্টেপ ইনডেক্স আলোকীয় তন্তুর O বিন্দুতে আপতিত হয়। $\angle i$ হল ওই আলোক রশ্মির আপতন কোণ। অর্থাৎ তন্তুটির আলো অক্ষের সাথে FO রশ্মির উৎপন্ন কোণ। $\angle\theta$ হল প্রতিসরণ কোণ। OA হল কোরের মধ্যে প্রতিসরিত রশ্মি যা পুনরায় A বিন্দুতে (A বিন্দু কোণ ও ক্ল্যাডের সংযোগকারী বক্রতলে অবস্থিত) আপতিত হয় ও অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে। তারপর অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলিত রশ্মি AC পথ ধরে এগোয়। এখানে আমাদের $\angle i$ কোণের সর্বোচ্চ মান বার করতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত এইভাবে আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ঘটবে।

আমরা স্নেলস সূত্র থেকে পাই

$$\frac{\sin i}{\sin \theta} = \frac{n_1}{n_0}$$

আবার যেহেতু A বিন্দুতে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ঘটছে তাই লেখা যায়।

$\sin \phi > \frac{n_2}{n_1} < \phi$ অর্থাৎ এর সর্বনিম্ন মান $\sin^{-1}\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$ বা ϕ এর মান $\sin^{-1}\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$ এর বেশী হলে আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ঘটবে এবং ϕ $\sin^{-1}\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$ কম হলে A বিন্দুতে প্রতিসরণ ঘটবে।

অতএব A বিন্দুতে আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ঘটতে গেলে $\text{Cos}\ \theta > \frac{n_2}{n_1}$, যেহেতু Cos θ, Δ OAD ত্রিভুজ থেকে পাওয়া যায়।

$$\text{বা, } \text{Sin}\theta < \left[1 - \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}$$

$$\text{বা, } \text{Sin i} < \frac{n_1}{n_0}\left[1 - \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}} \quad \text{1 নং সমীকরণ থেকে}$$

$$\text{বা, } \text{Sin i} < \left(\frac{n_1^2 - n_2^2}{n_0^2}\right)^{\frac{1}{2}}$$

এখানে n_0 বায়ুর প্রতিসরাংক ধরা হয়। অর্থাৎ যদি তন্তুর বাইরে বায়ু বা ফাঁকা স্থান বর্তমান তাহলে $n_0 = 1$, হবে।

অর্থাৎ $\sin i < \left(n_1^2 - n_2^2\right)^{1/2}$

বা $i < \sin^{-1}\left(n_1^2 - n_2^2\right)^{1/2}$ বা,

$< i$ কোণের সর্বোচ্চ মান $\sin^{-1}\left(n_1^2 - n_2^2\right)^{1/2}$

অর্থাৎ আলোক রশ্মি যদি আলোকীয় তন্তুর অক্ষরেখাকে ঘিরে তন্তুর প্রবেশ মুখে $\angle 2L$ ঘন কোণের (solid angle) মধ্যে আপতিত হয় তাহলেই কেবল ওই রশ্মিগুলি অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ঘটিয়ে তন্তুর কোর মাধ্যম ধরে বহির্মুখের দিকে এগিয়ে যাবে। ওই ঘনকোণের বাইরে পড়লে তা হবে না।

এখন $\text{Sin } i_m \left(n_1^2 - n_2^2\right)^{1/2}$

[যেখানে i_m হল $\angle i \sin i_m$ কোণের ঐ সর্বোচ্চ মান]

$\sin i_m$ কে বলা হয় নিউম্যারিক্যাল অ্যাপারচার (Numerical aperture)।

একটি আলোক তন্তুর $n_1 = 1.472$, $n_2 = 1.458$, 3, $n_0 = 1$ হলে নিউম্যারিক্যাল অ্যাপারচার হবে 0.2 এর মত প্রায়। আর $\angle i_m$ বা সর্বোচ্চ আপাতন কোণ হবে 11.5° এবং $\angle 2i_m = 23^\circ$ । অর্থাৎ 23° ঘন কোণের মধ্যে পড়লে আলোক অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ঘটিয়ে তন্তুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবে।

12.7 সারাংশ

আলোচ্য অধ্যায়টি পাঠ করে আপনারা জেনেছেন আলোকীয় তন্তু কি এবং তার গঠন কিরকম। আলোকীয় তন্তুর প্রকার ভেদ জানার সাথে সাথে ওই তন্তুর ব্যবহারিক সুযোগ সম্পর্কে আপনাদের ধারণা হয়েছে। মূলত, যোগাযোগ বিজ্ঞান আর তা ছাড়া অন্যান্য বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে আলোকীয় তন্তুর ব্যবহার সম্পর্কে আপনারা জেনেছেন। আলোকীয় তন্তুকে ব্যবহার করে একটি আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা কিভাবে কাজ করে সেটি জানা গেছে। স্টেপ ইনডেক্স আলোকীয় তন্তুর নিউম্যারিক্যাল অ্যাপারচার হিসাব করতে শেখা গেছে।

12.8 প্রশ্নাবলি

বড় প্রশ্ন (Long Question)

(1) আলোকীয় তন্তুর ব্যবহার কোথায় এবং কেন এই তন্তু যোগাযোগে একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম?

(2) বিভিন্ন ধরনের আলোর তন্তুর গঠন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা কর।

(3) 'স্টেপ ইনডেক্স' ও 'গ্রেডেড ইনডেক্স' আলোক তন্তুতে কিভাবে আলোক রশ্মি প্রবাহিত হয় তা বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Question)

(4) স্কিউ রশ্মি (Skew rays) কি?

(5) নিউম্যারিক্যাল আলোচনা কাকে বলে?

(6) যোগাযোগ ছাড়া আর কোথায় আলোকীয় তন্তুকে ব্যবহার করা হয়?

(7) আলোকীয় তন্তু কাকে বলে?

(8) একটি আলোকীয় তন্তুর কোরের প্রতিসরাংক 1.453 ও ক্লাডের প্রতিসরাংক 1.432 হলে তন্তুটির নিউম্যারিক্যাল অ্যাপারচার কত হবে?

(9) একটি আলোক তন্তুর কোর ও ক্লাডের প্রতিসরাংক যথাক্রমে 1.431 এবং 1.420 হলে, এই তন্তু কত ঘন কোণের আলো তার মধ্যে প্রবাহের জন্য গ্রহণ করবে?

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Objective Question)

(10) তন্তুর কোর ও ক্লাডের সংযোগকারী বক্রতল থেকে তন্তুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত আলোক রশ্মির কি ধরনের প্রতিফলন হয়?

(11) এল.ই.ডি. (L.E.D.) আলোক তন্তুকে কি কাজে ব্যবহৃত হয়?

(12) কোন আলোক তন্তুর কোণ মাধ্যমে অনেক প্রতিসরাংকের মাধ্যম দেখা যায়?

(13) একটি আলোক তন্তুকে চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে পাঠানো হল। তার মধ্যকার প্রবাহিত আলো ওই চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত হবে কি?

(14) একমোড বিশিষ্ট আলোকীয় তন্তু কোন ধরনের যোগাযোগে বিশেষ ভাবে কাজে লাগে?

12.9 কিছু বই-এর নাম

(1) 'Optical Electronics' by Ajoy Ghatak and K. Thyagrajan, Cambridge University Press, 1993.

(2) 'Fibre Optics' by Ajoy Ghatak.

(3) Optoelectronics an Introduction' by J. Wilson and J.F.B. Hawkes, Prentice/Hall of India Private Limited 1996.

(4) 'Optical Fibre Communication, Principles and Practice' by John M. Senior, Prentice, Hall of India Private Limited, 1996.

(5) 'Semi Conductor Optoelectronic Devices', by Pallab Bhattacharya Prentice, Hall of India Private Limited, 1995.

(6) 'Optoelectronics and Fibre Optics Communication' by C. K. Sarkar and D. C. Sarkar, New Age International Publishers, 2001.

গঠন

13.1 প্রস্তাবনা
উদ্দেশ্য

13.2 তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

13.3 তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণের বিক্ষেপণের তাৎপর্য
বিক্ষেপণ সংশ্লিষ্ট কয়েকটি পরিঘটনা

13.4 ব্রিলোয়াঁ, র‍্যালে ও মেঙ্গ বিক্ষেপণ

13.4.1 ব্রিলোয়াঁ বিক্ষেপণ

13.4.2 র‍্যালে বিক্ষেপণ ও মেঙ্গ বিক্ষেপণ

13.5 আলোর বিচ্ছুরণ

13.6 কৌণিক বিচ্ছুরণ ও বিচ্ছুরণ-এর তাৎপর্য

13.7 প্রত্যাশিত বিচ্ছুরণ

13.8 ব্যতিক্রান্ত বিচ্ছুরণ

13.9 সারাংশ

13.10 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

13.11 উত্তরমালা

13.1 প্রস্তাবনা

আলোক সংক্রান্ত অনেকগুলি পরিঘটনার সঙ্গে আমরা এই পর্যায়ের বিভিন্ন এককে পরিচিত হয়েছি। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে কতগুলি পরিঘটনা আমরা অতি অনায়াসেই প্রত্যক্ষ করতে পারি কিন্তু বাকি কতকগুলির ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের যান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। দর্পণে প্রতিফলণের মাধ্যমে যে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয় কিংবা উত্তল লেন্সের যে বিশেষ ধর্মের জন্য তাকে বিবর্ধক কাঁচ হিসেবে ব্যবহার করা যায়, সেই পরিঘটনাগুলি আমাদের খুবই পরিচিত, কিন্তু ব্যতিচার ফ্রিঞ্জ সৃষ্টি তথা প্রত্যক্ষ করার জন্য যে বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন তা আমরা জানি।

এখন পর্যন্ত আমরা আলোক সংক্রান্ত দুটি পরিঘটনার কথা আলোচনা করিনি অথচ এই দুটি পরিঘটনাজনিত কিছু আকর্ষণীয় পর্যবেক্ষণের সঙ্গে অপনারা সকলেই পরিচিত। যেমন একটা প্রশ্ন প্রায়শই আমাদের সামনে রাখা হয় — 'আকাশের রং নীল কেন' এবং এক কথায় এর উত্তর হিসেবে বলা হয় সূর্যালোকের বিক্ষেপণের জন্যই আমরা আকাশের রং নীল দেখি। আবার আলোর বিক্ষেপণের সুযোগ না থাকায় চন্দ্রপৃষ্ঠে উপস্থিত কোনো পর্যবেক্ষকের কাছে আকাশ নীল নয় — ধূসর। অর্থাৎ আলোর বিক্ষেপণ এমন একটি পরিঘটনা যার ফলের সঙ্গে আমাদের অতি ঘনিষ্ঠ পরিচয় রয়েছে। এই এককে আমাদের অন্যতম আলোচ্য বিষয় — আলোর বিক্ষেপণ (Scattering of Light)।

বৃষ্টির পরে সময় সময় আকাশে যে চমৎকার সাত রঙের রামধনু দেখা যায় কিংবা কাঁচের প্রিজমের মধ্যে দিয়ে সূর্যের আলো চলে গেলে যে সাতটি রঙের হদিস পাওয়া যায় তার কারণ সম্ভবত আপনারা জানেন। সূর্যের আলো বা সাদা আলো যে আমাদের দৃশ্য আলো (visible light) সবকটি তরঙ্গদৈর্ঘ্য তথা বর্ণ দিয়ে গঠিত তা আমরা জানি। সাদা রং সেই অর্থে সাতটি রঙের সমষ্টি। যে বিশেষ পরিঘটনার ফলে সাদা আলো সাত রঙে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায় তাকে বলা হয় আলোর বিচ্ছুরণ (Dispersion of light) ।

এই এককে আমরা আলোর বিক্ষেপণ ও বিচ্ছুরণ বিষয়ে আলোচনা করব। বিক্ষেপণ ও বিচ্ছুরণের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে আপাতদৃষ্টিতে এই দুটি অতি পরিচিত ঘটনার মধ্যে দিয়ে আলোক তরঙ্গের অনেকগুলি বিশেষ ধর্ম উন্মোচিত হচ্ছে। প্রসঙ্গত বলা দরকার আমরা যে আলো চোখে দেখতে পাই তা অর্থাৎ দৃশ্য আলো প্রকৃতপক্ষে সুবৃহৎ তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণ পরিবারের একটি ক্ষুদ্র সদস্য। তাই আলোর বিক্ষেপণ বা বিচ্ছুরণ বলতে সাধারণভাবে তড়িচ্চুম্বকীয় রশ্মির বিক্ষেপণ বা বিচ্ছুরণকে বোঝানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে এটাও উল্লেখ করা দরকার যে বিক্ষেপণ বা বিচ্ছুরণের সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি কিন্তু আমাদের খালি চোখে ধরা দেয় না — সেখানেও প্রয়োজন হয় বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র-ব্যবস্থা। এই এককে আমরা প্রথমে আলোর বিক্ষেপণ ও পরে আলোর

বিচ্ছুরণ নিয়ে আলোচনা করব।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি

- তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণ পরিবারটির সঙ্গে পরিচিত হবেন।
- আলোর বিক্ষেপণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পারবেন ও তার বৈশিষ্ট্যসমূহ জানতে পারবেন।
- আলোর বিক্ষেপণের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে অবগত হবেন।
- আলোর বিচ্ছুরণ ও তার শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- আলোর বিক্ষেপণ ও বিচ্ছুরণজনিত কারণে যে সব প্রাকৃতিক ঘটনার সঙ্গে আপনি পরিচিত, তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

13.2 তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণ (Electromagnetic radiation)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

চোখ খুললে চারদিকের অজস্র অসংখ্য জিনিস তথা ঘটনাবলী যে আমরা দেখতে পাই তার জন্য আমাদের চোখ এবং আলো উভয়েরই অনন্য ভূমিকা রয়েছে। একদিকে যেমন চোখ বন্ধ রাখলে কোনো কিছু দেখা সম্ভব নয়, তেমনই অন্যদিকে অন্ধকারে চোখ খোলা রাখলেও কিছু দেখা যায় না। কোনো বস্তু থেকে আলো এসে আমাদের চোখে প্রবেশ করলে আমরা বস্তুটিকে দেখতে পাই।

আমরা সাধারণত আলো বলতে যা বোঝাই, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে বলা হয় দৃশ্য-আলো (visible light)। প্রকৃতপক্ষে এই আলো তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণ (electromagnetic radiation)। পরিবারের একটি ছোট অংশ দখল করে রয়েছে। তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণ পরিবারটি সুবৃহৎ। সেখানে অত্যন্ত ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সময় রশ্মি (gamma radiation) যেমন রয়েছে, রয়েছে দৃশ্য-আলো, রয়েছে অবলোহিত রশ্মি (infrared radiation) মাইক্রোতরঙ্গ (microwaves) বা সুবৃহৎ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট রেডিও তরঙ্গ ও মিটার তরঙ্গ। এই শ্রেণীভুক্ত সমস্ত অঞ্চলের বিকিরণের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন ওই বিকিরণের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ যাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মোটামুটিভাবে 400 cm বা 4000A^{o} (400×10^{-9} m বা 4000×10^{-8} cm) থেকে 800 cm বা 8000Å (800×10^{-9} m বা 8000×10^{-8} cm) আমাদের চোখে ধরা দেয় তার বাইরের বিকিরণকে ধরার জন্য অন্য যান্ত্রিক ব্যবস্থা বা বিশেষ ধরনের ফটোগ্রাফিক প্লেট প্রয়োজন হয়।

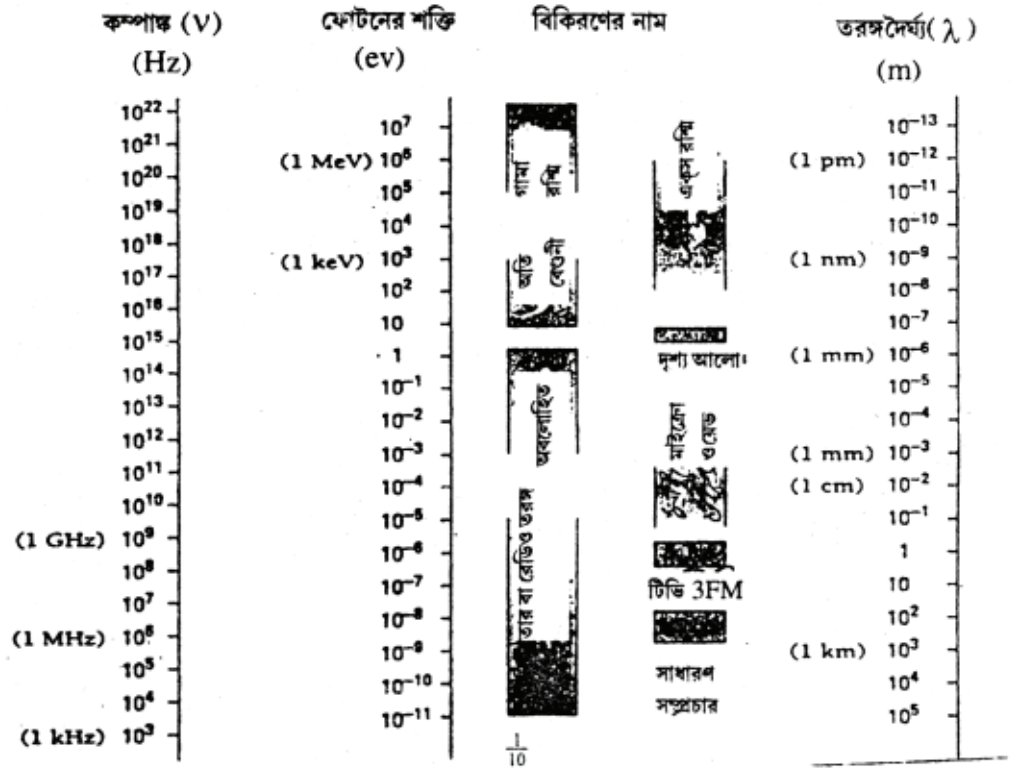

চিত্র 13.1 তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণের বিভিন্ন অংশ

[ওপরের এই **13.1** নং চিত্রে সমগ্র তড়িচ্চুম্বকীয় পরিবারের চেহারাটি তুলে ধরা হয়েছে।]

খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে যে এত ভিন্ন ধরনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বিকিরণকে কেবল এক পরিবারভুক্ত বলা হচ্ছে কেন? তাছাড়া বিভিন্ন অংশের বিকিরণের নিজস্ব কিছু ধর্ম রয়েছে যা অন্য অংশের বিকিরণের মধ্যে পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, এত কিছু সত্ত্বেও এরা সকলেই এক শ্রেণীভুক্ত মূলতঃ কয়েকটি কারণে। এগুলি হল;

(i) সমস্ত রকমের তড়িচ্চুম্বকীয় রশ্মি প্রকৃতপক্ষে দুটি পরস্পর লম্ব ও পরিবর্তনশীল তড়িৎ ও চুম্বক ক্ষেত্রের দ্বারা সৃষ্ট তরঙ্গ।

(ii) শূন্য মাধ্যমে এই শ্রেণীভুক্ত সমস্ত রশ্মিরই গতিবেগ সমান। এই গতিবেগ সেকেন্ডে 2.99792458×10^8 m/s। আমরা প্রায়ই এর আসন্ন মান 3×10^8 m/s বা 3×10^5 km/s বা সেকেন্ডে তিন কিলোমিটার ধরে নিয়ে কাজ করি।

(iii) আলোক বিষয়ক অতি পরিচিত পরিঘটনাগুলি যেমন প্রতিফলন, প্রতিসরণ, ব্যববর্তন, ব্যতিচার, সমবর্তন বা বিক্ষেপণ ও বিচ্ছুরণ সমস্ত রকম তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণের ক্ষেত্রেই সম্ভব। তবে বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভর করে এই পরিঘটনাগুলির পর্যবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র ব্যবস্থার প্রয়োজন। অর্থাৎ দৃশ্য আলোর জন্য যে তল প্রতিফলক হিসেবে কাজ করে সেই তল ধরা যাক এক্সরশ্মির প্রতিফলনে উপযুক্ত না-ও হতে পারে।

(iv) সব রকম তড়িচ্চুম্বকীয় রশ্মির ক্ষেত্রে $c = \nu\lambda$ সম্পর্কটি প্রয়োগ করা যায়। এখানে ν রশ্মিটির কম্পাঙ্ক, λ কোনো মাধ্যমে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এবং c ওই মাধ্যমে রশ্মিটির গতিবেগ। খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের চোখ, আরও বহু যন্ত্রের মতই সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন একটি যন্ত্র। তাই চোখে তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ পরিবারের এক অতি ক্ষুদ্র অংশই ধরা দেয়। যদি আমাদেব সামনে রাখা একটি বস্তুর ওপর কেবলমাত্র অতি বেগুনী রশ্মি আপতিত হয় আমরা কিন্তু বস্তুটিকে খালি চোখে দেখতে পাব না। জায়গাটি সম্পূর্ণ অন্ধকার বলেই মনে হবে। অবশ্য বিশেষ যন্ত্র ব্যবস্থার সাহায্যে অতিবেগুনী রশ্মিতে আলোকিত ঐ বস্তুর ছবি তোলা সম্ভব এবং আমরা তখন দৃশ্য আলোতে ঐ ছবি দেখতে পাব। এই পদ্ধতিতে পরোক্ষভাবে আমরা আমাদের দৃষ্টির অগোচর তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণের অস্তিত্ব ও তার প্রভাব ধরতে পারি। এক্স রশ্মি দ্বারা চিকিৎসাকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় যে সব ছবি তোলা হয় তা আমাদের দৃশ্য আলোর পক্ষে সম্ভবপর নয়, একথা আমরা সকলেই জানি।

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে আমরা যখন আলোক বিষয়ক কোনো পরিঘটনার কথা উল্লেখ করি তখন আমরা আলো বলতে দৃশ্যআলোই বুঝিয়ে থাকি। বর্তমান পর্যায়ে আমাদের আলোর বিক্ষেপণ ও বিচ্ছুরণ বিষয়ক যে আলোচনা হবে তা হবে ওই দৃশ্য আলোকে কেন্দ্র করে।

ক্ষুদ্রতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণের ক্ষেত্রে যে বিশেষ ধরনের বিক্ষেপণ দেখা যায়, যেমন এক্স রশ্মির ক্ষেত্রে অতি পরিচিত কম্পটন বিক্ষেপণ (Compton Scattering) কিংবা রামন বিক্ষেপণ বা রামন ক্রিয়া (Raman Scattering বা Raman effect) আমাদের এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না। বস্তুত, বিক্ষেপণের বিষয়টি যথেষ্ট বৃহৎ। আমরা বিক্ষেপণ বা বিচ্ছুরণ বিষয়ে এখানে যে আলোচনা করব সেখানে সমস্ত রকমের তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণ অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না। তবে বিক্ষেপণ ও বিচ্ছুরণ বিষয়ক বর্তমান এককের আলোচনা আপনাকে বিষয় দুটি সম্পর্কে অবশ্যই কিছু প্রাথমিক ধারণা পেতে সাহায্য করবে। এই অনুচ্ছেদের আলোচনার ওপর ভিত্তি করে নিচের অনুশীলনীটি আপনি চেষ্টা করুন।

অনুশীলনী 1 : তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণে উপস্থিত বিভিন্ন ধরনের বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং কম্পাঙ্কের পাল্লা উল্লেখ করে তাদের নামগুলি দিয়ে একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

13.3 তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণের বিক্ষেপণ (Scattering)-এর তাৎপর্য

প্রথমে আমরা দেখি তড়িচ্চুম্বকীয় রশ্মির বিক্ষেপণ বলতে কী বোঝায়। কঠিন তরল বা গ্যাসীয় কোনো মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে যখন তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণ গমন করে তখন সেই বিকিরণের শক্তির অংশবিশেষ বহুক্ষেত্রেই মাধ্যমের উপাদানের অণুতে স্থানান্তরিত হয়। এই শক্তি অবশ্য মাধ্যম ধরে রাখে না তা আবার নিঃসারিত হয়। এই পুনঃনিঃসারিত বিকিরণের অভিমুখ, দশা বা তরঙ্গদৈর্ঘ্য কিন্তু মূল বিকিরণের থেকে ভিন্ন হয় এবং পরিঘটনাটিকে তড়িচ্চুম্বকীয় রশ্মির বিক্ষেপণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

আপনারা জানেন যে তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণের পরিবারটি যথেষ্ট বড়। এখানে যেমন একদিকে রয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং অতি উচ্চ কম্পাঙ্ক তথা অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট গামা-রশ্মি অন্যদিকে রয়েছে তুলনায় অনেক কম কম্পাঙ্ক এবং বৃহৎ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গ। দৃশ্য আলোক অর্থাৎ যে আলোতে আমাদের চোখ দেখতে পায় তার অবস্থান এই পরিবারের মাঝের অঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র অংশ জুড়ে। তড়িচ্চুম্বকীয় রশ্মির এই দৃশ্যমান আলোর বিক্ষেপণের ফলে যে ঘটনাগুলো আমরা দেখতে পাই তার মধ্যে রয়েছে আকাশের নীল রং, রক্তিম সূর্যাস্ত বা সাদা মেঘ অন্যতম। এগুলির যে বিশেষ বর্ণ আমরা দেখতে অভ্যস্ত তার মূলে রয়েছে আলোর বিক্ষেপণ।

তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণের বিভিন্ন অংশ যখন কোনো কঠিন তরল বা গ্যাসীয় মাধ্যমে আপতিত হয় তখন ওই মাধ্যমের উপাদানের অণুর সঙ্গে যে মিথস্ক্রিয়া (interaction) হয় সমস্ত রকম বিক্ষেপণের মূলে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

কোনো তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণ কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় ওই মাধ্যমের অণুগুলির দ্বারা বিক্ষেপিত হয়। উচ্চ শক্তিসম্পন্ন তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণ যেমন গামা রশ্মি বা এক্স রশ্মির ক্ষেত্রে বিকিরণকে কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী সহজেই কণিকাগুচ্ছ বলে ধরে নেওয়া যায়। এই বিকিরণ যখন কোনো মাধ্যমের অণুর ওপর আপতিত হয় তখন মাধ্যমের অণুর সঙ্গে ফোটন কণার সংঘর্ষ ঘটে। এই ঘটনাকে সহজেই ফোটন বিক্ষেপণ (photon scattering) বলে উল্লেখ করা যায়। উচ্চশক্তি তথা উচ্চ কম্পাঙ্ক ও ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট এই বিকিরণের বিক্ষেপণের কতগুলি ব্যবহারিক প্রয়োগ রয়েছে। যেমন এক্সরশ্মির ক্ষেত্রে ফোটন বিক্ষেপণের মধ্যে দিয়ে কেলাসের গঠন নির্ণয় করা সম্ভব। এক্স রশ্মির বিক্ষেপণের ফলে যে কম্পটন ক্রিয়া দেখা যায় তার ব্যাখ্যাও এখান থেকে দেওয়া সম্ভব।

অপেক্ষাকৃত কম শক্তি বিশিষ্ট বিকিরণে যেমন আমাদের পরিচিত দৃশ্য আলোর ক্ষেত্রে বায়ুতে ভাসমান ধূলিকণা তথা বাতাসের বিভিন্ন গ্যাসের অণুদের দ্বারা বিক্ষেপণ ঘটে। সূর্যরশ্মি এভাবেই বায়ুমণ্ডলে বিক্ষেপিত হয়

এবং এর ফলে আকাশের রং নীল দেখায়। চাঁদে বায়ুমণ্ডল না থাকায় সূর্যরশ্মি সেখানে বিক্ষেপণের সুযোগ পায় না এবং এর ফলে চন্দ্রপৃষ্ঠে উপস্থিত কোনো দর্শকের কাছে চাঁদের আকাশ নীল নয়। ধূসর মনে হয়।

আমরা এই এককে কেবল বিক্ষেপণের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। কিন্তু কোনো মাধ্যমের অণু কর্তৃক আলোর শোষণ ও তার পুনঃ নিঃসারণের ফলে কেবল বিক্ষেপণ নয়, আরও কয়েকটি পরিঘটনা লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটির জন্যই আলো এবং মাধ্যমের অণুর মিথস্ক্রিয়া দায়ী। আমরা এখানে ঐ মিথস্ক্রিয়াজনিত এমন কয়েকটি পরিঘটনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবো যেগুলি বিক্ষেপণ না হলেও তার নিকটাত্মীয় বলা যায়।

13.3.1 বিক্ষেপণ সংশ্লিষ্ট কয়েকটি পরিঘটনা

বিক্ষেপণের বেশ কয়েকটি শ্রেণী বিভাগ করা সম্ভব। সেই আলোচনায় আমরা পরে যাবো। তার আগে কয়েকটি পরিঘটনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার যেগুলি বিক্ষেপণের খুবই কাছাকাছি হলেও প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন।

বিক্ষেপণের সময় মাধ্যমের অণুর ওপর আপতিত বিকিরণের থেকে অণুটি প্রথমে শক্তি গ্রহণ করে। এরপর অণুটি সেই শক্তি পুনঃনিঃসারিত করে তার অবমশক্তির অবস্থায় (ground state) ফিরে আসে। বস্তুত, অণুর এই শক্তির গ্রহণ করে উত্তেজিত অবস্থায় (excited state) গমন এবং শক্তি পুনঃনিঃসারণের মাধ্যমে অবমশক্তির অবস্থায় প্রত্যাবর্তনের মধ্যে সময়ের পার্থক্যটুকুর ওপর নির্ভর করে বিক্ষেপণ ছাড়া অন্য কয়েকটি পরিঘটনা লক্ষ্য করা যায়, যাদের প্রতিটিই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে অপরের থেকে ভিন্ন।

যেমন বিকিরণের শোষণ ও পুনঃনিঃসারণের মধ্যে যদি পরিমাপযোগ্য সময়ের পার্থক্য না থাকে অর্থাৎ পরিঘটনাটিকে যদি তাৎক্ষণিক (instanteneous) বলা যায় তাহলে তাকে বিশুদ্ধ বিক্ষেপণ বলা হয়। এই এককে আমাদের আলোচ্য বিষয় এই শ্রেণীভুক্ত পরিঘটনা। মনে রাখতে হবে যান্ত্রিক ব্যবস্থার সাহায্যে মাইক্রোসেকেন্ড (10^{-6} সেকেন্ড) পর্যায়ের থেকেও অনেক ছোট সময় পার্থক্য পরিমাপ করা সম্ভব এবং যদি সেই পরিমাপের সুযোগও না পাওয়া যায় তাহলে পরিঘটনাটি বিক্ষেপণ হিসেবে স্বীকৃত হয়, কারণ ধরে নেওয়া হয় যে বিকিরণের শোষণ ও পুনঃনিঃসারণ হয়েছে তাৎক্ষণিক।

আবার যদি বিকিরণের শোষণ ও পুনঃনিঃসারণের মধ্যে 1 মাইক্রোসেকেন্ডের (1 μs) থেকে কম অথচ পরিমাপযোগ্য সময় থাকে তাহলে পরিঘটনাটির বৈশিষ্ট্যসমূহ বিক্ষেপণ থেকে ভিন্ন হয় এবং তাকে সচরাচর আলোক সংদীপ্তি (photo luminescence) বা সংদীপ্তি (luminescence) বলা হয়।

যখন বিকিরণের শোষণ ও পুনঃনিঃসারণের মধ্যেকার সময়ের পার্থক্য বেড়ে এক মাইক্রোসেকেন্ড অর্থাৎ 10^{-6} সেকেন্ড বা তার কিছু বেশি হয় তখন আরেকটি ভিন্ন পরিঘটনা ধরা দেয়। এই পরিঘটনাটির বৈশিষ্ট্যসমূহ

আগেরটির থেকে কিছুটা ভিন্ন এবং একে বলা হয় প্রতিপ্রভা (fluorescence)। আর বিকিরণের শোষণ ও পুনঃনিঃসারণের মধ্যে সময়ের পার্থক্য যদি কয়েক সেকেন্ড বা সেকেন্ড ক্রমের (of the order of a second) হয় তাহলে যে পরিঘটনাটি পাওয়া যায় তাকে বলা হয় অনুপ্রভা (phosphorescence)। দেখুন বিকিরণের শোষণ ও পুনঃনিঃসারণের মধ্যেকার সময়ের পার্থক্য সামান্য পরিবর্তিত হলেও কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসহ নানা ধরনের পরিঘটনা লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এই এককে আমাদের আলোচনা কেবল বিক্ষেপণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বিকিরণের শোষণ ও পুনঃনিঃসারণের মধ্যে পরিমাপযোগ্য সময়ের ব্যবধান না থাকলে ঘটনাটিকে বিক্ষেপণ বলা হয়। এই ঘটনার মধ্যেও দুটি শ্রেণীবিভাগ থাকে। যেমন বিকিরণের সঙ্গে মাধ্যমের অণুর সংঘর্ষ স্থিতিস্থাপক (elastic) বা অস্থিতিস্থাপক (inelastic) দু-রকমই হতে পারে। স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষের ফলে আপতিত বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কোনো পরিবর্তন বা তরঙ্গ-সরণ (wavelength shift) হয় না কেবল তরঙ্গের দশার (phase) পরিবর্তন ঘটে। বিকিরণ ও অণুর সঙ্গে অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষের ফলে অবশ্য তরঙ্গ সরণ ঘটে থাকে। ভারতীয় পদার্থবিদ স্যার সি. ভি. রামন তাঁর যে আবিষ্কারের জন্য ১৯৩০ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন তা কোনো মাধ্যমের অণুর দ্বারা ঘটে যাওয়া এক বিশেষ ধরনের অস্থিতিস্থাপক বিক্ষেপণ (inelastic scattering)। এখন এই পরিঘটনাটি আবিষ্কারকের নামানুসারে রামন ক্রিয়া (Raman effect) বলা হয়। এই ধরনের অস্থিতিস্থাপক বিক্ষেপণের ফলে অবশ্য বিক্ষেপিত বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য আপতিত বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য থেকে ভিন্ন হয় এবং একটি তরঙ্গসরণ (wavelength shift) লক্ষ্য করা যায়।

আমাদের বর্তমান আলোচনায় রামন ক্রিয়া অন্তর্গত হচ্ছে না। আমরা অন্যদুটি গুরুত্বপূর্ণ অস্থিতিস্থাপক বিক্ষেপণ বিষয়ে আলোচনা করব। সেই আলোচনায় যাওয়ার আগে আপনি বরং এই অনুশীলনীটি চেষ্টা করুন।

অনুশীলনী - 2 : মাধ্যমের অণু কর্তৃক আপতিত বিকিরণের শোষণ ও পুনঃনিঃসারণের মধ্যে সময়ের পার্থক্যের ওপর নির্ভর করে কী কী পরিঘটনার সৃষ্টি হতে পারে?

13.4 ব্রিলোয়াঁ (Brillouin), র‍্যালে (Rayleigh) ও মেঈ (Mie) বিক্ষেপণ

তরল এবং গ্যাসের মধ্যে দুটি শ্রেণীর বিক্ষেপণের ঘটনা তুলনায় অনেক বেশি লাভ করা যায়। দুটিই অস্থিতিস্থাপক বিক্ষেপণ এবং এই বিক্ষেপণের মধ্যে দিয়ে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সরণ ঘটে থাকে। এদের প্রথমটি তার আবিষ্কারকের নামানুসারে ব্রিলোয়াঁ (Brillouin) বিক্ষেপণ নামে পরিচিত এবং বিষয়টিতে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। দ্বিতীয় বিক্ষেপণটির আবিষ্কর্তা লর্ড র‍্যালে (Lord Rayleigh) এবং র‍্যালে বিক্ষেপণ (Rayleigh Scattering) নামে পরিচিত এই পরিঘটনার ফলে আমরা আকাশের রং নীল দেখতে পাই। সকাল ও সন্ধ্যার আকাশের লাল

রংয়ের জন্য এই বিক্ষেপণ দায়ী। এই বিক্ষেপণটির বিষয়ে কিছুটা বিস্তৃত আলোচনা আমরা করব। মেঙ্গ বিক্ষেপণ প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক উল্লেখ থাকবে।

13.4.1 ব্রিলোয়াঁ বিক্ষেপণ (Brillouin Scattering) ঃ

আমরা জানি যে কোনো মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে যখন কোনো শব্দতরঙ্গ প্রবাহিত হয় তখন মাধ্যমটিতে ঘনীভবন (compression) ও তনুভবন (rarefaction) লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে মাধ্যমটিতে পর্যায়ক্রমে উচ্চতর ঘনত্বের অঞ্চল ও লঘুতর ঘনত্বের অঞ্চল সৃষ্টি হয়। কোনো শব্দতরঙ্গ এই পরিবর্তনশীল ঘনত্বের মধ্যে বিক্ষেপিত হয় এবং তার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সামান্য পরিবর্তন ঘটে থাকে পরিভাষায় বলা হয় তরঙ্গদৈর্ঘ্য সরণ। পরপর দুটি ঘনীভবনীকৃত বা তনুভবনীকৃত অঞ্চলের মধ্যে এক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পার্থক্য পাওয়া যায়।

আলো বা তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণের ক্ষেত্রে এই ব্রিলোয়াঁ বিক্ষেপণ ঘটে থাকে যখন আপতিত বিকিরণ যে মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সেই মাধ্যমের আলোক উৎসের সাপেক্ষে একটি গতি থাকে। ঘটনাটিকে আলোকের ক্ষেত্রে এক ধরনের ডপলার ক্রিয়ার (Optical Doppler effect) মত বলা যায়। উৎসের সাপেক্ষে মাধ্যমের গতিবেগের অভিমুখের ওপর নির্ভর করে এই বিক্ষেপণের ফলে প্রাপ্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্য সরণ ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হয়। অর্থাৎ এই বিক্ষেপণের ফলে প্রাপ্ত বিক্ষেপিত বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য আপতিত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের থেকে কিছু বেশি বা কিছু কম হতে পারে।

লক্ষ্য করা দরকার যে ডপলার ক্রিয়া আলো বা শব্দের ক্ষেত্রে উৎস এবং শ্রোতা বা দর্শকের আপেক্ষিক গতির জন্য ঘটে থাকে। মাধ্যমের গতিবেগের ঐ তরঙ্গদৈর্ঘ্য বা কম্পাঙ্ক পরিবর্তনে কোনো ভূমিকা নেই এবং মনে রাখতে হবে যে তড়িচ্চুম্বকীয় বা আলোক তরঙ্গ কোনো মাধ্যম ছাড়াই উৎস থেকে দর্শকের দিকে গমন করতে পারে। তাই ব্রিলোয়াঁ বিক্ষেপণ আলোকীয় ডপলার ক্রিয়া থেকে ভিন্ন। কারণ এখানে মাধ্যমের গতির জন্য এই তরঙ্গদৈর্ঘ্য সরণের ঘটনাটি ঘটে। ডপলার ক্রিয়া সম্পর্কে বিশদ জানতে হলে EPHO3-র দ্বিতীয় পর্যায় (Block 1, 2) দেখুন।

প্রাকৃতিক ঘটনার দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্য র‍্যালে বিক্ষেপণ ব্রিলোয়াঁ বিক্ষেপণের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

13.4.2 র‍্যালে বিক্ষেপণ (Rayleigh Scattering) ও মেঈ বিক্ষেপণ (Mie Scattering) :

আমরা দেখলাম যে মাধ্যমের ঘনত্বের ওঠা-নামার (fluctuations) ফলে ব্রিলোয়াঁ বিক্ষেপণ ঘটে। অন্যদিকে র‍্যালে বিক্ষেপণের জন্য দায়ী মাধ্যমের তাপমাত্রা বা এনট্রপির (entropy) ওঠা-নামা। কোনো মাধ্যমে অসমসত্ত্বতা (inhomogenity) ও অন্যান্য কারণে বিভিন্ন অংশের তাপমাত্রা ও এনট্রপি ভিন্ন হয়। তবে মাধ্যমের অংশে চাপ ভিন্ন হওয়ার ফলে মাধ্যমে যে শব্দতরঙ্গ প্রসারের সুযোগ থাকে, এনট্রপির তারতম্য কিন্তু সাধারণত সেরকম কোনো

তরঙ্গের সৃষ্টি করে না। তাই ব্রিলোয়াঁ বিক্ষেপণের মত অত্যন্ত সুস্পষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যে সরণ র‍্যালে বিক্ষেপণে ঘটে না। বরং এখানে বিক্ষেপিত তরঙ্গে আপতিত তরঙ্গের দুপাশে বিস্তৃত তরঙ্গটি পাওয়া যায়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের যেন সরণ ঘটে না, ঘটে তার বিস্তার (broadening of wavelength)।

এনট্রপি বা তাপমাত্রার তারতম্যের জন্য যে র‍্যালে বিক্ষেপণ ঘটে তা কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে খুব ভালো ধরা যায় না। কারণ কঠিন পদার্থের মধ্যে আলোর বিক্ষেপণের জন্য কঠিনের ত্রুটি (defects) অর্থাৎ তার গঠনের যেখানে ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়েছে সেরকম অঞ্চল এবং তার মধ্যে উপস্থিত অবিশুদ্ধি (impurity) অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই র‍্যালে বিক্ষেপণজনিত প্রভাব বা ফল প্রবাহী অর্থাৎ তরল বা গ্যাসের ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়।

1871 সালে লর্ড র‍্যালে তাঁর বিক্ষেপণ সংক্রান্ত বিশ্লেষণে ধরে নেন যে গ্যাসীয় বা তরল মাধ্যমে আলোর বিক্ষেপণ যে ধরনের অণুর সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার ফলে ঘটে থাকে সেই অণুর আকার আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তুলনায় অনেক কম। বস্তুত, র‍্যালে ধরে নিয়েছিলেন মাধ্যমের যে অণুগুলি বিক্ষেপণের জন্য দায়ী তাদের আকার আপতিত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এক দশমাংশ বা তারও কম ($< \frac{1}{10}\lambda$)। দৃশ্য আলো থেকে ক্ষুদ্রতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো যেমন অতিবেগুনী বা এক্স রশ্মির ক্ষেত্রে মাধ্যমের অণুর আকারের সঙ্গে আপতিত বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এই সম্পর্ক বজায় না থাকায় সেক্ষেত্রে র‍্যালে বিকিরণ সম্ভব নয়।

লর্ড র‍্যালে তাঁর বিশ্লেষণে আরেকটি অনুমান (assumption) করেছিলেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে কোনো মাধ্যমের অণুগুলি প্রতিটিই স্বাধীন তথা বিচ্ছিন্ন। অর্থাৎ মাধ্যমের অণুগুলির যেন পরস্পরের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। দেখা গেছে র‍্যালের দুটি অনুমানই ক্ষেত্র বিশেষে খাটে না। বিশেষ করে দ্বিতীয়টিতে যথেষ্ট ত্রুটি রয়েছে। তবু তাঁর বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে আপতিত বিকিরণের তীব্রতা I_0 এবং θ কোণে বিক্ষেপিত বিকিরণের তীব্রতার $[I(\theta)]$ মধ্যে যে সম্পর্ক পাওয়া যায় তা বিক্ষেপণের বিষয়টিকে যথেষ্ট সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করে। র‍্যালে তাঁর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে যে সমীকরণটি দেন তা হল :

$$I(\theta) = I_0 \frac{\pi N v^2}{r^7 \lambda^4}(1+\cos^2\theta)(n-1)^2 \qquad \text{..........} (13.1)$$

I_0 ➜ আপতিত আলোর তীব্রতা

$I(\theta)$ ➜ θ কোণে বিক্ষেপিত আলোর তীব্রতা

N ➜ বিক্ষেপণে ব্যবহৃত কণার (বা অণুর) সংখ্যা

r ➜ বিক্ষেপণ বিন্দু থেকে দর্শকের দূরত্ব

n ➜ মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক

θ ➜ বিক্ষেপণ কোণ

v ➜ বিক্ষেপণের জন্য দায়ী কণার আয়তন

λ ➜ আপতিত বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য

নিচের চিত্রে [চিত্র 13.2] পরিঘটনাটি তুলে ধরা হয়েছে —

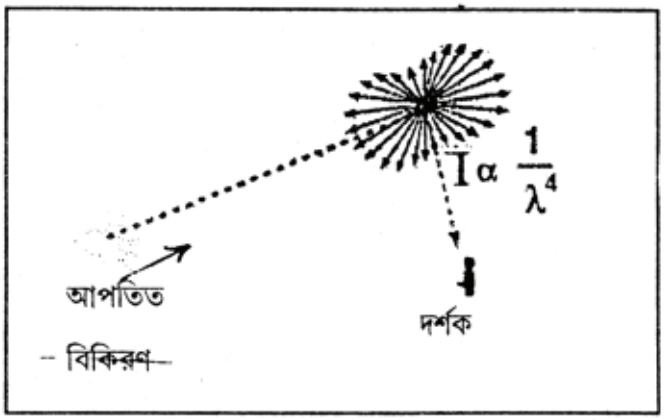

চিত্র 13.2 [র‍্যালে বিক্ষেপণে আপতিত বিকিরণ ও বিক্ষেপিত বিকিরণের অভিমুখ যখন $\theta = 90^o$। বিক্ষেপিত আলোর তীব্রতা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের চতুর্থ ঘাতের ব্যাস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়।]

(13.1) সমীকরণটিতে দেখা যাচ্ছে যে যে বিক্ষেপিত আলোর তীব্রতা আপতিত বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘের চতুর্থ ঘাতের (λ^4) সঙ্গে ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়। তাই একটি মাধ্যমে (n ধ্রুবক) একটি নির্দিষ্ট কোণে (θ স্থির) যখন আমরা বিক্ষেপিত আলোকে দেখি তখন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষেপিত আলোর তীব্রতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। কারণ —

$I \propto \frac{1}{\lambda^4}$ যখন অন্য বিষয়গুলি স্থির রয়েছে আমরা জানি যে দৃশ্য — আলোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হচ্ছে বেগুনী এবং নীল আলোর। তাই সূর্যালোকের এই অংশটি সবচেয়ে বেশি বিক্ষেপিত হয় এবং আমাদের চোখে যে বিক্ষেপিত আলো এসে পৌঁছায় সেখানে নীল অঞ্চলের আলোর তীব্রতা থাকে অনেক বেশী। তাই আকাশের রং নীল দেখায়। দেখানো যায় যে একইরকম তীব্রতা বিশিষ্ট আপতিত রশ্মির ক্ষেত্রে দৃশ্য বর্ণালীর (visible spectrum) নীল অঞ্চলের 400 nm. তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো তার লাল অঞ্চলের 740 nm আলোর তুলনায় প্রায় 9.4 গুণ তীব্রতা নিয়ে বিক্ষেপিত হয়।

সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় আপতিত আলো ভিন্ন কোণে বিক্ষেপিত হয় এবং তা বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘতর পথ অতিক্রম করে দর্শকের চোখে পৌঁছায়। এই সময় আলোর কেবল বিক্ষেপণ নয় বায়ুমণ্ডলে তার প্রতিসরণও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এগুলির সম্মিলিত প্রভাবে সকাল বা সন্ধ্যায় আকাশের রং ভিন্ন হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে যখন মাধ্যমের কণার আকার আপতিত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মতো কিংবা তার থেকে বড় হয়ে যায় তখন আরেকটি ভিন্ন ধরনের বিক্ষেপণ দেখা যায়। একে বলা হয় মেঈ বিক্ষেপণ (Mie Scattering) এবং এটি র‍্যালে বিক্ষেপণ থেকে ভিন্ন। বিজ্ঞানী মেঈ যে এই বৃহত্তর কণিকায় বিক্ষেপণের জন্য যে তত্ত্ব দেন সেখানে দেখা যায় যে এক্ষেত্রে আলোর দশা সরণ খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় এবং তা বেশি ঘটে থাকে। মেঈ বিক্ষেপণের ক্ষেত্রে বিক্ষেপিত আলো একটি বিশেষ দিকে অপেক্ষাকৃত বেশি মাত্রায় ছড়িয়ে পড়ে র‍্যালে বিকিরণের মতো একই θ-র জন্য সবদিকে সমানভাবে ছড়ায় না। নিচের চিত্রে (চিত্র 13.3) বিষয়টি দেখানো হয়েছে। মেঈ বিক্ষেপণ আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ওপর বিশেষ নির্ভর করে না বরং বাতাসে যথেষ্ট ধূলিকণা উপস্থিত থাকলে তা সূর্যের চারদিকে সাদা এক চকচকে ভাবের সৃষ্টি করে। কুয়াশার মধ্যে সাদা আলোও মেঈ বিক্ষেপণের জন্য দেখা যায়।

চিত্র **13.3**
র‍্যালে ও মেঈ বিক্ষেপণে আপতিত ও বিক্ষেপিত আলোর অভিমুখ

আমরা এবার পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোর বিচ্ছুরণ বিষয়ক আলোচনায় যাব।

13.5 আলোর বিচ্ছুরণ (Dispersion of light)

সূর্যের আলো প্রিজমের মধ্যে দিয়ে গেলে যে কতগুলি বিভিন্ন রঙে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে তা আমাদের একটি অত্যন্ত পরিচিত ঘটনা। সাদা আলো যে প্রকৃতপক্ষে কতগুলি ভিন্ন বর্ণের আলোর সমন্বয়ে গঠিত তা নিউটন প্রিজমের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখান। আমরা চলিত কথায় দৃশ্যমান আলোকে সাতটি রং দেখতে পাই এবং তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই রংগুলিকে আমরা যথাক্রমে বেগুনী, নীল, আকাশী, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল (সংক্ষেপে বেনীঅসহকলা বা VIBGYOR) বলে থাকি। সূর্যালোক বা সাদা আলোকে সাতটি রংয়ের সমষ্টি বলে উল্লেখ করা হয়—প্রকৃতপক্ষে সাদা আলো বলতে অনেকগুলি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সমন্বয়ে গঠিত আলোকে বোঝায়। বৃষ্টির পরে বায়ুমণ্ডলে ভাসমান জলকণার মধ্যে দিয়ে আগত 'সাদা' সূর্যালোক প্রতিসরণের জন্য বিশ্লিষ্ট হয়ে গিয়ে 'সাতরঙের' রামধনু তৈরি করে।

স্নেলের সূত্রানুযায়ী আমরা জানি যে কোনো মাধ্যমের চরম প্রতিসরাঙ্ক μ হলে লেখা যায় যে

$$\mu = \frac{\sin i}{\sin r} \quad \text{.......................................।} \quad (13.2)$$

যেখানে *i* হচ্ছে শূন্য বা বায়ু মাধ্যম থেকে আগত রশ্মির আপতন কোণ এবং r হচ্ছে মাধ্যমটিতে প্রতিসৃত রশ্মির প্রতিসরণ কোণ (চিত্র 11.4)

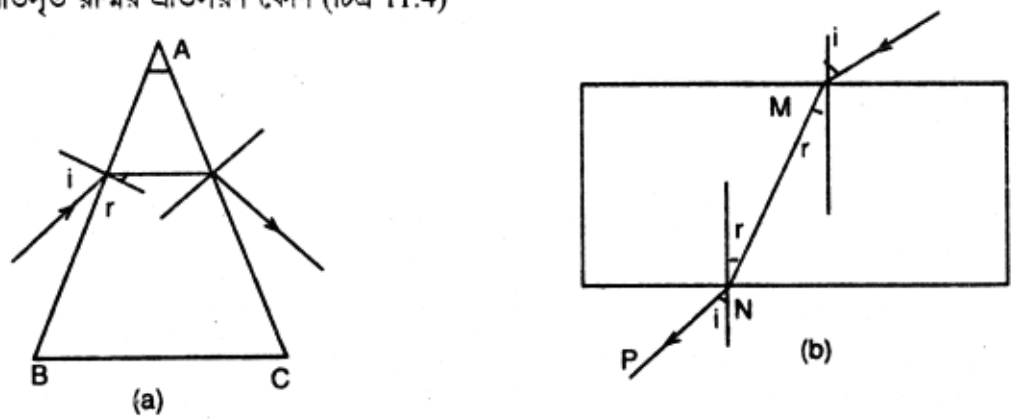

চিত্র 13.4 [প্রিজমের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় আলোক রশ্মির কৌণিক বিচ্যুতি ঘটে কিন্তু আয়তকার ব্লকের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় তা ঘটে না। এক্ষেত্রে আপতিত ও নির্গত রশ্মি পরস্পর সমান্তরাল।]

যখন বায়ু মাধ্যম থেকে সাদা আলো কোনো প্রিজমের একটি প্রতিসারক তলে আপতিত হয় ঐ আলোক

রশ্মিতে উপস্থিত সব বর্ণের আলোর জন্য আপতন কোণ '*i*' একই থাকে। কিন্তু বিভিন্ন বর্ণের জন্য প্রতিসরণ কোণ 'r' ভিন্ন হয়। দ্বিতীয় প্রতিসারক তল থেকে যখন এই বিভিন্ন বর্ণের আলো নির্গত হয় তখন সেই রশ্মিগুলির কৌণিক বিচ্যুতি (angular deviation) লক্ষ্য করা যায় এবং বিভিন্ন বর্ণের আলোর ক্ষেত্রে চ্যুতি কোণ (angle of deviation) ভিন্ন হয়। ফলে সাদা রংয়ের আলোতে উপস্থিত ভিন্ন বর্ণের আলোগুলি আবার একত্রিত হয়ে সাদা আলো গঠনের সুযোগ পায় না এবং আমরা ভিন্ন বর্ণের আলোগুলি আলাদাভাবে দেখতে পাই। এই ঘটনাটিকে আলোর বিচ্ছুরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। প্রিজমের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার ফলে সাদা আলো এভাবে বিশ্লিষ্ট হওয়ার কারণ আলোর কৌণিক বিচ্যুতি যা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের জন্য আলাদা। প্রিজমের পরিবর্তে যদি একই উপাদানে তৈরি স্বচ্ছ ব্লকের (যেমন কাচের তৈরি ব্লক চিত্র 13.4[b) মধ্যে দিয়ে সাদা আলোক রশ্মি গমন করে তাহলে আলোর বিচ্ছুরণ দেখা যায় না। কারণ, আপতিত ও নির্গত রশ্মি পরস্পরের সমান্তরাল থাকে, এবং সেখানে কোনো কৌণিক চ্যুতি পাওয়া যায় না। প্রিজমের দুটি প্রতিসারক তলের মধ্যে একটি কোণ থাকায় রশ্মির কৌণিক বিচ্যুতি ঘটে কিন্তু আয়তাকার ব্লকের দুটি প্রতিসারক তল পরস্পর সমান্তরাল (অর্থাৎ মধ্যবর্তী কোণ 0°) হওয়ার ফলে সেখানে আলোর কৌণিক বিচ্যুতি তথা বিচ্ছুরণ ঘটে না।

প্রতিসরাঙ্কের আরেকটি সংজ্ঞার দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। আমরা জানি যে বায়ু মাধ্যমে বা শূন্য মাধ্যমে আলোর গতিবেগ C এবং অন্য কোনো মাধ্যমে ওই গতিবেগ u হলে মাধ্যমের চরম প্রতিসরাঙ্ক μ কে লেখা যায় যে

$$\mu = \frac{C}{v} \qquad \text{..... (13.3)}$$

বস্তুত কোনো মাধ্যমে আলো লম্বভাবে আপতিত হলে স্নেলের সূত্রে প্রয়োগ করা যায় না, সেক্ষেত্রে মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক এই সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। বস্তুত এটি প্রতিসরাঙ্কের সাধারণীকৃত (generalised) সংজ্ঞা।

এখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন মাধ্যমে আলোর গতিবেগ ভিন্ন হওয়ায় বিভিন্ন মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক আলাদা হয়। আমরা জানি যে $v = \nu\lambda$ অর্থাৎ কোনো মাধ্যমে আলোর গতিবেগ, আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং কম্পাঙ্কের (ν) গুণফল। তাই আলো এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে গেলে তার গতিবেগের যে পরিবর্তন হয় তার জন্য কম্পাঙ্ক (ν) এবং তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (λ) যে কোনো একটি অথবা দুটি ই পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক। বাস্তব ক্ষেত্রে অবশ্য দেখা যায় যে $v = (\nu\lambda)$ -র পরিবর্তনের জন্য কেবলমাত্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিবর্তন হয়। আলোকরশ্মির কম্পাঙ্ক উভয় মাধ্যমেই অপরিবর্তিত থাকে।

তরঙ্গদৈর্ঘ্য বা λ -র পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোনো মাধ্যমে আলোর গতিবেগ পরিবর্তিত হয়। ফলত ওই

মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্কেরও পরিবর্তন ঘটে। তাই ভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বা ভিন্ন বর্ণের আলোর জন্য একটি মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক আলাদা হয়। এই কারণেই সাদা আলোতে উপস্থিত সব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর প্রিজমের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় কৌণিক চ্যুতি ঘটলেও এই চ্যুতি আলোর বর্ণনির্ভর। সুতরাং প্রিজমের দ্বিতীয় প্রতিসারক তল থেকে নির্গত বিভিন্ন বর্ণের আলো পর্দার ওপর ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় আপতিত হয়। আমরা দেখি সাদা আলো 'সাতরঙে ভেঙে' গেছে। পদার্থবিদ্যার পরিভাষায় আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে গেছে।

13.6 কৌণিক বিচ্ছুরণ (Angular dispersion) ও বিচ্ছুরণ (dispersion) -এর তাৎপর্য

আলোর বিচ্ছুরণের বিষয়টি পরিমাণগতভাবে বুঝতে গেলে দুটি বিষয় সংজ্ঞায়িত করা বিশেষ প্রয়োজন। এই দুটি বিষয় হচ্ছে কৌণিক বিচ্ছুরণ (angular dispersion) এবং বিচ্ছুরণ (dispersion)। এই দুটি রাশি গণনা করে বোঝা যায় যে কোনো মাধ্যম দিয়ে যাওয়ার সময় একটি বহুবর্ণী আলো কেবল সংশ্লিষ্ট বর্ণে ভেঙে যাবে না, সেটি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কোন অঞ্চলে কতটা ছড়িয়ে যাবে, এই দুটি বিষয়ের ব্যঞ্জনা নির্ণয়ের জন্য আমরা নিচের চিত্রটির সাহায্য নেব।

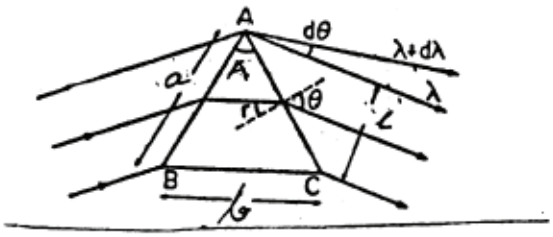

চিত্র 13.5

চিত্র 13.5 : [A কোণ ও b ভূমিবিশিষ্ট প্রিজমের মধ্যে দিয়ে আলোর বিচ্ছুরণ। লক্ষ্য করুন λ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর কৌণিক বিচ্যুতি θ কিন্তু (λ+dλ) তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর কৌণিক বিচ্যুতি (θ – dθ)।]

এখানে দেখানো হয়েছে ABC প্রিজমের প্রথম প্রতিসারক তলে (AB) আপতিত সমান্তরাল আলোকরশ্মি প্রিজমের মধ্যে দিয়ে প্রতিসরণের পরে দ্বিতীয় প্রতিসারক তল (AC) দিয়ে নির্গত হয়। যদি এই আলোকরশ্মি একবর্ণী হয় তবে রশ্মির কৌণিক চ্যুতি সত্ত্বেও আপতিত ও নির্গত রশ্মি সমান্তরাল থাকে। কারণ একটি বিশেষ বর্ণের আলো আপতন কোণ, প্রিজমের উপাদান ও প্রিজম কোণ (∠A বা ∠BAC) এবং আপতন কোণ ও নির্গমণ কোণের ওপর নির্ভর করে একটি নির্দিষ্ট কৌণিক চ্যুতি লাভ করে। তবে বহুবর্ণী বা একাধিক বর্ণ তথা তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ সমন্বিত আলোর ক্ষেত্রে ভিন্ন বর্ণের আলোর কৌণিক বিচ্যুতি ভিন্ন হয়। এর ফলেই বহুবর্ণী আলো নানা বর্ণে বিশিষ্ট হয়ে পড়ে। 13.5 চিত্রে যেমন দেখা যাচ্ছে যে λ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর কৌণিক বিচ্যুতি θ কিন্তু (λ+dλ) তরঙ্গদৈর্ঘ্যের

আলোর ক্ষেত্রে এই বিচ্যুতি ($\theta-d\theta$)। বস্তুত, λ র পরিবর্তনের ফলে θ এর পরিবর্তন অর্থাৎ $\frac{d\theta}{d\lambda}$ কে বলা হয় কৌণিক বিচ্ছুরণ (angular dispersion), অন্যভাবে বলা যায় যে $\frac{d\theta}{d\lambda}$ র সাহায্যে কৌণিক বিচ্ছুরণকে পরিমাপ করা হয়।

আমরা এবার কয়েকটি ধাপ গণনার মধ্যে দিয়ে $\frac{d\theta}{d\lambda}$-র সঙ্গে আরেকটু ভালভাবে পরিচিত হবো।

আপনারা জানেন যে $\frac{dz}{dx}$ কে আমরা এইভাবে লিখতে পারি ঃ-

$$\frac{dz}{dx} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dz}{dy}$$

ঠিক একইভাবে আমরা $\frac{d\theta}{d\lambda}$ কে লিখব

$$\frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{d\theta}{d\mu} \cdot \frac{d\mu}{d\lambda} \quad \text{.........................} \quad (13.4)$$

সমীকরণের দ্বিতীয় গুণকটি অর্থাৎ $\frac{d\mu}{d\lambda}$ কে বলা হয় বিচ্ছুরণ যেখানে μ হচ্ছে মাধ্যমটির (এক্ষেত্রে প্রিজমের উপাদানের) প্রতিসরাঙ্ক যা λ–র ওপর নির্ভরশীল।

12.5 চিত্রানুযায়ী লেখা যায় যে

$$\mu = \frac{\sin\theta}{\sin r}$$

$$\therefore \frac{d\theta}{d\mu} = \frac{\sin r}{\cos\theta} \quad \text{.......................} \quad (13.5)$$

(ধরে নেওয়া হচ্ছে r কোণটি স্থির রাখা হল)

লক্ষ্য করুন 13.5 সমীকরণটি লেখার সময় আমরা কেবল দ্বিতীয় প্রতিসারক তল অর্থাৎ AC তলে প্রতিসরণের দিকেই দৃষ্টি দিয়েছি। কিন্তু আলোক রশ্মির যে কৌণিক চ্যুতির কথা আমরা বলেছি তা কিন্তু দুটি

প্রতিসারক তল AB ও AC উভয়ক্ষেত্রেই ঘটেছে।

আমরা দুই তলের সম্মিলিত চ্যুতির বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য যদি প্রিজমটিকে তার ন্যূনতম চ্যুতির অবস্থানে (minimum deviation position) রাখা যায় তাহলে প্রিজমে আলোক রশ্মির আপতন ও নির্গমণ

চিত্র 13.6 ন্যূনতম চ্যুতির অবস্থানে $i_1 = i_2$ এবং $r_1 = r_2 = A/2$ হয়। ন্যূনতম চ্যুতির অবস্থানে আপতিত ও নির্গত রশ্মি প্রতিসম হয়।

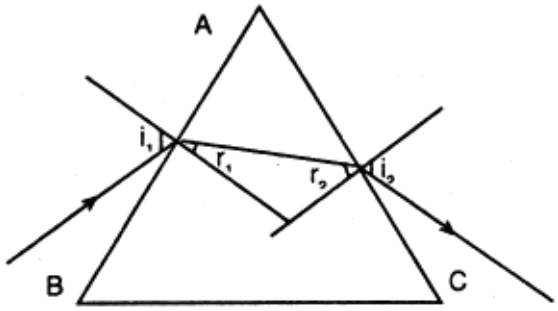

কোন সমান হয় এবং চিত্র 13.6 এ $i_1 = i_2$ হয়। এই অবস্থায় আপতিত ও নির্গত রশ্মিদ্বয় প্রতিসম (symmetrical) হয়। অতএব আলোক রশ্মির মোট কৌণিক চ্যুতি দ্বিতীয় তলে (বা প্রথম তলে) যে চ্যুতি ঘটেছে তার দ্বিগুণ হয়। সুতরাং 13.5 সমীকরণকে পরিবর্তন করে লেখা যায় যে,

$$\frac{d\theta}{d\mu} = \frac{2\text{Sin } r}{\text{Cos}\theta} \qquad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ (13.6)$$

এখন চিত্র এবং প্রিজমের ধর্ম থেকে লেখা যায় যে প্রিজম কোণ $A = r_1 + r_2 = 2r$

যেহেতু এখানে $r_1 + r_2 = r$

$\therefore\ r = A/2$

অতএব $\dfrac{d\theta}{d\mu} = \dfrac{2\text{Sin}\frac{A}{2}}{\text{Cos}\theta}$ .... (13.7)

এখন যদি প্রিজমের প্রতিসারক তলের প্রস্থচ্ছেদের দৈর্ঘ্য a হয় এবং 11.5 চিত্রানুযায়ী দ্বিতীয় তল থেকে নির্গত আলোক রশ্মিগুচ্ছের প্রস্থ l হয় তবে লেখা যায় যে

$$\frac{d\theta}{d\mu} = \frac{2\ a\text{Sin}\frac{A}{2}}{a\ \text{Cos}\theta} = \frac{b}{l} \qquad \ldots\ldots\ldots\ldots\ (13.8)\ \ [13.5 \text{ চিত্রানুযায়ী}]$$

এখানে b প্রিজমের ভূমির দৈর্ঘ্য সূচিত করছে। সাধারণত যে সব প্রিজম ব্যবহার করা হয় সেগুলি প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমবাহু প্রিজম হয়ে থাকে। ফলে প্রিজমের প্রতিসারক তলের ও ভূমির প্রস্থচ্ছেদের মান সমান হয় এবং $\frac{b}{\ell}$ এর মান 1 এর খুব কাছাকাছি হয়ে থাকে। যেখানে ব্যতিক্রম দেখা যায় সেখানেও $\frac{b}{\ell}$ এর মান 1-এর থেকে খুব বেশি ভিন্ন হয় না। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে 12.4 সমীকরণে $\frac{d\theta}{d\lambda}$-এর মান যে দুটির গুণক অর্থাৎ $\frac{d\theta}{d\mu}$ এবং $\frac{d\mu}{d\lambda}$ তাদের প্রথমটি ($\frac{d\theta}{d\mu}$) প্রিজমের মাপের (dimension) ওপর নির্ভর করে। অন্য গুণকটি $\frac{d\mu}{d\lambda}$ নির্ভর করে প্রিজমের বা প্রতিসারক মাধ্যমের আলোকীয় ধর্মের (optical property) ওপর। তাই $\frac{d\mu}{d\lambda}$কে বিচ্ছুরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই রাশিটি নির্ণয়ের মাধ্যমে জানা সম্ভব যে তরঙ্গদৈর্ঘের কোনো অঞ্চলে λ -র পরিবর্তনের সঙ্গে μ এর পরিবর্তন কীরকম হয়ে থাকে।

সুতরাং আমরা পাই $\frac{d\theta}{d\lambda} = (\frac{d\mu}{d\lambda})(\frac{b}{\ell})$ ..... (13.9)

এরপরের দুটি অনুচ্ছেদে আমরা দুটি শ্রেণীভুক্ত বিচ্ছুরণের বিষয়ে আলোচনা করব। উভয় ক্ষেত্রেই আমরা $\mu-\lambda$ লেখচিত্রের বিভিন্ন অংশে $\frac{d\mu}{d\lambda}$-র মান শুধু ভিন্নই নয় এই মান কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, তার পর্যালোচনাও আলোর বিচ্ছুরণ বোঝার জন্য অত্যন্ত জরুরি। এইজন্য $\frac{d\mu}{d\lambda}$ রাশিটির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি এবং কেবলমাত্র ওই রাশিটির নাম আলাদাভাবে বিচ্ছুরণ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

13.7 প্রত্যাশিত বিচ্ছুরণ (Normal dispersion)

কোনো একটি মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক (μ) যে ওই মাধ্যমে আলোর গতিবেগ তথা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভরশীল তা আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে দেখা গেছে। পরীক্ষামূলকভাবে মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোর জন্য নির্ণয় করে λ-র সঙ্গে তার পরিবর্তন লেখচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করলে নিচের লেখচিত্রটি (চিত্র 13.7) পাওয়া যায়।

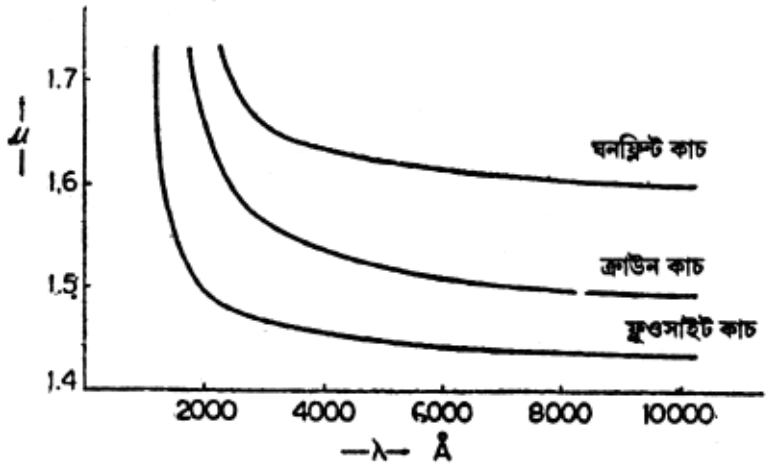

চিত্র 13.7 : [প্রত্যাশিত বিচ্ছুরণের ক্ষেত্রে μ–λ লেখচিত্র। বিভিন্ন ধরনের কাচ দিয়ে নির্মিত প্রিজমের জন্য এই বিচ্ছুরণ দেখানো হয়েছে। লক্ষ্য করুন কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে λ-র সঙ্গে μ অনেক দ্রুত পরিবর্তিত হয়। সব কাচের ক্ষেত্রেই সামান্য কিছু অংশ অতিবেগুনী ও অবলোহিত সহ মূলত দৃশ্য আলোর λ-র জন্যই এই লেখচিত্র আঁকা হয়েছে।]

অন্যদিকে কোনো স্বচ্ছ মাধ্যমে আলোর গতিবেগ যে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায় পরীক্ষামূলকভাবে তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। এই দুটি পরীক্ষামূলক তথ্য কিন্তু একই ঘটনার দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে। কারণ তরঙ্গদৈর্ঘ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আলোর গতিবেগ বৃদ্ধির অর্থ ঐ মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্কের হ্রাস, কারণ 13.3 সমীকরণ অনুযায়ী আমরা জানি $\mu = \frac{c}{v}$, ফলতঃ বলা যায় যে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বৃদ্ধির জন্য কোনো মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক হ্রাস পায়।

তবে 13.7 চিত্রে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে λ র সঙ্গে μ র এই পরিবর্তন যে দেখানো হয়েছে সেখানে 13.9 সমীকরণে প্রাপ্ত $\frac{d\mu}{d\pi}$-র মাত্র প্রত্যাশা মতই বিভিন্ন বিন্দুতে (বা বিভিন্ন μ য়) ভিন্ন এবং ধনাত্মক কারণ আমরা দেখেছি যে প্রিজমের মধ্যে দিয়ে বিচ্ছুরণের সময় $\frac{d\mu}{d\lambda}$ ধনাত্মক তাই বলা যায় যে λ বৃদ্ধির সঙ্গে μ হ্রাস পায়। আলোর বিচ্ছুরণে এই আচরণ লক্ষ্য করা গেলে সেটিকে প্রত্যাশিত বিচ্ছুরণ (normal dispersion) বলা হয়।

1836 সালে বিজ্ঞানী ক্যাশি (cauchy) μ–λ লেখার চেহারাটি বা λ সঙ্গে μ-এর পরিবর্তনের বিষয়টি

ব্যাখ্যা করেন। তিনি তার বিশ্লেষণে ধরে নেন যে মাধ্যম দিয়ে আলোকতরঙ্গ গমণ করছে সেই কঠিন স্বচ্ছ মাধ্যমের আচরণ স্থিতিস্থাপক মাধ্যমের মত। তিনি ধরে নেন যে স্থিতিস্থাপক মাধ্যম দিয়ে কোনো অনুপ্রস্থ (transverse) তরঙ্গ প্রবাহিত হলে ঐ মাধ্যমে তরঙ্গের গতিবেগ v মাধ্যমের স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক ও ঘনত্বের ওপর নির্ভরশীল ($v = \sqrt{\frac{k}{p}}$ যেখানে k হচ্ছে স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক ও P ঘনত্ব)। লক্ষ্য করবেন এই সম্পর্ক আমরা কোনো মাধ্যমে শব্দতরঙ্গে গতিবেগের জন্য আমরা এরকম ব্যঞ্জনা পেয়েছি। ক্যশি তার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এই ধারণাগুলি ব্যবহার করে প্রতিসরাঙ্ক (μ) ও তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (λ) সম্পর্ক প্রকাশ করে নিচের সূত্রটি দেন

$$\mu = A + \frac{B}{\lambda^2} + \frac{C}{\lambda^4} \qquad \text{..... (13.10)}$$

এটিকে প্রত্যাশিত বিচ্ছুরণ বিষয়ক ক্যশির সূত্র বলা হয়।

এই (13.10) সমীকরণে A, B, C তিনটি ধ্রুবক, যেগুলির মান স্বচ্ছ মাধ্যমের বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ ঘন ফ্লিন্ট কাচের ক্ষেত্রে A, B, C -র যা মান পাওয়া যাবে তা ক্রাউন কাচে পাওয়া ওই ধ্রুবকগুলির মান থেকে ভিন্ন।

ক্যশির এই সূত্রে প্রাথমিকভাবে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বৃদ্ধির সঙ্গে প্রতিসরাঙ্কের হ্রাসের বিষয়টি ধরা পড়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে যে, λ -র সঙ্গে μ ঠিক যেভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে তা কি এই সম্পর্কটিতে প্রতিফলিত হয়েছে? এর উত্তরে বলা যায় যে বিষয়টি A, B, C তিনটি ধ্রুবকের ওপর নির্ভরশীল, এবং পরিচিত বিচ্ছুরণের ঘটনাটি ক্যশির সূত্রের সাহায্যে ভালোভাবে গণনা করা সম্ভব।

(13.10) সমীকরণ থেকে আরও দেখা যায় যে যদি তিনটি জানা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের জন্য কোনো মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক পরীক্ষামূলকভাবে নির্ণয় করা যায় তাহলে ওই মাধ্যমের জন্য A, B, C নির্ণয় করা সম্ভব। তারপর যে কোনো তরঙ্গদৈর্ঘ্যের জন্য A, B, C -র ওই মানগুলি ব্যবহার করে দেখা যেতে পারে ক্যশির এই সূত্র থেকে প্রাপ্ত একটি λ -র জন্য μ এর যে তাত্ত্বিক মান গণনা করা হচ্ছে তা পরীক্ষালব্ধ মানের সঙ্গে কতখানি মিলছে। প্রকৃতপক্ষে পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচিত ব্যতিক্রান্ত বিচ্ছুরণের পরিঘটনা আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত ক্যশির সূত্রই বিচ্ছুরণ ব্যাখ্যা করার একমাত্র সূত্র ছিল।

বাস্তব ক্ষেত্রে অবশ্য বহু সময়ই লক্ষ্য করা যায় যে (13.10) সমীকরণের তিনটি পরিবর্তে ডানদিকের দুটি মাত্র রাশিকে ব্যবহার করে যথেষ্ট ভালো ফল পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে (13.10) সমীকরণে প্রাপ্ত ক্যশির সূত্রটি পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায়।

$$\mu = A + \frac{B}{\lambda^2} \quad \text{.......................} (13.11)$$

এই (12.11) সমীকরণটিকে অন্তরকলন (differentiate) করে আমরা পাই

$$\frac{d\mu}{d\lambda} = -\frac{2B}{\lambda^3} \quad \text{.......................} (13.12)$$

এই সম্পর্কটি থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যাশামতই $\mu - \lambda$ লেখচিত্রের গতি ঋণাত্মক। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে B একটি ধনাত্মক ধ্রুবক। অতএব আমরা যদি (13.12) সমীকরণে প্রকাশিত কিছুটা সরলীকৃত ক্যশির সম্পর্ক ব্যবহার করি তাহলে বলা যায় যে $\mu - \lambda$ লেখচিত্রের গতি λ^3 এর ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়। $\mu - \lambda$ লেখচিত্র লক্ষ্য করলে বিষয়টি বোঝা যায়। ক্ষুদ্রতর λ -র ক্ষেত্রে গতি ঋণাত্মক এবং বৃহত্তর মানের। λ-র বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গতির চরম মান $\left(\left|\frac{B}{\lambda^3}\right|\right)$ ছোট হতে থাকে যদিও তার ঋণাত্মক চিহ্ন অপরিবর্তিত থাকে। $\mu - \lambda$ লেখচিত্রের যে কোনো বিন্দুতে স্পর্শক টেনে ওই তরঙ্গদৈর্ঘ্য বা λ-র জন্য গতি গণনা করা সম্ভব। এর ওপর ভিত্তি করে নিচের অনুশীলনীটি আপনি চেষ্টা করুন।

অনুশীলনী 3 : (13.11) সমীকরণে প্রকাশিত ক্যশির সূত্রের পরিবর্তিত রূপটির সাহায্য নিয়ে দৃশ্য আলোর দুই প্রান্তের বিকিরণের জন্য একটি উপাদানের বিচ্ছুরণের তুলনা করুন।

13.8 ব্যতিক্রান্ত বিচ্ছুরণ (Anomalous dispersion)

ক্যশির সূত্র থেকে [সমীকরণ 13.10] প্রত্যাশিত বিচ্ছুরণের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া গেলেও 1870-71 সাল নাগাদ অপর দুই বিজ্ঞানী ক্রিশ্চিয়ানসেন (Christiansen) এবং কুন্ড (Kundt) এমন একটি বিচ্ছুরণের ঘটনা পরীক্ষামূলকভাবে প্রত্যক্ষ করেন যেখানে বিচ্ছুরণের ফলে প্রাপ্ত $\mu - \lambda$ লেখচিত্র ক্যশির সূত্র অনুসরণ করেন না। প্রত্যাশিত বিচ্ছুরণের থেকে ভিন্ন ধরনের এই বিচ্ছুরণকে বলা হয় **ব্যতিক্রান্ত বিচ্ছুরণ (Anomalous dispersion)** ।

এই বিজ্ঞানীদ্বয় সাদা আলোর বিচ্ছুরণের জন্য দুটি বিশেষ ধরনের মাধ্যম ব্যবহার করেছিলেন। এদের একটি হচ্ছে বেগুনী বর্ণের আইওডিন বাষ্প এবং অপরটি ফুকসিন (fuchsin) নামের বিশেষ একটি রাসায়নিকের সবুজ রঙের জলীয় দ্রবণ। এই দুটি মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে প্রেরিত আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধির সঙ্গে মাধ্যমের μ ক্যশির সূত্রানুযায়ী নিরবচ্ছিন্নভাবে কমে না, বিশেষ অঞ্চলে তা ভিন্ন আচরণ দেখায়। অর্থাৎ μ–র সঙ্গে μ এর পরিবর্তন

আংশিকভাবে ক্যশির সূত্র অনুসরণ করে। কিছুটা অংশে μ এর পরিবর্তন ক্যশির সূত্র থেকে কেবল বিচ্যুত হয় না তা সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ প্রদর্শন করে। এই পর্যবেক্ষণকে ব্যতিক্রান্ত বিচ্ছুরণ আখ্যা দেওয়া হয়। দেখা যায় ওই দুটি উপাদানের $\mu - \lambda$ লেখচিত্রে অংশবিশেষে ছেদ (discontinuity) রয়েছে এবং ঐ ছেদের নিকটবর্তী অঞ্চলে ক্যশির সূত্র প্রয়োগ করা যায় না। এই ঘটনার কারণ হিসেবে দেখা যায় যে ওই দুটি মাধ্যমের এমন একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা আমাদের পরিচিত স্বচ্ছ, বর্ণহীন মাধ্যম থেকে ভিন্ন এবং তার ফলেই ওই ছেদ এবং ক্যশির সূত্র থেকে বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়।

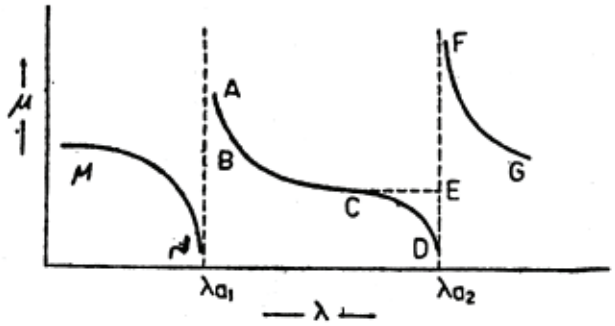

[চিত্র 13.8 : ব্যতিক্রান্ত বিচ্ছুরণের ক্ষেত্রে λ-র সঙ্গে μ এর পরিবর্তন λa_1 ও λa_2 অঞ্চলে মাধ্যমটির দুটি বরণাত্মক শোষণপটি রয়েছে। শোষণপটির মধ্যে μ সংজ্ঞায়িত নয়।]

যে সব মাধ্যমে ব্যতিক্রান্ত বিচ্ছুরণ দেখা যায় সেগুলির ক্ষেত্রে $\mu - \lambda$ লেখচিত্র কেমন হয় তা (13.8) চিত্রে দেখানো হয়েছে। লক্ষ্য করুন এই চিত্রের দুটি বিশেষ λ-র নিকটে (λa_1এবং λa_2) λ-র সঙ্গে μ-এর পরিবর্তন ক্যশির সূত্র মেনে হচ্ছে না। কেবল তাই নয় এখানে (λa_1এবং λa_2) অঞ্চলে $\mu - \lambda$ লেখচিত্রের একটি ছেদ (discontinuity) দেখা যাচ্ছে যা প্রত্যাশিত বিচ্ছুরণের ক্ষেত্রে আমরা দেখিনি। তাছাড়া λa_1 ও λa_2 মধ্যবর্তী ABC অংশটি ক্যশির সূত্র মেনে চললেও যখন λ-র মান λa_2 নিকটবর্তী হচ্ছে তখন λ-র সঙ্গে μ-এর অনেক দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। এই অঞ্চলে CD পরীক্ষালব্ধ লেখচিত্র সূচিত করছে। যদি $\mu - \lambda$ লেখচিত্র ক্যশির সূত্র এই অঞ্চলেও মেনে চলত তাহলে সেই চিত্র হত CE রেখা (ভাঙা রেখা) বরাবর। কিন্তু এখানে তা হচ্ছে না।

আরও লক্ষ্য করবেন যে λa_1এবং λa_2-র সন্নিহিত অঞ্চলে ক্যশির সূত্র থেকে $\mu - \lambda$ রেখাচিত্রের বিচ্যুতি ব্যাপক। যেমন λa_1 ও λa_2 তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অব্যবহিত আগে MN বা CD অঞ্চলে λ-র সঙ্গে μ হ্রাস পায় ঠিকই তবে তা ক্যশির সূত্রানুযায়ী ঘটে না, ঘটে অনেক দ্রুততর। আবার λa_1 ও λa_2 তরঙ্গদৈর্ঘ্যে অঞ্চল অতিক্রম করার অব্যবহিত পরেই (F বিন্দুতে) তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি সত্ত্বেও μ এর মান এক আকস্মিক বৃদ্ধি দেখায়। এই অংশটিও ক্যশির সূত্র অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা যায় না, যদিও তারপর থেকে আবার তা ক্যশির সূত্র অনুসরণ করে। এছাড়া λa_1

ও λa_2 অঞ্চলে উপস্থিত $\mu - \lambda$ লেখচিত্রের দুটি ছেদের মধ্যে তো μ এর মাত্র জানাই যায় না।

আসলে 13.8 চিত্রে যে $\mu - \lambda$ -র লেখচিত্র দেখানো হয়েছে সেখানে λa_1 ও λa_2 দুটি বিশেষ অঞ্চল যেখানে বর্ণালীতে অন্ধকার পটি (dark land) পাওয়া যায়। আমরা যে আলো ব্যবহার করে এই বর্ণালী পাই ও দেখি তা আমাদের পরিচিত দৃশ্য আলো। এই আলোতে প্রাপ্ত বর্ণালী অবশ্যই মাধ্যমের উপাদান ও যে উৎস থেকে আলো নির্গত হচ্ছে তার বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল। তবে যদি সায়ং সম্বলিত সাদা আলো ব্যবহৃত হয় তখন প্রাপ্ত বর্ণালী কেবল প্রতিসারক মাধ্যমের বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে।

ফুকসিন ও আয়োডিন বাষ্প নিয়ে বিচ্ছুরণের এই পরীক্ষায় ক্যশির সূত্রের বিচ্যুতি লক্ষ করার জন্য একটি বিশেষ ঘটনা দায়ী। এই দুটি উপাদানের এক বা একাধিক বরণাত্মক (selective) শোষণপটি (absorption land) দৃশ্য আলোর মধ্যে বর্তমান। এই শোষণপটির জন্য এদের $\mu - \lambda$ লেখচিত্রে ছেদ দেখা যায় আর শোষণপটির নিকটবর্তী অঞ্চলে ক্যশির সূত্র খাটে না।

আমরা এই বিষয়টি এখানে একটু বিশদভাবে আলোচনা করব। আমরা বিভিন্ন উপাদান বা মাধ্যমকে স্বচ্ছ অথবা অস্বচ্ছ হিসেবে চিহ্নিত করি। স্বচ্ছ মাধ্যম, যেমন কাঁচ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে আলো কোনোরকম তীব্রতার হ্রাস ছাড়াই চলে যেতে পারে। এখানে এই আলো বলতে দৃশ্য আলো বোঝানো হচ্ছে। কাঁচ আমাদের দৃশ্য আলোর জন্য স্বচ্ছ কিন্তু তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণ পরিবারের অন্য সব সদস্যদের জন্য সেটি স্বচ্ছ নাও হতে পারে। সেরকম বিকিরণ কাঁচের ওপর আপতিত হলে তা শোষিত (absorbed) হবে। অন্যদিকে আমাদের শরীরের চামড়া বা মাংস দৃশ্য আলোর কাছে অস্বচ্ছ। কাঠের মত উপাদান ও দৃশ্য আলোকে তার মধ্যে দিয়ে যেতে দেয় না। কিন্তু এই সমস্ত ধরনের বস্তুর মধ্যে দিয়ে এক্স রশ্মি চলে যেতে সক্ষম তা আমরা জানি — অর্থাৎ এক্স রশ্মির ক্ষেত্রে উপাদানগুলি স্বচ্ছ মাধ্যমের মত ব্যবহার করে। মাধ্যম স্বচ্ছ হলে আপতিত ও নির্গত বিকিরণের তীব্রতা প্রায় অপরিবর্তিত থাকে।

প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন উপাদানের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে কিছু বিশেষ অঞ্চলের বিকিরণকে শোষণের ক্ষমতা থাকে। এই বিকিরণ দৃশ্য আলোর অন্তর্গত হতে পারে আবার নাও হতে পারে। যেমন কাচের মধ্যে দৃশ্য আলোর পাল্লায় উপস্থিত কোনো তরঙ্গই শোষিত হয় না। অন্যদিকে ফুকাসিনের দ্রবণ বা আয়োডিন বাষ্পের মধ্যে দৃশ্য আলোর খানিকটা অংশ শোষিত হয়। এইজন্য ঘটনাগুলিকে বলা হয় বরণাত্মক শোষণ (Elective absorption)। খুব স্বাভাবিকভাবেই আপতিত বিকিরণের অংশবিশেষ শোষিত হলে নির্গত বিকিরণের তীব্রতা আপতিত বিকিরণের তীব্রতার তুলনায় কম হয়।

ফুকাসিন দ্রবণ বা আয়োডিনের বাষ্পের মধ্যে দিয়ে দৃশ্য আলো যাওয়ার সময় সেই আলোর কিছু তরঙ্গদৈর্ঘ্য

মাধ্যমে শোষিত হয়ে শোষণপটি (absorption land) গঠন করে। আসলে মাধ্যমের বিশেষ অভ্যন্তরীণ গঠন তথা ধর্মের কারণে ওই অঞ্চলের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণকে এই মাধ্যম তাপশক্তিতে রূপান্তরিত করে - – কখনও তা ওই বিকিরণের সমপরিমাণ শক্তি মাধ্যমটির অণুগুলিতে সঞ্চিত হয়। তাই ঠিক ওই শোষণ পটিতে অবস্থিত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সমান আলো দিয়ে যদি এই মাধ্যমগুলিকে আলোকিত করা যায় তাহলে মাধ্যমগুলি সম্পূর্ণ অস্বচ্ছ দেখাবে কেননা আপতিত তরঙ্গের সবটুকুই সেখানে শোষিত হবে, কিছুই মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে নির্গত হতে পারবে না।

13.8 চিত্রে λa_1 ও λa_2 অঞ্চলে $\mu - \lambda$ লেখচিত্রের যে ছেদ রয়েছে তার জন্য মাধ্যমের শোষণ পটির অবস্থানই দায়ী। এজন্য অন্য $\mu - \lambda$ লেখচিত্রের ছেদ দেখা যায়। শুধু তাই নয় এই শোষণপটির নিকটবর্তী অঞ্চলে যে সব λ রয়েছে এবং যেগুলি শোষিত হচ্ছে না এবং মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে চলে যাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে মাধ্যমের μ অন্য যেসব λ -র জন্য যে ক্যশির সূত্র মেনে চলে তা পাওয়া যায় না।

13.8 চিত্রে তাও দেখানো হয়েছে। শোষণ পটি থেকে বহুদূরের λ -র জন্য ক্যশির সূত্র চমৎকার কাজ করে এবং যত শোষণপটির নিকটবর্তী হওয়া যায় তত ঐ সূত্র থেকে বিচ্যুতির বিষয়টি ধরা পড়ে।

খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে যে তাহলে ক্যশি তার সূত্রটি কীভাবে পেয়েছিলেন? লক্ষ্য করবেন যে ক্যশি যেসব উপাদান নিয়ে কাজ করেছিলেন বা যেসব উপাদানের প্রতিসরাঙ্কের সঙ্গে আপতিত বিকিরণের পরিবর্তনের বিশ্লেষণ তিনি করেছিলেন সেগুলির কোনোটিতেই দৃশ্য আলো পাল্লার মধ্যে শোষণ পটি অবস্থিত ছিল না। বরং পুরো দৃশ্য আলো অঞ্চলটিই ছিল শোষণ পটি থেকে বহুদূরে, ফলে ক্যশির সূত্রটি প্রয়োগে বাধা ছিল না। ফুকসিন দ্রবণ ও আয়োডিন বাষ্পে প্রথম দৃশ্য আলো পাল্লার মধ্যে শোষণ পটির হদিশ পাওয়া গেলে ক্যশির সূত্রের বিচ্যুতি ধরা পড়ে। পরবর্তীকালে আরও বিশেষ মাধ্যমে একই ঘটনা পাওয়া গেছে।

শোষণপটির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ক্যশির সূত্রের ব্যর্থতার মূলে রয়েছে ক্যশি যে অনুমান ভিত্তিক বিশ্লেষণ করেছিলেন তার সীমাবদ্ধতা, বস্তুত: সমস্তরকম আলোর জন্যই মাধ্যমের অণুগুলি স্থিতিস্থাপক ধর্ম দেখায় না। তাছাড়া ক্যশি যেহেতু $\mu - \lambda$ লেখর সেই অঞ্চলটি নিয়ে কাজ করেছিলেন যা শোষণপটি থেকে বহু দূরে অবস্থিত তাই তার সূত্রটিকে একটি সীমিত অঞ্চলে প্রয়োগের উপযোগী সূত্র হিসেবেই দেখা উচিত। আসলে প্রথমে আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে ক্যশির প্রত্যক্ষ করা পরিঘটনা প্রত্যাশিত বিচ্ছুরণ আখ্যা পেয়েছিল যদিও ব্যাপকতর বিকিরণের ক্ষেত্রে কোনো মাধ্যমে শোষণপটি উপস্থিত থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে আবিষ্কৃত শোষণপটি সম্বলিত বিচ্ছুরণ এখন ব্যতিক্রান্ত বিচ্ছুরণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যাশিত ও ব্যতিক্রান্ত বিচ্ছুরণ

নামে পরিচিত দুটি পরিঘটনার এই নামগুলি আমরা এখনও ব্যবহার করছি। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যাশিত বিচ্ছুরণকে ব্যতিক্রান্ত বিচ্ছুরণের একটি বিশেষ ক্ষেত্র (Special Case) হিসেবেই দেখা উচিত।

ব্যতিক্রান্ত বিচ্ছুরণের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়ে যে গাণিতিক সূত্র দেওয়া হয়েছে আমরা অবশ্য সেই আলোচনাকে বর্তমান পাঠ্যসূচির অন্তর্গত করছি না। তবে ব্যতিক্রান্ত বিচ্ছুরণ আবিষ্কৃত হওয়ার পরে ক্যশির সূত্র সম্পূর্ণ মূল্যহীন হয়ে যায়নি, কেবল তাঁর সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত হয়েছে। পদার্থবিদ্যায় এটি একটি সুপরিচিত ঘটনা। অন্য বহু ক্ষেত্রেও এরকম ঘটেছে।

13.9 সারাংশ

1. আমাদের পরিচিত কতগুলি প্রাকৃতিক ঘটনার মূলে রয়েছে আলোর বিক্ষেপণ ও বিচ্ছুরণ। আলোর বিক্ষেপণের ফলে আকাশের রং নীল দেখায় আর রামধনুর সাতটি রং দেখা যায় আলোর বিচ্ছুরণের ফলে।

2. তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণের একটি ক্ষুদ্র অংশের সাহায্যে আমরা দেখতে পাই। পরিভাষায় একে বলা হয় দৃশ্য আলো। এছাড়া এই পরিবারভুক্ত সদস্যদের মধ্যে রয়েছে গামা রশ্মি, এক্স রশ্মি, অতিবেগুনী, অবলোহিত রশ্মি, রেডিও তরঙ্গ প্রভৃতি।

3. আলোকরশ্মি যখন কোনো মাধ্যমের অণুর দ্বারা বিক্ষেপিত হয়, তখন অণু কর্তৃক আলোর শোষণ ও পুনঃনিঃসারণের সময় পার্থক্যের ওপর নির্ভর করে কেবল বিক্ষেপণ নয় আরও কয়েকটি পরিঘটনা লক্ষ্য করা যায়।

4. ব্রিলোয়াঁ বিক্ষেপণ ও র‍্যালে বিক্ষেপণ দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিক্ষেপণ প্রক্রিয়া। র‍্যালে বিক্ষেপণের জন্যই আকাশের রং নীল দেখায়।

5. যখন মাধ্যমের কণার রং অণুর আকার আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য অপেক্ষা বড় বা তার সমান হয়ে যায় তখন র‍্যালে বিক্ষেপণের পরিবর্তে মেঈ বিক্ষেপণ ঘটে।

6. আলোর বিচ্ছুরণে প্রতিসারক মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় সাদা বা অন্য বহুবর্ণী আলো সংশ্লিষ্ট কতগুলি বর্ণের আলোতে বিভক্ত হয়ে যায়। বিচ্ছুরণের পরিমাণগত হিসেবের জন্য $\frac{d\mu}{d\lambda}$ রাশিটির গণনা প্রয়োজনীয়।

7. আলোর বিচ্ছুরণ দু'রকম হয়ে থাকে — প্রত্যাশিত ও ব্যতিক্রান্ত বিচ্ছুরণ। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যাশিত বিচ্ছুরণ হচ্ছে ব্যতিক্রান্ত বিচ্ছুরণের এক বিশেষ শর্তসাপেক্ষ রূপ।

13.10 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

1. তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি লিপিবদ্ধ করুন।
2. আলো যখন কোনো মাধ্যমে আপতিত হয় তখন সেই মাধ্যমের অণুতে আলোর মিথস্ক্রিয়ার ফলে বিক্ষেপণের যেসব পরিঘটনাগুলি লক্ষ করা যায় সে বিষয়ে সংক্ষেপে লিখুন।
3. র‍্যালে বিক্ষেপণের ফলে বিক্ষেপিত আলোর তীব্রতা আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ওপর কীভাবে নির্ভর করে?
4. বিচ্ছুরণ ও কৌণিক বিচ্ছুরণ কাকে বলে?
5. প্রত্যাশিত বিকিরণ ও ব্যতিক্রান্ত বিচ্ছুরণের পার্থক্য নির্দেশ করুন। আলোচনার মাধ্যমে দেখান যে ব্যতিক্রান্ত বিচ্ছুরণই প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক ঘটনা।

13.11 উত্তরমালা

অনুশীলনী 1

নিচের তালিকায় বিভিন্ন তড়িচ্চুম্বকীয় রশ্মির নাম ও তাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ও কম্পাঙ্কের পাল্লা দেওয়া হল। এই তালিকাটি 13.1 চিত্রের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে এবং এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে যে শূন্য মাধ্যমে আলোর গতিবেগ $3 \times 10^8\ ms^{-1}$ । শক্তির পাল্লার স্তম্ভটি 13.1 চিত্রের সাহায্যে পূরণ করুন।

বিকিরণটির পরিচয় বা নাম	তরঙ্গ দৈর্ঘ্যর (λ) পাল্লার(মোটামুটি) (m)	কম্পাঙ্কের (ν) পাল্লা (মোটামুটি) (H_2)	ফোটনের শক্তি $E = h\nu$ (ev)
গামা রশ্মি	$10^{-13} - 10^{-12}$	$10^{22} - 10^{20}$	
এক্স রশ্মি	$10^{-12} - 10^{-8}$	$10^{20} - 10^{16}$	
অতি বেগুনী রশ্মি	$10^{-8} - 10^{-7}$	$10^{16} - 10^{15}$	
দৃশ্য আলো	$4 \times 10^{-7} - 18 \times 10^{-7}$	$4 \times 10^{15} - 8 \times 10^{15}$	
অবলোহিত রশ্মি	$10^{-6} - 10^{-3}$	$10^{14} - 10^{11}$	
মাইক্রোওয়েভ বা মাইক্রোতরঙ্গ	$10^{-3} - 10^{-1}$	$10^{11} - 10^{9}$	

টেলিভিশন ও এফ এম সম্প্রচার	$10^0 - 10^1$	$10^8 - 10^7$
সাধারণ সম্প্রচার	$10^2 - 10^3$	$10^6 - 10^5$
বেতার বা রেডিও তরঙ্গ (এই বৃহৎ গোষ্ঠীর মধ্যে টিভি ও সাধারণ সম্প্রচার তরঙ্গ অর্ন্তভুক্ত)	$10^{-1} - 10^5$	$10^9 - 10^3$

অনুশীলনী 2

এই পরিঘটনাগুলি আলোক সংদীপ্তি, প্রতিপ্রভা ও অণুপ্রভা রামন ক্রিয়া এই পরিঘটনাগুলি থেকে আবার ভিন্ন 13.3.1 অনুচ্ছেদের সাহায্য নিয়ে প্রথম তিনটি পরিঘটনা সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য সংযোজন করুন।

অনুশীলনী 3

ক্যাশির মূল সূত্রটি হল $\mu = A + \frac{B}{\lambda^2} + \frac{C}{\lambda^4}$ (11.11) সমীকরণে $\frac{C}{\lambda^4}$ অংশটি বাদ দেওয়া হয়েছে। A, B, C তিনটি ধ্রুবকই মাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল এবং $\frac{C}{\lambda^4}$ পদটি বাদ দেওয়ার ফলে μ এর মানের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে না তাই (12.11) সমীকরণ অনুযায়ী

$$\mu = A + \frac{B}{\lambda^2}$$

$$\frac{d\mu}{d\lambda} = -\frac{2B}{\lambda^3}$$

দৃশ্য আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মোটামুটিভাবে 400 nm থেকে 800 nm পর্যন্ত বিস্তৃত

$$\left(\frac{d\mu}{d\lambda}\right)_{400nm} = -\frac{2B}{(400)^3}, \left(\frac{d\mu}{d\lambda}\right)_{800nm} = -\frac{2B}{(800)^3}$$

$$\therefore \frac{\left(\frac{d\mu}{d\lambda}\right)_{400nm}}{\left(\frac{d\mu}{d\lambda}\right)_{800nm}} = \frac{(800)^3}{(400)^3} = 2^3 = 8$$

অর্থাৎ দৃশ্য আলোর নিম্নতর তরঙ্গ প্রান্তে বিচ্ছুরণের মান উচ্চতর তরঙ্গ প্রান্তে বিচ্ছুরণের মান অপেক্ষা 8 গুণ বেশি।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

1. এই এককের 13.2 অনুচ্ছেদ দেখুন।

2. এই এককের 13.4, 13.4.1 এবং 13.4.2 অনুচ্ছেদের সাহায্য নিয়ে ব্রিলোয়াঁ বিক্ষেপণ, র‍্যালে বিক্ষপণ ও মেঈ বিক্ষেপণের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করে তাদের পার্থক্য নির্দেশ করুন।

3. র‍্যালে বিক্ষেপণের ফলে বিক্ষেপিত আলোর তীব্রতা বেশ কয়েকটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে [সমীকরণ 13.1 দ্রষ্টব্য] তবে এর মধ্যে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ওপর এই নির্ভরশীলতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ বিক্ষেপিত আলোর তীব্রতা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের চতুর্থ খাতের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ θ কোণে বিক্ষেপিত আলোর তীব্রতা $I(\theta)$ হলে লেখা যায়।

$$I(\theta) \propto \frac{1}{\lambda^4}$$

4. এই এককের 13.6 অনুচ্ছেদ দেখুন।

5. এই এককের 13.8 অনুচ্ছেদের দ্বিতীয়াংশে বিষয়টি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে।

একক 14 ❑ দৃষ্টি

গঠন

14a.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

14a.2 ক্যামেরা ও চোখের তুলনা

14a.3 চোখের গঠন

14a.4 দ্বিনেত্র দৃষট ও তার সুবিধা

14a.5 উপযোজন

14a.6 অভিযোজন

14a.7 চোখের ত্রুটি

14a.8 উদাহরণ

14a.9 সারাংশ

14a.10 প্রশ্নাবলী

14b.1 অভিযোজন ক্ষমতা

14b.2 আঁধার বীক্ষণ

14b.3 প্রান্তীয় বীক্ষণ

14b.4 দৃষ্টি নির্বন্ধ, বর্ণক্লান্তি, এবং বর্ণানুবেদন

14b.5 বীক্ষণ সূক্ষ্মতা

14b.6 বর্ণানুভূতি

14b.7 বর্ণবীক্ষণ

14b.8 বর্ণ পরিমাপ

14b.9 বর্ণময়তা লেখ

14b.10 বস্তুর বর্ণ

14b.11 বর্ণান্ধতা

14b.12 পতঙ্গদের পুঞ্জাক্ষী

14b.13 আরও অন্য চোখের কথা

14b.14 সারাংশ

14b.15 প্রশ্নাবলি

14.a.1প্রস্তাবনা

এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য বিষয় হোল পদার্থবিদ্যার অন্তর্গত আলোক শাখার এক উপশাখা-দৃষ্টি (VISION)বা বীক্ষণ। এই উপশাখায় ব্যবহৃত প্রধানতম ও সূক্ষ্মতম যন্ত্র হোল চক্ষু ইন্দ্রিয় (eye)। অন্যান্য ইন্দ্রিয় যেমন জীবকে তার বহির্জগৎ সম্পর্কে অভিজ্ঞ করে তোলে, তেমনি এই বিশেষ ইন্দ্রিয় চোখও দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে দৃশ্যবস্তুর রূপ, বর্ণ, আকার, গতিশীলতা ও তার আপেক্ষিক দূরত্ব সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য জুগিয়ে দর্শককে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। তাই যে কোন ইন্দ্রিয় ঘটিত প্রতিবন্ধকতার চেয়ে দৃষ্টিহীনতা বা অন্ধত্ব (blindness) প্রাণীদের ক্ষেত্রে অনেক বেশি অসুবিধা বা অক্ষমতার সৃষ্টি করে।

দৃষ্টি বা বীক্ষণের আলোচনার সময় সাধারণ বিজ্ঞানের অপর এক শাখা শারীরবিজ্ঞানের (Physiology) সাহায্য প্রাসঙ্গিকভাবে এত ঘনঘন নিতে হয়, যার ফলে এই উপশাখাকে শুধুমাত্র পদার্থ বিজ্ঞানে সীমাবদ্ধ না রেখে বৃহত্তরভাবে শারীর বিজ্ঞানীয় দৃষ্টিবিজ্ঞান (Physiological vision) বলাটা বোধহয় আমাদের পক্ষে অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে।

উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়ে আমরা চোখ সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবো।

অন্যসব প্রাণীদের মতো স্তন্যপায়ী জীবের চোখ হোল প্রকৃতির সৃষ্টি এক অত্যাশ্চর্য আলোক যন্ত্র — যা মানুষের তৈরি সব রকম যন্ত্র অপেক্ষা অনেক বেশি জটিল ও বহুমুখী।

চোখের সামনে কোনো বস্তু থাকলে অক্ষিপটে তার খর্ব, অবশীর্ষ প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয়। বস্তু থেকে নিঃসৃত আলোক রশ্মি অক্ষিপটে শোষিত হয়ে তাপীয়, রাসায়নিক ও তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং স্নায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি করে। সেই স্নায়ু প্রবাহ দর্শন স্নায়ুর মাধ্যমে প্রাণীর পশ্চাদ্ মস্তিষ্কের দৃষ্টি অঞ্চলে প্রেরিত হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত কিছু জটিল ক্রিয়া-কলাপের ফলে প্রাণীরা দৃশ্যবস্তুর সমশীর্ষ, খর্ব ও অবিকল প্রতিরূপ দেখতে পায়।

আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা এখানে স্তন্যপায়ী শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত সবচেয়ে বুদ্ধিমান জীব মানুষের চোখ নিয়ে আলোচনা করবো। — কারন, মানুষের চোখ সবচেয়ে সুগঠিত এবং তার সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতাও প্রচুর। তার চোখের গঠন, সেই চোখে সে কিভাবে দেখে? সেই দেখা আলোকে বা অন্ধকারে কেমন হয়? কিভাবে সে বর্ণবিচার করে? দৃষ্টি-যন্ত্র হিসাবে চোখের ত্রুটিগুলি কি কি? কিভাবে সেই ত্রুটিগুলির প্রতিকার করা হয়? এবং সবশেষে নিম্ন বা অনুন্নত শ্রেণীর প্রাণীদের চোখের গঠনের কথাও এই আলোচনায় থাকবে।

14a.2 ক্যামেরা ও চোখের তুলনা

প্রাণীদের চোখ হোল প্রাকৃতিক স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা বিশেষ। মানুষের তৈরি ক্যামেরা যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় ক্যামেরার মতো চোখেও রয়েছে কেলাসাকার লেন্স ব্যবস্থা। (crystalline lens)

লেন্স ধারকের (lens holder) মতো চোখেও রয়েছে প্রলম্বিত বন্ধনী (suspensory ligaments)। এই বন্ধনী চোখের কেলাসাকার জৈব লেন্সকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে। চক্ষুমণির (pupil)-র মতো পরিবর্তনযোগ্য রন্ধ্রপথ, সাটারের মতো কণীনিকা (IRIS) এবং ক্যামেরার চিত্রগ্রাহী প্লেটের মতো চোখেও রয়েছে এক ধরনের আলোক সংবেদী পর্দা বা অক্ষিপট (Retina)। এতে রয়েছে পুনঃ পুনঃ ব্যবহারযোগ্য এক অভিনব, প্রাকৃতিক, স্বয়ংক্রিয় পুনর্নবীকরণের ব্যবস্থা যার ফলে একই পটকে বারংবার অবিকৃতভাবে ব্যবহার করা যায়। প্লেট থেকে আলোকচিত্রকে পরিস্ফুট করার জন্য যেমন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়, অক্ষিপটে শোষিত আলোক শক্তির দ্বারা আলোক রাসায়নিক ক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে দৃশ্যবস্তুর প্রতিরূপও তেমনি অক্ষিপটে ফুটে ওঠে।

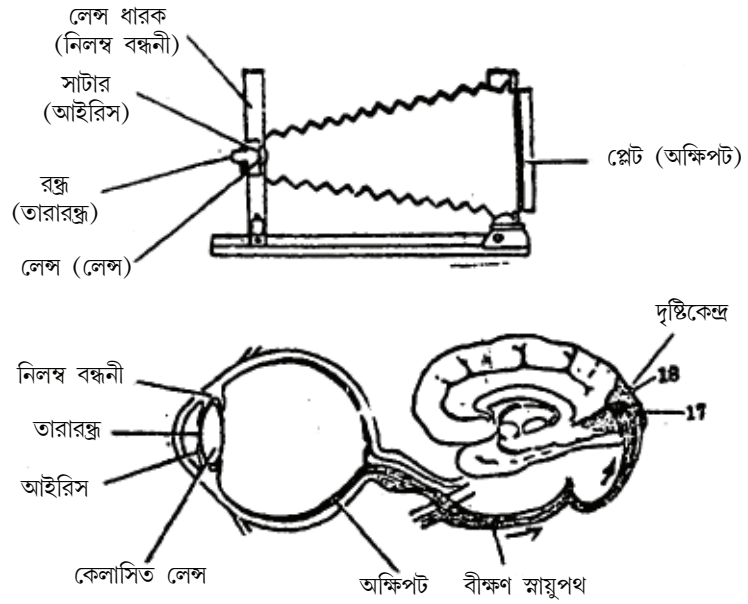

চিত্র 14.1 : প্রস্থচ্ছেদে ক্যামেরা ও মানুষের চোখ।

14a.3 চোখের গঠন (anatomy of eye)

পাশের ছবিতে মানুষের ডান অক্ষিগোলকের প্রায় পূর্ণ আকারের একটি অনুভূমিক ছেদ দেখানো হয়েছে। অক্ষিগোলক (eye ball) হোল প্রায় 1" ব্যাসের গোলকীয় বস্তু। কয়েকটি মাংসপেশির সাহায্যে অক্ষিকোটরের (eye socket) সঙ্গে এটি এমনভাবে আটকানো থাকে যাতে সে বিভিন্ন দিকে সহজেই ঘুরতে পারে। অক্ষিগোলকের প্রাচীর তিনটি সমকেন্দ্রিক স্তরে বিভক্ত 1) সবচেয়ে বাইরে তন্তুময় স্তর শ্বেতমন্ডল (Sclera) , 2) মাঝে রক্তনালিকাযুক্ত স্তর কৃষ্ণমন্ডল (Choroid) এবং 3) সব চোখের ভিতরের স্তর হল অক্ষিপট (Retina)।

(1) শ্বেতমন্ডল (Sclera) হোল অক্ষিগোলকের সর্ব বহিঃস্থ আবরণ। এটি একটি দৃঢ়, অস্বচ্ছ, সাদা পর্দা দিয়ে তৈরি।

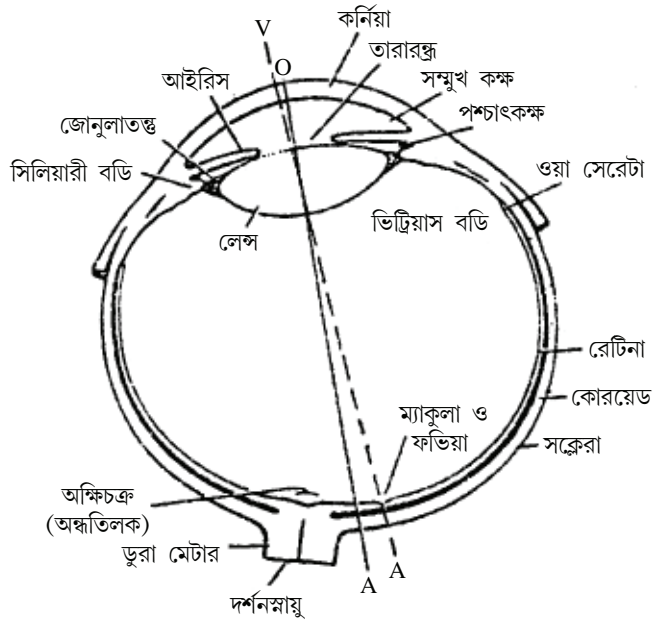

চিত্র 14.2 : মানুষের দক্ষিণ চোখের মধ্যরেখা বরাবর ছেদ। VA–বীজণঅক্ষ। OA–আলোকঅক্ষ।

বাইরের আঘাত থেকে চোখের কোমল অংশকে রক্ষা করা হোল এর কাজ।

শ্বেতমন্ডলের সামনের অংশের নাম অচ্ছোদপটল (Cornea)। অচ্ছোদপটলের বেধ (Thickness) প্রায় 0.5 মিমি এবং তার সম্মুখতলের ব্যাসার্ধ প্রায় 7.8 মি.মি.। সাধারণভাবে অক্ষিগোলকের গোলীয় আকৃতি বজায় রাখার জন্য ভিতর থেকে 2 বা 3 সেমি উচ্চ পারদস্তম্ভের চাপের সমান এক আভ্যন্তরীণ চাপের ব্যবস্থা রয়েছে।

(2) **কৃষ্ণমন্ডল** (Choroid) শ্বেতমন্ডলের ভিতরের গায়ে গাঢ় কালো রঙের আস্তরণ হোল কৃষ্ণমন্ডল। এই কালো রঙের জন্য চোখের ভিতরে অবাঞ্ছিত অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হয় না। এই কৃষ্ণমন্ডলের সামনের অংশ চোখের সামনে এসে মধ্যছিদ্রযুক্ত গোলাকার প্রায় স্বচ্ছ রঙিন পর্দায় রূপান্তরিত হয়। এই রঙিন পর্দাকে বলা হয় চক্ষুতারকা (IRIS) এবং মধ্যছিদ্রকে বলা হয় তারারন্ধ্র (Pupil)। তারারন্ধ্র সহ চক্ষুতারকা অচ্ছোদপটলের ঠিক নিচে থাকে। চক্ষু বা তারা কণীনিকার রং সাধারণত হাল্কা নীল, গাঢ় বাদামী বা কালো রঙের হয়। সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে একজনের বুড়ো আঙ্গুলের টিপছাপ যেমন অপরের টিপছাপের সঙ্গে মেলে না কিংবা একটা জেব্রার গায়ের ডোরা দাগ যেমন অন্য জেব্রার ডোরা দাগের চেয়ে ভিন্ন, ঠিক তেমনি চক্ষুতারার রং, বিস্তৃতি ও গঠন প্রত্যেক মানুষের চোখের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। এতে মেলানিন নামে এক ধরনের রঞ্জক পদার্থ থাকে যার কাজ হোল চক্ষুতারার উপরে পড়া সবটুকু আলোকেই শোষণ করে

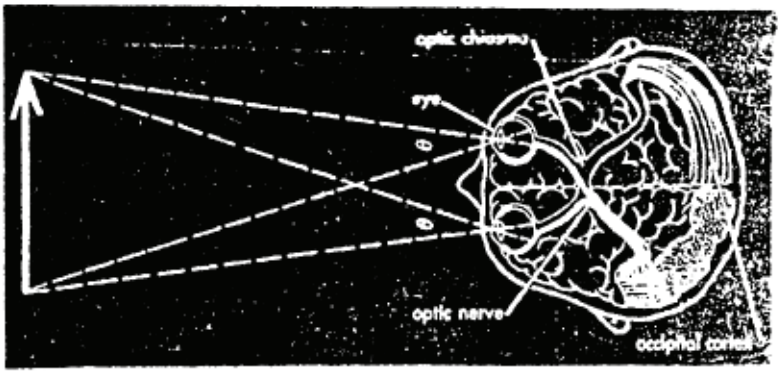

Diagram showing the eyes and visual projection system

চিত্র 14.3

নেওয়া। ফলে চক্ষুতারার বিস্তৃত অংশ থেকে আপতিত আলোর কোণ প্রতিফলন না হওয়ায় চক্ষুতারার রং এত গাঢ়! চোখে কি পরিমাণ আলো ঢুকবে চক্ষুতারকা স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা' নিয়ন্ত্রণ করে। তীব্র আলোকে তারারন্ধ্রের ব্যাস কমে 2 মিলিমিটার হলেও অন্ধকারে বা কম আলোয় বেশি করে আলো নেবার জন্য তা' বেড়ে প্রায় 4 মিমির মতো হয়।

কৃষ্ণমন্ডলের পিছনের অংশের সঙ্গে কিছু অপ্রসারণীয়, প্রলম্বিত সন্ধিবন্ধনী রয়েছে (inelastic suspensory ligamentt) যার সাহায্যে কেলাসাকার (crystalline) চক্ষু লেন্স (eye lens) আটকানো থাকে।

(3) **অক্ষিপট** (Retina)

অক্ষি গোলকের পিছনের অংশে একেবারে ভিতরের দিকে প্রায় সমস্ত জায়গা জুড়ে হাল্কা গোলাপী রঙের আলোকগ্রাহী পর্দা হোল অক্ষিপট। এতে রয়েছে দন্ড (rod) এবং শংকু (cone) নামে দু-রকমের অজস্র আলোকগ্রাহী স্নায়ুপ্রান্ত। সরু সূতার মতো এদের দিয়ে তৈরি এক জটিল নক্সা সারা রেটিনা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। দৃশ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব অক্ষিপটেই গঠিত হয়। গোটা অক্ষিপট দশটি স্তরে বিন্যস্ত। অক্ষিপটের ঠিক নিচের স্তরটি হোল কৃষ্ণমন্ডল — এতে রয়েছে অসংখ্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রক্তজালিকা (blood vessels)। এর পরেই রয়েছে পরপর 7 টি স্নায়ুময় স্তর। বাকি দুটি হোল স্নায়ুময় স্তর এবং কৃষ্ণমন্ডলের সীমা নির্দেশক স্তর। অক্ষিপটে আলোকসুবেদী দন্ড এবং শংকু গ্রাহক কোষের মোট সংখ্যা প্রায় 21 মিলিয়নের মতো।

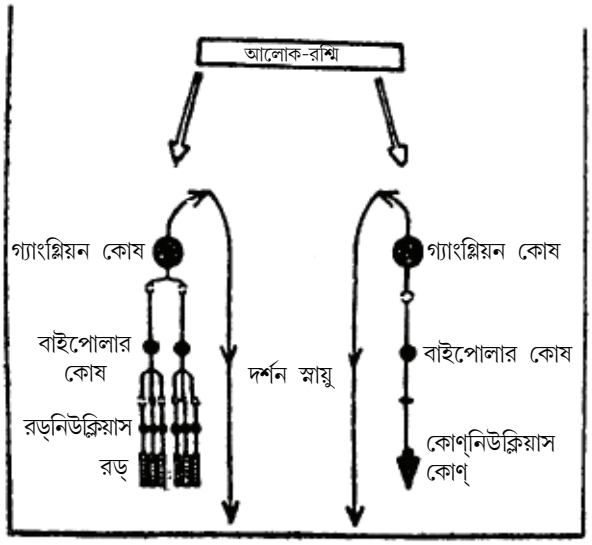

চিত্র 14.4 : রেটিনাতে নিহিত স্নায়ুউপাদান। আপতিত রশ্মিকে গ্যাংগ্লিয়ন কোষ বাইপোলার কোষের ভর অতিক্রম করে রড ও কোণের গ্রাহক স্তরে পৌঁছতে হয়।

তারা আলোক সংকেত গ্রহণ করে দর্শন-স্নায়ুসূত্রের (optic nerves) সাহায্যে গুরু মস্তিষ্কের দৃষ্টি অঞ্চলে পাঠায়। দন্ড কোষের আকার লম্বাটে । তার ডগায় রয়েছে রডোপসিন বা ভিসুয়াল পার্পল (visual purple) নামে গাঢ় রক্তবর্ণের এক ধরনের ক্রোমো প্রোটিন। তার উপর আলো পড়লে আলোক রাসায়নিক ক্রিয়ায় রক্তবর্ণের ভিসুয়াল পার্পল ভেঙে বিবর্ণ হতে থাকে, ফলে দর্শন উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। দন্ডকোষ ক্ষীণ আলোক সংবেদী অর্থাৎ ক্ষীণ আলোকে দন্ডকোষ দেখতে সাহায্য করে, তীব্র আলোতে সেগুলি অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। অন্যদিকে শংকুকোষ তীব্র আলোতে বস্তুকে দেখতে সাহায্য করে। বস্তুর আকারের খুঁটিনাটি ও রঙ সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণার সৃষ্টি করে। 3

মিলিয়নের মতো শংকুকোষ, প্রায় 18 মিলিয়নের মতো দন্ডকোষ এবং প্রায় 1 মিলিয়নের মতো দর্শন স্নায়ু সূত্র, কিছু কিছু শর্তে পরস্পরের সঙ্গে কাটাকুটি করে এক জটিল বুনুনি দিয়ে সারা অক্ষিপটকে ছেয়ে ফেললেও ক্ষীণ আলোক নিঃসরণকারী কোনো বিস্তৃত উৎস থেকে আলো এসে অক্ষিপটে পড়লে, তখন গোটা পর্দাই একটি সংস্থা হিসাবে কাজ করে তাকে 'দেখতে' থাকে।

অক্ষিপটের মাঝখানে 2 মিলিমিটার ব্যাসের একটি অংশ কিছুটা চাপা, তাকে পীতবিন্দু (Macula বা Yellow Spot) বলে। ম্যাকুলার কেন্দ্রে 0.3 মি.মি. ব্যাস বিশিষ্ট আরও একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ রয়েছে তাকে বলা হয় ফোভিয়া সেন্ট্রালিস (Fovea Centralis)। এই অংশটি অক্ষিপটের সর্বাপেক্ষা সুবেদী অংশ ম্যাকুলার সুবেদীতম জায়গা। ম্যাকুলা অঞ্চলে শুধু শংকুকোষই ঘন সন্নিবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। ফোভিয়া থেকে যতদূরে যাওয়া যাবে ততই শংকু কোষের পরিমাণ কমতে থাকবে। পাল্লা দিয়ে বাড়তে শুরু করবে দন্ডকোষ। অবশেষে অক্ষিপটের প্রান্তদেশে শুধুই দন্ডকোষ।

অক্ষিপটের যে জায়গা দিয়ে দর্শন স্নায়ুসূত্রগুচ্ছ চোখের মধ্যে ঢুকেছে, সেখানে দন্ড বা শংকু কোষের কোনোটিই উপস্থিত না থাকায়, ওই জায়গায় আলো পড়লে কোন দর্শনানুভূতি হয় না। সেজন্য এই জায়গাটিকে বলা হয় অন্ধবিন্দু (blind spot)। এই অন্ধবিন্দুর জন্য দৃষ্টিক্ষেত্রের (field of view) অনুভূমিক দিকে প্রায় 6° এবং উল্লম্ব দিকে প্রায় 8° পরিমিত স্থানকে চোখ দেখতে পায় না।

যাতে আপতিত আলোক-রশ্মির পথে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করতে না পারে, সেজন্য টেলিভিশনে ব্যবহৃত আলোক কোষের জটিল বুনুনি (mosaic) থেকে সংযোগ-তার টেলিভিশন যন্ত্রের পিছন দিকে আপতিত আলোক রশ্মির বিপরীতে যায়। চোখের ক্ষেত্রে এর বিপরীত ঘটনাটি ঘটে। আলোক সংবেদী দন্ড ও শংকু কোষের খোলা প্রান্তগুলি আপতিত আলোক রশ্মির দিক বরাবর বাইরে যায়। স্নায়ুসূত্রগুলি এত স্বচ্ছ!

কেলাসাকার চক্ষুলেন্স (crystalline eye lens)

তারারন্ধ্রের (pupil) এর পিছনে অবস্থিত কেলাসাকার চক্ষুলেন্স চোখের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। উভোত্তল (bi convex) এই প্রাকৃতিক লেন্সটি জেলির মতো নরম, স্বচ্ছ, সংকোচনশীল তন্তুময় স্তর দিয়ে তৈরি। এর সামনের এবং পিছনের বক্রতলের ব্যাসার্ধ যথাক্রমে 10 মিমি এবং 6 মিমি। অক্ষ বরাবর এটির বেধ প্রায় 3.6 মিমি। রোমশ মাংসপেশি দিয়ে গঠিত পেশিবন্ধনী লেন্সকে একদিকে যেমন অক্ষিগোলকের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আটকে রাখে অপরদিকে প্রয়োজনে লেন্সের বক্রতারও পরিবর্তন ঘটায়। স্তরগুলির প্রতিসরাংক বাইরের দিক থেকে ভিতরের দিকে ক্রমশ বাড়তে বাড়তে একেবারে মাঝখানে 1.42 এ দাঁড়ায়। অর্থাৎ লেন্সের মধ্যাংশ কঠিন হলেও বাইরের দিকে ক্রমশ কোমল হতে থাকে। প্রান্তদেশের চাইতে কেন্দ্রীয় অংশের প্রতিসরণ ক্ষমতা বেশি হওয়ায় লেন্সটিতে গোলীয় অপেরন ত্রুটি (spherical abenation) সংশোধিত হয়। চোখের প্রতিসরণ ক্ষমতা প্রধানত চক্ষু লেন্সের জন্য হলেও (+500), তাতে কর্ণিয়ার অবদানও আছে (+39D)।

জলীয় নেত্ররস (aqueous humour) এবং কাচীয় নেত্ররস (vitreous humour) কর্ণিয়া (অচ্ছোদপটল) ও লেন্সের মধ্যে অবস্থিত তথাকথিত অগ্রকক্ষে (anterior chamber) জলের মত স্বচ্ছ "জলীয় নেত্ররস" রয়েছে, আর লেন্স ও অক্ষিপটের (রেটিনা) মধ্যে অবস্থিত (posterior chamber) পশ্চাদ্‌কক্ষে স্বচ্ছ জেলির মতো "কাচীয় নেত্ররস" রয়েছে। এদের প্রতিসরাংক প্রায় 1.336। এদের কাজ হলো আলোক প্রতিসরণে অংশগ্রহণ করা এবং লেন্সকে যথা সম্ভব সুরক্ষা দেওয়া।

চোখের কর্ণিয়া (অচ্ছোদপটল) জলীয় নেত্ররস, কাচীয় নেত্ররস ও তাদের মাঝখানে থাকা লেন্স একত্রে অভিসারী (convex) লেন্সের মতো কাজ করে।

বীক্ষণ অক্ষ (Visual axis) ও আলোক অক্ষ (optic axis)

চক্ষুতারকা ও ফোভিয়া সেন্ট্রালিসের মধ্যবিন্দু সংযোগকারী সরলরেখাকে বীক্ষণ অক্ষ এবং কর্ণিয়া ও অক্ষিলেন্সের কেন্দ্রবিন্দু সংযোজী সরল রেখাকে আলোক অক্ষ বলা হয়। এরা পরস্পর 5° থেকে 7° কোণে ছেদ করে।

কেলাসাকার চক্ষুলেন্সের অসমসত্ত্ব গঠনের জন্য চোখের আলোকতন্ত্র (optical system) বেশ জটিল। যদি এমন কোন লেন্স তৈরি করা হোত যার বাইরের স্তরের প্রতিসরাংক 1.36 থেকে বাড়তে বাড়তে একেবারে মাঝখানে 1.406 এর মতো হোত। এবং কর্ণিয়ার (অচ্ছোদপটল) পরিবর্তে বাতাস ও জলীয় নেত্ররসের মাঝখানে এক প্রতিসরণীয় মাধ্যম ও চক্ষু লেন্সের পরিবর্তে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসহ একটি সাধারণ লেন্স-সমন্বয় তৈরি করতে পারলে তা প্রকৃত চোখের সমধর্মী হোত।

মাধ্যম	বক্রতা ব্যাসার্ধ	প্রতিসরাঙ্ক (প্রায়)	ক্ষমতা ডায়োপটার এককে	মন্তব্য
অচ্ছোদপটল বা কর্ণিয়া	r_1=0.78 cm d_1=0.36 cm	1.38	+39	প্রতিসারকতলের প্রতিসরণ ক্ষমতাকে ডায়োপটার (dioptre) এককে প্রকাশ করাহয়। যে উত্তল লেন্স সমান্তরাল আলোকরশ্মিকে1মিটার ফোকাস দূরত্বে কেন্দ্রীভূত করতে পারে তার প্রতিসরণ ক্ষমতাকে (+)1D বলে অর্থাৎ 1D = (–) 1 মিটারে প্রকাশিত কোন লেন্সের ফোকাস দূরত্ব
চক্ষুলেন্স	r_2=1.00 cm r_3=-0.60 cm. d_2=0.36 cm	1.413	+50	
বাতাস	—	1.00	—	
জলীয় নেত্ররস		1.336	– 05	
কাচীয় নেত্ররস		1.34	+ 05	

অক্ষিগোলকের বিভিন্ন প্রতিসরণ ক্ষমতা ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার দরুন বর্ণ-অপেরন (chromatic abervation) অংশতঃ সংশোধিত হয়। বর্ণ অপেরণের বাকি অংশটুকু মানুষের মস্তিষ্ক নাকচ করে দেয়।

14.a.4 দ্বিনেত্র দৃষ্টি ও তার সুবিধা (Stereoscopic visions & its advantages)

স্তন্যপায়ী প্রানীদের চোখ হোল একাধারে চেষ্টীয় (motor) এবং সংজ্ঞাবহ (sensory) অঙ্গের সমাহার। অর্থাৎ কোন বস্তুকে দেখতে হলে চোখ সরাসরি তার দিকে ঘুরে যায়। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দুটো চোখ, দুটো দর্শন স্নায়ু, এবং মস্তিষ্কে দুটো দৃষ্টিকেন্দ্র থাকলেও তারা একটি মাত্র বস্তুকে একসঙ্গেই দেখতে পায়। দুটি চোখ ব্যবহার করে কোন প্রাণীর একটিমাত্র বস্তু-দর্শনের ঘটনাকে বলা হয় দ্বিনেত্র দর্শন (binocular vision)

লক্ষ্যবস্তু থেকে নিঃসৃত আলোক রশ্মি দুটি চোখের অক্ষিপটে যে স্নায়ু প্রবাহের সৃষ্টি করে তা' স্বতঃস্ফূর্তভাবে দর্শকের পশ্চাদ্ গুরুমস্তিষ্কে অবস্থিত দৃষ্টিকেন্দ্রে একটিমাত্র প্রতিবিম্বে একীভূত হয়।

এই দ্বিনেত্র দর্শনের প্রাক্ শর্ত হোল

1) দুটো বীক্ষণ ক্ষেত্রকে (field of view) আবশ্যিকভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে হবে।
2) উভয় অক্ষিপটেই প্রায় সদৃশ প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হতে হবে।
3) উভয় অক্ষিপটেই অনুরূপ বিন্দুর (corresponding points) উপস্থিতি একান্ত বাঞ্ছনীয়।
4) উভয় চোখের অক্ষিপেশির (ocular muscle) এমনভাবে সংকুচিত হওয়া দরকার যাতে দুটো অক্ষিগোলকই নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে নিবদ্ধ হতে পারে।

উপরের শর্তগুলি পালিত হলে তবেই একমাত্র দর্শকের দ্বিনেত্র দর্শন হয়।

দ্বিনেত্র দর্শনের সুবিধা :

(1) লক্ষ্যবস্তুর সাপেক্ষে দর্শকের দুটি চোখের অবস্থান এক না হওয়ায় তাদের মধ্যে কিছুটা ব্যবধান থাকে। সেজন্য প্রতিবিম্ব দুটি সর্বাংশে অভিন্ন হয় না। কারণ ডান চোখ বস্তুর ডান পাশ এবং বাম চোখ বস্তুর বামপাশ দেখে। ফলে মস্তিষ্কে বিম্বদুটির একীকরণের সময় এক চোখের ত্রুটিকে অপর চোখ সংশোধন করে দেয়।

(2) উভয় চোখের বীক্ষণ ক্ষেত্র একটি চোখের বীক্ষণ ক্ষেত্রের চেয়ে অধিকতর বিস্তৃত হয়।

(3) এ জাতীয় দর্শনের দ্বারা লক্ষ্যবস্তুর আকৃতি, দূরত্ব, ত্রিমাত্রিক গভীরতা, বর্ণ সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ণ করা সম্ভবপর হয়।

14.a.5 উপযোজন (accommodation)

দূরের বা কাজের বস্তুকে অক্ষিপটে ফোকাস করে দৃষ্টি গোচরে আনার ক্ষমতাকে চোখের উপযোজন বলে। এই প্রক্রিয়ায় সিলিয়ারী মাংসপেশির সাহায্যে চক্ষু লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য প্রয়োজনমত পরিবর্তিত হয় এবং অক্ষিপটে লক্ষ্যবস্তুর সদ্‌বিম্ব গঠিত হয়। চশমা হোল উপযোজন প্রক্রিয়ার অন্যতম উপকরণ। উপযোজন ব্যাখ্যা করার সময় আমরা নিচের বিষয়গুলি সম্পর্কে বিশদভাবে জানবো। নিকট বিন্দু (Near Point) চোখকে ক্লান্ত না করে উপযোজনের সাহায্যে কিংবা সাহায্য না নিয়ে নিকটতম যে অবস্থানে কোনো বস্তুকে রাখলে চোখ স্পষ্টভাবে

দেখতে পায়, তাকে নিকট বিন্দু বলে। চোখ থেকে নিকট বিন্দুর দূরত্বকে স্পষ্টদর্শনের ন্যূনতম দূরত্ব (least distance of distinct vision) বলা হয়। এই দূরত্বের পরিমাণ স্বাভাবিক চোখের ক্ষেত্রে 25 cm বা 10 ইঞ্চি।

দূর বিন্দু (Far Point) বিনা উপযোজনে চোখ সর্বাপেক্ষা দূরত্বে যে বিন্দুতে লক্ষ্যবস্তুকে স্পষ্টভাবে দেখতে পায়, চোখ থেকে সেই বিন্দুর দূরত্বই হোল চোখের দূরবিন্দু। সুস্থ চোখের কাছে এই দূর বিন্দু অসীমে অবস্থিত।

দৃষ্টি সীমা (Range of the eye) নিকটবিন্দু থেকে দূরবিন্দু পর্যন্ত দূরত্ব হোল দৃষ্টিসীমা। এই সীমার মধ্যে লক্ষ্যবস্তু যেখানেই থাকুক না কেন স্বাভাবিক চোখ স্বয়ংক্রিয়ভাবে চক্ষুলেন্সের ফোকাস পরিবর্তিত করে তাকে স্পষ্ট দেখতে পায়।

দৃষ্টি ক্ষেত্র (field of view) = যতটুকু জায়গা জুড়ে চোখ অভিনিবেশ সহকারে দেখে, তাই হোল দৃষ্টি ক্ষেত্র।

14.a.6 অভিযোজন (adaptation)

কোনো বস্তুকে দেখবার সময় মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চক্ষুছিদ্রের ব্যাস ক্ষীণ বা তীব্র আলোকে যথাক্রমে বড় বা ছোট করে প্রয়োজনমত চোখের ভিতরে বেশি বা কম আলো প্রবেশ করায়। চোখের এই ধরনের সহজাত ক্ষমতাকে অভিযোজন বলা হয়। চোখের পাতা বাঁচিয়ে চোখের খুব কাছে একটা মোমবাতির শিখা নিয়ে গেলে, কিংবা দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলে চোখের ছিদ্র কেমন ছোট বা বড় হয়ে যায় পাঠক তা নিজে করে দেখতে পারেন।

14.a.7 চোখের ত্রুটি ও তার প্রতিকার (Defects of vision and its rectification)

স্বাভাবিক চোখের দৃষ্টিসীমা 25 cm থেকে অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত। যদি কোনো চোখের দৃষ্টি-সীমা এর থেকে কম হয়, তবে সেই চোখকে ত্রুটিযুক্ত হিসাবে গণ্য করা হবে।

এই ত্রুটি প্রধানত:

(1) স্বল্প দৃষ্টি (myopia)

(2) দীর্ঘ দৃষ্টি (hypermetropia)

(3) ক্ষীণ দৃষ্টি (presybopia)

(4) বিষম দৃষ্টি (astigmatism)

(5) ছানি (cataract)

(6) অচ্ছোদ স্ফীতি (keratoconus)

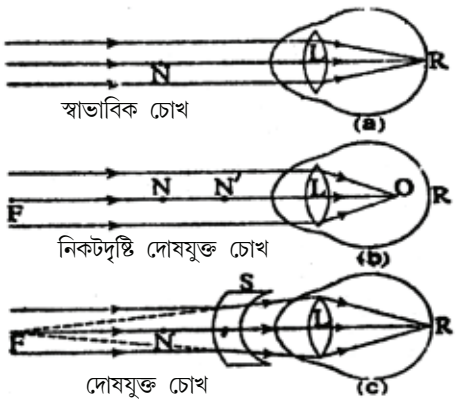

চিত্র 14.4 : চোখের নিকট-দৃষ্টি দোষ

হ্রস্বদৃষ্টি : হ্রস্বদৃষ্টি সম্পন্ন চোখের ক্ষেত্রে অসীমে অবস্থিত লক্ষ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব অক্ষিপটে গঠিত না হয়ে চোখ থেকে সীমিত দূরত্বে গঠিত হয় ফলে এই ধরনের ত্রুটিযুক্ত চোখ দূরের জিনিসকে ঝাপসা দেখে। শুধু তাই নয়, চোখের

নিকট বিন্দুর দূরত্বও স্বাভাবিকের চেয়ে কম হয়।

ত্রুটির কারণ : (1) কোনো কারণে অক্ষিগোলকের আকার স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে গেলে বা

(2) চক্ষু লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য স্বাভাবিকের চেয়ে কম হলে অথবা

দুইই হলে, এই ধরনের ত্রুটি চোখে দেখা যায়।

প্রতিকার : অসীমে অবস্থিত লক্ষ্যবস্তু থেকে আগত সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ ত্রুটিযুক্ত চক্ষুলেন্সের দ্বারা প্রতিসৃত হয়ে অক্ষিপটের সামনে P বিন্দুতে প্রতিবিম্ব গঠন করে। এই ত্রুটি দূর করতে হলে চোখের সামনে উপযুক্ত ফোকাস দৈর্ঘ্যের অবতল লেন্স L_1 রাখা দরকার। এক্ষেত্রে লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য ত্রুটিযুক্ত চোখের দূরবিন্দুর সমান হওয়া উচিত। তখন দূরাগত সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ লেন্সের দ্বারা প্রতিসরণের পর F বিন্দু থেকে আসছে বলে মনে হবে। F বিন্দুটি চোখের দূরবিন্দু বলে চক্ষু লেন্সে প্রতিসরণের পর প্রতিবিম্ব অক্ষিপটেই গঠিত হবে।

গণনা

ধরি d = চোখ থেকে দূরবিন্দুর দূরত্ব=বিম্ব দূরত্ব (v)

$f = L_1$ অবতল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব।

এক্ষেত্রে বস্তু দূরত্ব $u=\alpha$

লেন্স সমীকরণ প্রয়োগ করে

$$\therefore \frac{1}{f}=\frac{1}{v}-\frac{1}{u}=\frac{1}{d}-\frac{1}{\alpha}=\frac{1}{d} \quad \therefore f = d$$

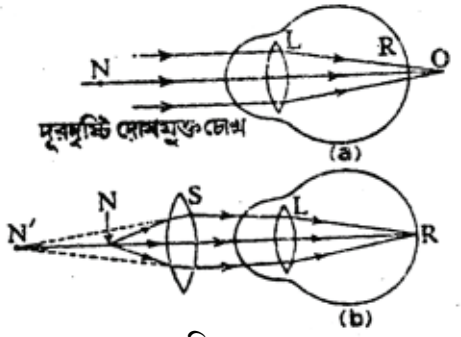

চিত্র **14.6**

∴অবতল লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য চোখের দূরবিন্দুর দূরত্ব।

দীর্ঘদৃষ্টি : বিভিন্ন কারণে কোনো কোনো দর্শকের অক্ষিগোলকের আকার ছোট হয়ে যায় বা চক্ষুলেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য বেড়ে যায়, ফলে ওই দর্শক দূরের বস্তু দেখতে পেলেও, কাছের বস্তুকে ভালো দেখতে পায় না। চোখের এই ত্রুটিকে বলা হয় **দীর্ঘদৃষ্টি**। এই ত্রুটির জন্য ত্রুটিযুক্ত চোখের নিকটবিন্দু স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্ব 25 সেমির অপেক্ষা বেশি দূরত্বে থাকবে। এই ত্রুটি থেকে প্রতিকারের জন্য চোখের সামনে উপযুক্ত ফোকাস দৈর্ঘ্যের **উত্তল লেন্স** রাখতে হবে।

প্রতিকার ঃ ধরা যাক N বিন্দু স্বাভাবিক সুস্থ চোখের নিকট বিন্দু। দীর্ঘদৃষ্টি ত্রুটির জন্য N বিন্দুতে অবস্থিত কোনো বস্তুর প্রতিবিম্ব অক্ষিপটে গঠিত না হয়ে তার পিছনে গঠিত হবে। তাই N বিন্দুতে অবস্থিত বস্তুকে দীর্ঘদৃষ্টি ত্রুটিযুক্ত চোখ ঝাপসা দেখবে। এক্ষেত্রে নিকট বিন্দু N এ না থেকে N' বিন্দুতে থাকে।

উপযুক্ত ফোকাস দৈর্ঘ্যের একটি উত্তল লেন্স এই ধরনের ত্রুটিযুক্ত চোখের সামনে রাখলে N বিন্দু থেকে আগত রশ্মিগুচ্ছ উত্তল লেন্সে প্রতিসরণের পর N' বিন্দু থেকে আসছে বলে মনে হবে এবং প্রতিবিম্ব অক্ষিপটে

গঠিত হবে। সুতরাং N বস্তু-বিন্দু হলে পরিবর্তিত ক্ষেত্রে N' বিন্দু হবে উত্তল লেন্স দ্বারা গঠিত অসদ্‌বিম্ব।

গণনা

যদি D = সুস্থ চোখের স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্ব হয়

এবং d = ত্রুটিপূর্ণ চোখের স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্ব হয়

এবং f = ব্যবহৃত উত্তল লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য হয়

তবে লেন্স সমীকরণ প্রয়োগ করে লিখতে পারি

$$\frac{1}{d}-\frac{1}{D}=\frac{1}{f} \quad \therefore \quad \frac{1}{f}=\frac{1}{d}-\frac{1}{25} \text{ বা } f=\left(\frac{25d}{25-d}\right) \text{ একক}$$

যেহেতু d>25, সুতরাং f ঋনাত্মক। তাই এই ত্রুটির জন্য উপযুক্ত f দৈর্ঘের **উত্তল-লেন্স** ব্যবহার করতে হবে।

ক্ষীণদৃষ্টি বা চালশে (Presybopia)

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখের মাংসপেশি শিথিল হয় এবং অক্ষিলেন্সও শক্ত হয়ে যায়। ফলে বয়স্ক চোখের স্বাভাবিক উপযোজন ক্ষমতা কমে যায়। তখন স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্বের পরিমাণ বেড়ে যায়। সুতরাং এই ত্রুটি দীর্ঘ দৃষ্টি ত্রুটির অনুরূপ। ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন চোখ বিনা শ্রান্তিতে দূরের জিনিস অপেক্ষাকৃত ভালো দেখলেও, কাছের জিনিস ভালো দেখে না।

প্রতিকার : এক্ষেত্রে উপযুক্ত ফোকাস দৈর্ঘ্যের **বাই ফোকাল লেন্স** ব্যবহার করতে হয়। **বাই ফোকাল লেন্সের** চশমায়, চশমার গোলাকার ফ্রেমের দুই অর্ধে দু ধরনের লেন্স আটকানো থাকে — দূরের জিনিস দেখবার জন্য চশমার উপরের অংশ **অবতল-লেন্স** এবং কাছের জিনিস দেখবার জন্য চশমার নিচের অংশে **উত্তল লেন্স** ব্যবহার করা হয়।

বিষমদৃষ্টি বা নকুলান্ধতা (Astigmatism)

এই ধরনের ত্রুটিযুক্ত চোখ কোনো নির্দিষ্ট সমতলে রাখা দৃশ্যবস্তুর অনুভূমিক এবং উল্লম্বরেখা বা অংশকে একই সঙ্গে স্পষ্টভাবে দেখতে পায় না, কর্ণিয়ার (অচ্ছোদপটলের) কোনো এক তলের বক্রতা অন্য তলের তুলনায় বেশি হলে এই ধরনের ত্রুটি দেখা যায়।

প্রতিকার : দৃষ্টির এই ত্রুটি দূর করার জন্য চশমা হিসেবে এমন এক ধরনের লেন্স ব্যবহার করতে হয় যার একদিকের বক্রতা তার অভিলম্ব দিকের বক্রতার অপেক্ষা বেশি। টরিক লেন্সে (toric) এই ধরনের কৌশল ব্যবহার করে চশমায় লাগানো হয়। এই লেন্সের একটা পিঠ গোলীয় এবং অপর পিঠটি চোঙাকৃতি (cylindrical)।

ছানি (Cataract)

ক্যাটারাক্ট শব্দটির অর্থ হোল জলপ্রপাত। জলপ্রপাতের একদিকে দাঁড়িয়ে কোনো দর্শক তার বিপরীত পাশের দৃশ্যাবলী যেমন অস্পষ্ট দেখে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জলীয় নেত্ররসের দ্বারা সরবরাহ করা জৈবিক পুষ্টির অভাবে চোখের লেন্স অস্বচ্ছ হয়ে পড়ে। যে স্বচ্ছ তন্তুময় স্তর দিয়ে চোখের লেন্স তৈরি সেই স্তরগুলি অস্বচ্ছ হয়ে পড়লে কোনো জিনিসকেই তখন স্পষ্ট দেখা যায় না। একমাত্র **শল্য চিকিৎসার** দ্বারা এ ধরনের ত্রুটি দূর করা সম্ভব।

কর্ণিয়া বা অচ্ছোদপটলের ত্রুটি

কর্ণিয়া বাইরের আঘাত, রাসায়নিক বিক্রিয়া বা অন্য কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে, শল্য চিকিৎসার দ্বারা অসুস্থ কর্ণিয়ার পরিবর্তে প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সুস্থ কর্ণিয়া বসিয়ে এই ধরনের ত্রুটি দূর করা যায়।

অচ্ছোদস্ফীতি বা কেরাটোকোনাস

ক্ষত বা জন্মগত কোনো ত্রুটি থেকে কর্ণিয়া বা অচ্ছোদপটলের তন্তুগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে। অক্ষিগোলকের (eye ball) অভ্যন্তরীণ চাপের ফলে কোনো কোনো অংশ সামনের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আসে। সাধারণভাবে কর্ণিয়ার প্রতিসরণ ক্ষমতা যেখানে 39D এর মতো, সেখানে এই অবস্থায় তা বেড়ে 60 এমন কি 100D হয়ে যায়। ফলে অক্ষিপটে বা রেটিনায় প্রতিবিম্ব নির্মাণ সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়। এই ত্রুটিসম্পন্ন চোখ দৃশ্যবস্তুকে খুবই ঝাপসা দেখে।

প্রতিকার : এ ধরনের চোখে অস্ত্রোপচারের সাহায্যে বা কনট্যাক্ট বা সংলগ্ন লেন্স প্রতিস্থাপন করে এ ধরনের ত্রুটি দূর করা সম্ভব।

চশমা কি বীক্ষণ যন্ত্র ? (Optical instrument)

যে সকল বস্তু বা যন্ত্রের সাহায্যে দেখার ব্যাপারে চোখকে সাহায্য করা হয় তারাই বীক্ষণ যন্ত্র। সে দিক দিয়ে বিচার করলে চশমা বস্তুতই বীক্ষণ যন্ত্র।

14a.8 উদাহরণ

একজন দীর্ঘদৃষ্টি বিশিষ্ট দর্শক 40 cm অপেক্ষা নিকটের লেখা পড়তে পারে না। সে 25 cm দূর থেকে পড়তে চাইলে তার চশমার কাচের ক্ষমতা (power) কত হওয়া উচিত।

এক্ষেত্রে লেন্স ফর্মুলায় ব্যবহৃত চিহ্ন সমূহের প্রচলিত অর্থ ধরে

বিম্ব দূরত্ব v=40cm , বস্তু দূরত্ব u=25cm, ফোকাস দূরত্ব f হলে

$$\frac{1}{f}=\frac{1}{v}-\frac{1}{u}=\frac{1}{40}-\frac{1}{25}=\frac{5-8}{200}=\frac{-3}{200}$$

$\therefore\ f=\frac{-200}{3}$ ক্ষমতা $(P)=-\frac{100}{f}=\frac{100x3}{200}=\frac{3}{2}=1.5D$

এখানে লেন্সটি উত্তল এবং লেন্সের ক্ষমতা ধনাত্মক (+)

(2) কোনো ছাত্রের দৃষ্টিশক্তি ত্রুটিপূর্ণ বলে সে 50cm দূরবর্তী কোনো বস্তুকে সঠিক দেখতে পায় না। কী ধরনের লেন্স ব্যবহার করলে সে দূরের বস্তু স্পষ্ট দেখবে? সেই লেন্সের ক্ষমতা কত ?

আগের সমস্যার মতোই, এক্ষেত্রে $u = \infty$ (অসীম), $v = 50m$ $f=?$

লেন্স ফর্মুলায় এই মান বসিয়ে

$$\frac{1}{f}=\frac{1}{v}-\frac{1}{u} \text{ বা } \frac{1}{f}=\frac{1}{50}-\frac{1}{\alpha}=\frac{1}{50}-D=\frac{1}{50}\ cm$$

$\therefore\ f = +50\ cm$

ফোকাস দৈর্ঘ্য ধনাত্মক বলে ব্যবহৃত লেন্স অবতল, লেন্সের ক্ষমতা ঋনাত্মক (–)। কারণ

$$P=-\frac{100}{f}=-\frac{100}{50}=-2D$$

(3) কোন ব্যক্তির স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্ব (নিকট বিন্দু) 8ft. 16 হইতে দূরে রাখা কোনো বই পড়তে হলে কী ধরনের লেন্সের প্রয়োজন ?

এক্ষেত্রে লোকটির দীর্ঘ-দৃষ্টি জনিত ত্রুটি আছে। $u = 16$ হইতে

$v=8ft=(8x12)$ হইতে $= 96$ হইতে,

লেন্স ফর্মুলায় মান বসিয়ে পাই $\frac{1}{v}-\frac{1}{u}=\frac{1}{f}$ $\therefore\ \frac{1}{f}=\frac{1}{96}-\frac{1}{16}=\frac{-5}{46}$

$\therefore\ f = –19.2$ হইতে

ফোকাস দৈর্ঘ্য ঋনাত্মক হওয়ায় এক্ষেত্রে উত্তল লেন্সের ব্যবহার করতে হবে।

(4) কোনো লোক 50 cm ফোকাস দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট অবতল লেন্সের চশমা ব্যবহার করে 25cm দূরে রাখা বই পড়তে পারেন। চশমা ছাড়া বইটি পড়তে হলে তাঁকে বইটি কত দূরে রাখতে হবে?

প্রশ্নানুসারে $u = 25$ cm, $f = 50$ cm লেন্সের সমীকরণ অনুযায়ী

$$\frac{1}{v}-\frac{1}{u}=\frac{1}{f}$$

$$\therefore \quad v = \frac{1}{\frac{1}{25}+\frac{1}{50}} = \frac{50}{3} = 16.67\text{cm}$$

সুতরাং বইটিকে 16.67 cm দূরে রাখা উচিত।

(5) $\frac{f}{2.8}$ সংখ্যার একটি লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য (focal length) 8 cm হলে তার উন্মেষের (apperture) ব্যাস কত? এই অবস্থায় আলোক প্রক্ষেপ বা আলোকসম্পাত (exposure) কাল 0.005 second হলে $\frac{f}{5.6}$ অবস্থায় আলোক প্রক্ষেপ কাল কত ?

লেন্সের ব্যাস $d = \frac{f}{2.8} = \frac{8}{2.8} = 2.86$ cm

এখন, আমরা জানি আলোক প্রক্ষেপকাল $t \alpha \frac{1}{\left(\frac{f}{n}\right)^2}$

$$\therefore \quad t = \frac{k \cdot}{\left(\frac{f}{n}\right)^2} \qquad k = \text{একটি ধ্রুবক}$$

$$\therefore \quad \frac{f}{5} \qquad \text{..... (I)}$$

$\frac{f}{5.6}$ অনুপাতের ক্ষেত্রে আলোক প্রক্ষেপকাল t_1 sec হলে

$$t_1 = \frac{k}{\left(\frac{f}{5.6}\right)^2} \qquad \text{..... (II)}$$

সমীকরণ (I) এবং (II) থেকে $200 x t_1 = \left(\frac{5.6}{2.8}\right)^2 = 4$

আলোক প্রক্ষেপ তথা আলোক সম্পাত কাল $\therefore\ t = \frac{4}{200} = 0.02\ \text{sec}$

14a.9 সারাংশ

মানুষের চোখ প্রকৃতির সৃষ্ট এক অত্যাশ্চর্য আলোক যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে শুধু উন্নত শ্রেণীর প্রাণীরা নয়, উপরন্তু নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীরাও নিজের চারপাশের জিনিস দেখে পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলে। সকলের চোখ যে মানুষের মতো সুগঠিত তা নয়, নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের কারুর কারুর বিন্দু বা দাগের মতোও দর্শনেন্দ্রিয় আছে।

চোখের সম্মুখে কোনো বস্তু থাকলে অক্ষিপটে দৃশ্যবস্তুর প্রতিরূপের সৃষ্টি হয়।

যে ক্ষমতার জন্য বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত বস্তুকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফোকাসের পরিবর্তন করে চোখ দেখে, সেই ক্ষমতাকে চোখের অভিযোজন বলে।

আবার যে পদ্ধতিতে ত্রুটিপূর্ণ চোখ যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে দূরের বা কাছের জিনিস দেখতে পায়, তাকে চোখের উপযোজন বলে। চোখের ত্রুটি নানা প্রকার (1) হ্রস্ব দৃষ্টি (2) দীর্ঘ দৃষ্টি (3) চালশে বা ক্ষীণ দৃষ্টি (4) বিষম দৃষ্টি। এছাড়াও কর্ণিয়া সংক্রান্ত ত্রুটি চোখে দেখতে পাওয়া যায়।

স্বাভাবিক চোখ বিনা শ্রান্তিতে ও বিনা উপযোজনে সর্বাপেক্ষা কাছে 25cm দূরে আর সবচেয়ে দূরে অসীমে থাকা বস্তুকে দেখতে পায়।

এ দুটি বিন্দুকে স্বাভাবিক চোখের ক্ষেত্রে যথাক্রমে নিকটবিন্দু ও দূরবিন্দু বলে।

14a.10 প্রশ্নাবলি

(1) বীক্ষণ বা দৃষ্টি কি? কোন যন্ত্রের সাহায্যে তা নিষ্পন্ন হয় ?

(2) চোখ কেমন করে দেখে? নিকট ও দূর বিন্দু কি? স্বাভাবিক চোখের দৃষ্টিসীমা কত ?

(3) চোখের সঙ্গে ক্যামেরা তুলনা করলে কোন কোন বিষয়ে ক্যামেরার চেয়ে চোখকে বেশি বা কম দক্ষ বলে মনে হয়?

(4) চোখের বিভিন্ন অংশ ও তাদের কাজ সম্পর্কে যা জানেন তার ভিত্তিতে অক্ষিপটের গঠন এবং তার কাজে তাদের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

(5) চোখের ত্রুটিগুলি কি কি? কিভাবে এই ত্রুটিগুলির প্রতিকার করা যায়?

(6) $\frac{f}{5}$ বলতে কি বোঝেন? আলোকসম্পাতকালের সঙ্গে এই অনুপাতের কি সম্পর্ক?

14b.1 অভিযোজন ক্ষমতা (Adaptability)

আগের অধ্যায়ে বলা হয়েছে চোখের সিলিয়ারি পেশির সহজাত ক্ষমতার সাহায্যে চক্ষুরন্ধ্রের ব্যাস এবং কেলাসাকার

অক্ষিলেন্সের আকৃতি এমনভাবে পরিবর্তিত হয়, যার ফলে অতিরিক্ত অন্য কোনো সাহায্য ছাড়াই **পরিমিত আলোকে, যে কোনো দূরত্বে** অবস্থিত (নিকটবিন্দু 25 সেমি থেকে দূরবিন্দু অসীম দূরত্বের মধ্যে) বস্তুর প্রতিবিম্ব স্বতঃস্ফূর্তভাবে অক্ষিপটেই গঠিত হয়। চোখের এই বিশেষ ক্ষমতাকে **অভিযোজন ক্ষমতা** বলে।

বেড়াল বা নিশাচর প্রাণীর চোখ এমন বিশিষ্টভাবে তৈরি যাতে তারা ন্যূনতম আলোতে বা অন্ধকারে যে কোনো বস্তুকে সহজে দেখতে পায়। এ ধরনের দৃষ্টিকে বলা হয় অন্ধকার বীক্ষণ (Scotopic vision বা dark vision)। আবার মেঠো কাঠবিড়ালী কিংবা পায়রার মতো জীবেরা প্রখর দিনের আলোয় ভালো দেখতে পায়। তাদের এ ধরনের দৃষ্টিকে বলা হয় আলোক বীক্ষণ (Light vision বা Photopic vision)। আলোক বীক্ষণে কোনো বস্তুকে দেখার জন্য চোখের যেমন প্রচুর আলোর প্রয়োজন হয়, তেমনি এই ধরনের বীক্ষণে লক্ষ্যবস্তুর আকার, রং, জ্যামিতিক গঠনের পরিপাট্য এবং তার অবস্থান সম্পর্কে সঠিক অনুভূতি জন্মায়। সৌভাগ্যক্রমে মানুষের চোখের ক্ষেত্রে এরকম দুধরণের বীক্ষণই দেখা যায়। তবে সেক্ষেত্রে কোনো এক নির্দিষ্ট উদ্দীপনা সবসময় একই ধরনের অনুভূতির সৃষ্টি করে না। যেমন, ধরা যাক অন্ধকার থেকে কোনো লোক হঠাৎ মধ্যমমাত্রায় বা ক্ষীণ আলোকে আলোকিত ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লে, তার কাছে সেই ঘরের উজ্জ্বলতা অত্যন্ত তীব্র বলে মনে হবে। আবার সেই ঘর থেকে বেরিয়ে সে যদি তীব্রতর আলোকে আলোকিত অন্য এক ঘরে ঢুকে পড়ে, তবে তার কাছে পূর্বের আলোকিত ঘরটি বেশ অনুজ্জ্বল বলে মনে হবে।

অবশ্য কিছু সময় বাদে এই উজ্জ্বলতা ও অনুজ্জ্বলতার ভেদরেখা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যায়। এই ঘটনাকে আমরা এই বলে ব্যাখা করি দর্শকটির চোখ সেই উজ্জ্বলতার মাত্রায় অভ্যস্ত বা সহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। এই ধরনের অভ্যস্ততা বা সহিষ্ণুতাকে (adaptation) আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি —

(1) আলোক সহিষ্ণুতা (Photopic adaptation)

(2) আঁধার সহিষ্ণুতা (Dark or scotopic adaptation)

নিচের তালিকা থেকে মানুষদের এরকম দু'ধরণের দৃষ্টি বা বীক্ষণের প্রধান প্রধান তুলনামূলক বৈশিষ্ট্যগুলির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক —

বৈশিষ্ট্য	আঁধার বীক্ষণের জন্য	আলোক বীক্ষণের জন্য
আলোক রাসায়নিক বস্তু হিসাবে (Photo Chemical Substance)	দন্ড কোষের রডোপসিন নামক গাঢ় লাল রঙের ক্রোমো প্রোটিন।	শংকু কোষের আয়োড্পসিন নামক রঞ্জক পদার্থ।
গ্রাহক কোষ (Receptor Cells)	দন্ড কোষ (Rod Receptor Cells)	শংকু কোষ (Cone Receptor Cells)
অভ্যস্ততা বা সহিষ্ণুতার দ্রুতি (Speed of adaptation)	ধীরে (30 মিনিট বা তারও বেশি সময় পরে) সহিষ্ণুতা সর্বোচ্চ মানে পৌছায়	দ্রুত (8 মিনিট বা তারও কম) সময়ে সহিষ্ণুতা সর্বোচ্চ মানে পৌছে যায়।

বৈশিষ্ট্য	আঁধার বীক্ষণের জন্য	আলোক বীক্ষণের জন্য
বর্ণ বিভেদন করার ক্ষমতা (Colour discrimination)	নেই	রয়েছে
অক্ষিপটে অংশগ্রহণকারী অঞ্চল (Region of Retina)	প্রান্তীয় অঞ্চল যেখানে দন্ডকোষে সংখ্যাধিক্য	কেন্দ্রীয় অঞ্চল যেখানে শংকু কোষের ঘনত্ব সর্বাপেক্ষা বেশি
স্থানিক পরিমাণ (Spacial Summation)	অধিক	স্বল্প
বীক্ষণ সূক্ষ্মতা (Visual acuity)	নিম্ন মানের	উচ্চ মানের
প্রতি চোখে গ্রাহক কোষের সংখ্যা (Number of Receptors)	120,000,000	7,000,000
মস্তিষ্কের অংশগ্রহণ (Cortical representation)	কম	বেশি
বর্ণালী সংবেদনশীলতার সর্বোচ্চমান (Spectral Sensitivity Peak)	505mμ বর্ণালীর নীল অঞ্চলে	553mμ বর্ণালীর হলুদ অঞ্চলে

বর্ণ	তরঙ্গ দৈর্ঘ্য	বর্ণ	তরঙ্গ দৈর্ঘ্য
লাল	6800Å= 6800 x 10^{-8} cm	কমলা	6300Å
হলুদ	5800Å	সবুজ	5300Å
নীল	4800Å	বেগুনী	4300Å

14b.2 আঁধার বীক্ষণ (Scotopic vision)

আঁধার বীক্ষণ হোল অন্ধকারে বা ক্ষীণ আলোকে চোখের দেখার ক্ষমতা। অক্ষিপটের দন্ড-গ্রাহক কোষ এই ধরনের বীক্ষণে প্রধান ভূমিকা পালন করে। দন্ড গ্রাহক কোষের বাইরের অংশে রডোপসিন বা ভিসুয়াল পার্পল (visual purple) নামে এক ধরনের গাঢ় লালরঙের আলোক সুবেদী ক্রোমোপ্রোটিন থাকে। অক্ষিপটে তীব্র আলো পড়লে, তারা আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়ায় দ্রুত বিয়োজিত হয়ে বিবর্ণ হতে থাকে। সেজন্য দিনের বেলায় আঁধার-বীক্ষণ ব্যবস্থা কার্যত "অন্ধ" বা অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। অন্ধকারে অক্ষিপটে অবস্থিত অসংখ্য রক্তজালক রক্তের মাধ্যমে ভিটামিন A বহন করে আনলেও সেখানে, রডোপসিনের পুনঃসৃজন প্রক্রিয়া দ্রুততর হয় এবং পুনর্গঠিত রডোপসিনের ঘনত্ব বাড়তে থাকে। তাদের বর্দ্ধিত ঘনত্বের সঙ্গে সঙ্গে আঁধার-বীক্ষণের উদ্দীপনাও বাড়তে থাকে। এইভাবে অক্ষিপটে রডোপ্সিনের পুনঃসৃজন এবং আপতিত আলোকে তাদের রাসায়নিক বিয়োজন — এই দুয়ের ভিতর যতক্ষণ না সমতা আসে ততক্ষণ পর্যন্ত আঁধার-বীক্ষণের সুবেদিতা বাড়তে থাকে। দিনের আলোতে রক্তের দ্বারা অক্ষিপটে ভিটামিন A বাহিত হলেও, বিয়োজনের তুলনায় পুনঃসৃজন ক্রিয়া এত ধীর গতিতে হয় যে যার জন্য সে সময় আঁধার বীক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে রডোপসিন তৈরি হয় না ফলে দিনের তীব্র আলোতে আঁধার বীক্ষণ হয় না।

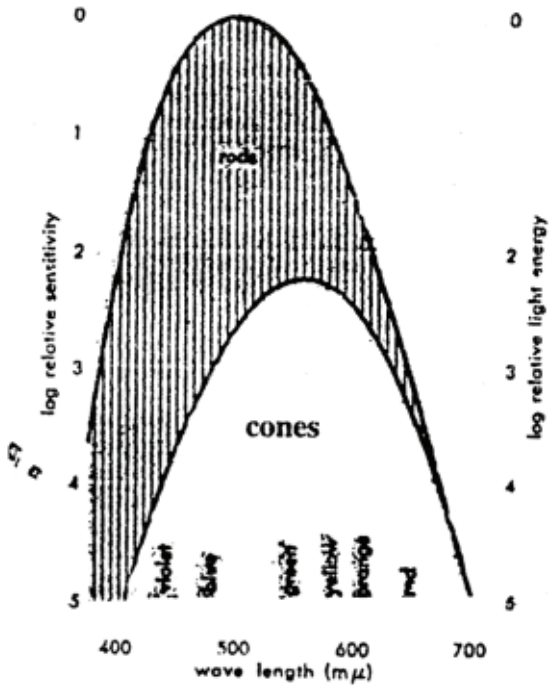

Fig. 14.7 Spectral sensitivity curves for human vision. The rod curve shows that scotopic vision, based on rhodopsin, is most sensitive to light of about 505 mμ. The cone curve shows that photopic vision is generally less sensitive than scotopic vision, except for light at the red end of the spectrum.

অক্ষিপটে দন্ড গ্রাহক কোষের পর্যাপ্ত অনুপস্থিতি এবং খাদ্যে ভিটামিন A - র স্বল্পতা "**রাতকানা**" রোগের জন্য দায়ী। এই দুর্লভ রোগের রোগীরা তীব্র কৃত্রিম আলো ছাড়া রাতে ভালো দেখতে পায় না বা চলাচল করতে

পারে না। পাশের লেখচিত্রটিতে কিভাবে আপতিত আলোকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সঙ্গে আঁধারবীক্ষণ উদ্দীপনার পরিবর্তন ঘটে তা দেখানো হয়েছে।

আপতিত আলোক উদ্দীপনার বিভিন্ন মাত্রার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চোখের আঁধার সহিষ্ণুতার অসংখ্য স্তর রয়েছে। আলোকিত জায়গা থেকে অন্ধকার জায়গায় হঠাৎ ঢুকে পড়লে দর্শকের প্রাথমিক অবস্থা হল কিছুই দেখতে না পাওয়া।

যতই অন্ধকারে তার চোখ অভ্যস্ত হয়ে উঠতে থাকে, ততই তার আঁধার বীক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে থাকে। ঘরের ভিতরে থাকা জিনিসপত্রগুলি প্রাথমিকভাবে অদৃশ্য থাকলেও, সেগুলির অবয়ব তার চোখের সামনে ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে থাকে। আঁধার বীক্ষণে দর্শক কোনো রং দেখতে পায় না। দন্ডকোষ সংবেদী লেখচিত্রটির সর্বোচ্চ শীর্ষ 505 mμ

তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে রয়েছে অর্থাৎ নীল আলোতে আঁধার বীক্ষণ সবচেয়ে ভালোভাবে কাজ করে। "তাই রাতের বেলায় সব বেড়ালই ধূসর" এই প্রবাদ বাক্যটি আঁধার বীক্ষণের ক্ষেত্রে খুবই প্রযোজ্য (IN THE NIGHT ALL CATS APPEAR GRAY) । এবার আমরা তীব্র আলোতে চোখের বীক্ষণ ব্যবস্থা বা আলোক বীক্ষণ (Photopic vision) নিয়ে আলোচনা করবো।

স্বাভাবিক আলোক বীক্ষণ (Normai photopic vision)

তীব্র আলোতে অনুষ্ঠিত স্বাভাবিক আলোক বীক্ষণের বৈশিষ্ট্যাবলী আঁধার বীক্ষণের সঙ্গে আগের সারণীতে আমরা দিয়েছি। এ ধরনের বীক্ষণে অক্ষিপটে কেন্দ্রে অতি অল্প জায়গা জুড়ে অবস্থিত ফোডিয়া সেন্ট্রালিসের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ, এই জায়গায় তীব্র আলোক সংবেদী খর্বাকার শংকু কোষগুলি এত ঠাসাঠাসি অবস্থায় থাকে, যার জন্য প্রতি বর্গ মিলিমিটার ক্ষেত্রফলে সেখানে শংকু গ্রাহক কোষের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষের মতো। এই গ্রাহক কোষেরাই আলোক বীক্ষণে অংশগ্রহণ করে।

দিনের বেলায় লক্ষ্যবস্তুর দিকে **সরাসরি** তাকালে বা তাকিয়ে থাকলে এ ধরনের বীক্ষণ অনুভূতি হয়। প্রতিটি শংকু গ্রাহক কোষের **নিজস্ব** সংযোগ সূত্র রয়েছে। তারা মস্তিষ্কের দৃষ্টি অঞ্চলের প্রতিটি কোষের সঙ্গে "একের সঙ্গে এক' অবস্থায় যুক্ত। ফলে দিনের বেলায় লক্ষ্যবস্তু থেকে আগত আলো যখন সরাসরি ফোডিয়া অঞ্চলে পড়ে, তখন সেখানে উপস্থিত শংকু গ্রাহক কোষেরা তাদের নিজস্ব সংযোগ ব্যবস্থায় মস্তিষ্কের দৃষ্টি অঞ্চলে লক্ষ্যবস্তুর রং, আকার, অবস্থান সম্পর্কে নিখুঁত তথ্যাবলী সরবরাহ করে ফলে দর্শকের চোখে বস্তুটি তার সমস্ত বৈশিষ্ট্যসহ ভেসে ওঠে। ফোডিয়া বীক্ষণের পর অক্ষিপটের প্রান্তীয় বীক্ষণ (Peripheral vision) শুরু হয়।

14b.3 প্রান্তীয়বীক্ষণ

ফোডিয়া অঞ্চল ছাড়িয়ে অক্ষিপটের প্রান্তীয় অঞ্চলের দিকে যতই যাওয়া যায়, শংকু গ্রাহক কোষের পরিমাণ ততই কমতে থাকে এবং একেবারে প্রান্তীয় অঞ্চলে কোন শংকু কোষ থাকে না তার পরিবর্তে সেখানে শুধুই দন্ডগ্রাহক কোষের ছড়াছড়ি এবং সেই দান্ত কোষের সংখ্যাও যথেষ্ট কম। লক্ষ্যবস্তু থেকে আসা আলো অক্ষিপটের প্রান্তীয় অঞ্চলে পড়লে বা প্রান্তীয় অঞ্চল দিয়ে কোনো বস্তুকে দেখলে সেই বীক্ষণ ক্রিয়াকে বলা হয় প্রান্তীয় বীক্ষণ।

ফোডিয়া অঞ্চলে উপস্থিত প্রতিটি শংকু গ্রাহক কোষ যেরকম নিজস্ব সংযোগ ব্যবস্থায় মস্তিষ্কের দৃষ্টি অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে প্রান্তীয় অঞ্চলে উপস্থিত দন্ড গ্রাহক কোষেরা সে রকম ব্যবস্থা রাখেনি। তারা একক সংযোগ ব্যবস্থার পরিবর্তে শতশত গ্রাহক কোষ একসঙ্গে মিশে একটি মাত্র দর্শন স্নায়ু রজ্জুতে পরিণত হয়েছে।

এদের সম্মিলিত ক্রিয়ার ফলে প্রান্তীয় অঞ্চলের বীক্ষণ-প্রক্রিয়া রাতে বা ক্ষীণ আলোতে বিশেষ উপযোগী হলেও, ফোডিয়া অঞ্চলের মতো সেখানে বীক্ষণ সূক্ষ্মতা কিংবা লক্ষ্য বস্তুর স্পষ্ট জ্যামিতিক আকার বা রং দেখার ক্ষমতা লোপ পায়।

ছাপা কাগজের কোনো একটি অক্ষরের দিকে চোখ না নড়িয়ে সরাসরি তাকালে, সেই বিশেষ অক্ষরটি ও তার অব্যবহিত কাছের কয়েকটি অক্ষরকে দর্শক স্পষ্ট দেখলেও, কাছাকাছি ও দূরের লেখাগুলি তার চোখে ধূসর রেখার সমষ্টি বলে মনে হবে। কারণ প্রথম ক্ষেত্রে সে ফোডিয়া বীক্ষণের সাহায্য নিয়েছে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রান্তীয় বীক্ষণের বৈশিষ্ট্যই তাকে এধরনের বীক্ষণ করিয়েছে। তাহলে কি প্রান্তীয় বীক্ষণের কোনো উপযোগিতা নেই? আছে। নিশ্চয়ই আছে।

অভিজ্ঞ জ্যোতির্বিদেরা প্রায়ই নবীন পর্যবেক্ষকদের একটি পরামর্শ দিয়ে থাকেন। সেটি হোল রাত্রে আকাশ পর্যবেক্ষণ করার সময় যুগ্মতারা (binary stars) সংগীতারা বা সুদূরবর্তী নীহারিকার অতি ক্ষীণ ও অস্পষ্ট বস্তুকে দেখবার সময় তাদের দিকে সরাসরি না তাকিয়ে একপেশে দৃষ্টি বা চোখের কোন দিয়ে তাদের দেখেন। কারণ, এই ধরনের একপেশে দৃষ্টিতে (adverted eye)-র প্রান্তীয় অঞ্চলে সংখ্যাগুরু দন্ডকোষের সম্মেলক ক্রিয়ায় ক্ষীণ আলোকে আলোকিত বস্তুকে ভালোভাবে দেখা যায়। কারণ, দন্ড গ্রাহক কোষেরা ক্ষীণ আলোক সংবেদী।

এছাড়া গতিশীলতার প্রতি বিশেষ সংবেদনশীলতাও প্রান্তীয় অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য।

মানুষের চোখের কেন্দ্র থেকে দুপাশে প্রায় 90° করে বিস্তৃত দৃষ্টি ক্ষেত্রের (field of view) যে কোনো প্রান্ত দিয়ে গতিশীল অতি ক্ষুদ্র বস্তুও তার চোখ এড়ায় না। ভিতরে যে কোনো প্রান্ত দিয়ে পিঁপড়ের মতো ক্ষুদ্র গতিশীল বস্তুও তার নজর এড়ায় না। প্রান্তীয়বীক্ষণ গতিশীলতার প্রতি এতই -অনুভূতি প্রবণ।

পারকিনজি ক্রিয়া (Purkinje-effect)

আগেই বলেছি দন্ড ও শংকু গ্রাহক কোষের প্রত্যেকেরই যে যার নিজস্ব, স্বাধীন ও পৃথক পৃথক বীক্ষণ ব্যবস্থা রয়েছে। শংকুকোষের তুলনায় দন্ডকোষের প্রারম্ভিক বা সূচনা উদ্দীপনা (Threshold stimuli) অনেক কম হলেও, অন্ধকারে যত সময় যায় ধীরে ধীরে তারা আলো দেখার ক্ষমতা অর্জন করতে থাকে। এমনও দেখা গেছে একলক্ষ ভাগের এক ভাগের মতো উদ্দীপনার পরিবর্তনও তারা অনায়াসে বুঝতে পারে। উদ্দীপনার মান একেবারে শূন্য থেকে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকলে প্রথমে দন্ডকোষ, পরে শংকু কোষ সক্রিয় হতে থাকে। উদ্দীপনার একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত উভয়েই বীক্ষণ ক্রিয়ায় যে যার মতো অংশগ্রহণ করলেও, পরে উচ্চতর উদ্দীপনায় বা উজ্জ্বলতায় শংকু কোষেরা এত বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে যে, তখন দন্ডকোষের সক্রিয়তা বা নিষ্ক্রিয়তা ধর্তব্যের মধ্যে আসে না।

এইভাবে উজ্জ্বলতা বাড়ার সাথে সাথে বীক্ষণ ক্রিয়া দন্ডকোষ থেকে শংকু কোষে স্থানান্তরিত হতে থাকে। এ ধরনের হস্তান্তরের সময় পরপর যে সব চিত্তাকর্ষক পর্যায়গুলি ঘটতে থাকে তার প্রথম পর্যায়ে কোনো রং দেখা যায় না, পরের পর্যায়গুলিতে ধীরে ধীরে বিভিন্ন বর্ণযুক্ত পদার্থের ক্ষেত্রে আপেক্ষিক উজ্জ্বলতার পার্থক্য অনুভূত হতে থাকে। দন্ডকোষগুলি এভাবে নীল আলোতে ভালো দেখলেও শংকু কোষেরা নীল রং অপেক্ষা লাল রঙে বেশি সক্রিয় হয় বা ভালো দেখে। একই দৃশ্য বর্ণালীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন গ্রাহক কোষের এ ধরনের আপেক্ষিক সক্রিয়তার পার্থক্যকে (relative responsed) পারকিনজি ক্রিয়া বলে (Purkinje effect)। পারকিনজি দেখিয়েছেন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে নিরূপিত আপেক্ষিক উজ্জ্বলতার লেখতে কিভাবে একই চোখ আঁধার বীক্ষণের তুলনায় ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে অধিকতর সক্রিয়তা দেখায়।

দৈনন্দিন জীবনে নানা সাধারণ ঘটনায় এদের উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। যেমন লাল ও নীল রং-এর দুটি পৃথক কাগজ টুকরাকে প্রখর আলোয় রাখলে লাল কাগজটিকে নীল রং-এর তুলনায় অনেক বেশি উজ্জ্বল দেখায়। আবার সেই কাগজ দুটিকেই অন্ধকার ঘরে নিয়ে গেলে অন্ধকারে লাল রঙকে কালো দেখাবে এবং নীল রঙের কাগজটিকে তখন লালের চেয়ে উজ্জ্বলতর বলে মনে হবে। বৈমানিকেরা রাত উড়ানের সময় লাল আলোর প্রতি চরম অসংবেদী দন্ডকোষীয় বীক্ষণ এড়াবার জন্য লাল রঙের গগল্‌স পরেন।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ক্যামেরা লাগিয়ে আকাশ পর্যবেক্ষকেরা সুদূর নীহারিকার সাদা কালো আলোক চিত্র তোলেন। সেই সব আলোক চিত্র ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলেও তাদের কোনো রং আছে বলে মনে হয় না। এ ধরনের দুটি আলোকচিত্র বেছে নিয়ে মাউন্ট উইলসন এবং পালোমার কর্মরত জ্যোতির্বিদ ডবলিউ.সি.মিলার আংটি নীহারিকা [Ring Nebula বীণা বা Lyra নক্ষত্র মন্ডলে আংটির মতো দেখতে এই নীহারিকা আছে। মেসিয়ারের তৈরি অস্পষ্ট আকাশীয় বস্তুর তালিকায় এর ক্রমসংখ্যা M-45] এবং কর্কট নীহারিকার [এই নীহারিকার নাম crab-

nebula, M-1 বৃষ নক্ষত্র মন্ডলে অবস্থিত] আলোকচিত্র দুটিতে আপেক্ষিক উজ্জ্বলতার ভিত্তিতে বিভিন্ন অংশে রং করতে শুরু করেন। একাজ যথেষ্ট পরিশ্রমসাধ্য এবং ধৈর্য সাপেক্ষ।

রং করার পর দেখা গেল আংটি নীহারিকার ভিতরের অংশ চমৎকার নীল রংয়ের — বাইরের অংশটি উজ্জ্বল লাল আলোর চক্র। আর কর্কট নীহারিকাতে দেখা গেল নীল রঙের কুয়াশার মতো অস্পষ্ট। কেন্দ্রীয় অঞ্চল থেকে উজ্জ্বল লাল ও কমলা রঙের প্রবর্ধক অংশ এলোমেলোভাবে বেরিয়ে রয়েছে।

আধুনিককালে ডেভিড মালিন (MALIN) তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে বিভিন্ন আকাশীয় বস্তুর ছবি তুলে দেখিয়েছেন মিলারের ছবি দুটি প্রায় তাদেরই মতো সঠিকভাবে রঙীন।

14b.4

(a) **দৃষ্টি নির্বন্ধ** (Persistence of the eye)

(b) **বর্ণক্লান্তি** (Colour faligue) এবং

(c) **বর্ণানুবেদন** (after image)

দৃষ্টি নির্বন্ধ (Persistence of vision**)**

বস্তু থেকে আলো এসে অক্ষিপটে যে প্রতিবিম্বের সৃষ্টি করে তার স্থায়িত্বকাল প্রায় $\frac{1}{10}$ সেকেন্ড, কারণ আলোর উজ্জ্বলতা কম হলে অক্ষিপটে অবস্থিত দন্ডকোষগুলির ভিসুয়াল পার্পলে (রডোপসিন নামক গাঢ় লাল রঙের ক্রোমোপ্রোটিন) যে আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে তার স্থায়িত্বকালও অনুরূপ অক্ষিপটে গঠিত, প্রতিবিম্বের এই স্থায়িত্বকালকে বলা হয় দৃষ্টি নির্বন্ধ। কারণ ওই সময়ের মধ্যে অন্য কোনো প্রতিবিম্ব অক্ষিপটে গঠিত হয় না। চোখের এই ধর্মকে কাজে লাগিয়ে চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত ছবিতে গতিশীলতা আনা হয়।

(b) **বর্ণক্লান্তি** এবং (c) **বর্ণানুবেদন**

ধরা যাক, কোনো দর্শক টানা $\frac{10}{12}$ সেকেন্ড থেকে $\frac{20}{21}$ সেকেন্ড ধরে সাদা বা ধূসর পটভূমিকায় রাখা উজ্জ্বল রঙে চিত্রিত-ধরা যাক লাল রঙের কোনো বস্তুর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ সেই বস্তুকে তার চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নিলে কি হবে?

বস্তুটিকে এভাবে সরিয়ে নিলে দর্শকের চোখ সেই একই জায়গায় একই আকারের নীলাভ সবুজ রঙের বস্তু দেখতে পাবে। বস্তুকে সরিয়ে নিলেও চোখে এভাবে তার রেশ লেগে থাকার ঘটনাকে বলা হয় **অনুবেদন** (after image) । এখানে লাল রঙের বস্তুর অনুবেদন হিসেবে নীলাভ সবুজ রঙের অনুভূতি হয়েছে।

এ ধরনের অনুভূতির কারণ হোল লাল রঙের প্রতি সংবেদনশীল শংকু গ্রাহক কোষগুলি প্রাথমিকভাবে লাল রঙে সাড়া দিলেও (Response) একটানা অনেকক্ষণ ধরে সাড়া দিতে দিতে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং পশ্চাদ্‌পটের সাদা বা ধূসর আলোয় ক্ষীণভাবে সাড়া দিতে থাকে চোখের এই ঘটনাকে বলা হয় বর্ণক্লান্তি। এই অবস্থায় লাল রঙের বস্তুকে হঠাৎ সরিয়ে নিলে এতক্ষণ নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা এবং নীল রঙের প্রতি সংবেদন শংকু গ্রাহক কোষেরা তখন সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং সাড়া দিতে থাকে। ফলে লাল রঙের বস্তুর পরিবর্তে নীলচে সবুজ রঙেব বর্ণ বিভ্রম বা অনুবেদনের (after image) সৃষ্টি হয়।

অনুবেদন দু-রকমের (1) অবার্ণ অনুবেদন (Negative afterimage) এবং 2 সবর্ণ অনুবেদন (Positive afterimage)।

(১) উপরের উদাহরণটি হোল অবার্ন অনুবেদনের। এই ধরনের অনুবেদনে সাদা বা ধূসর পটভূমিকায় রাখা কোনো রঙিন বস্তুর দিকে বেশ কিছুক্ষণ একটানা তাকিয়ে থেকে হঠাৎ সাদা পটভূমিকায় চোখ সরিয়ে নিলে বস্তুর প্রতিবিম্বের রেশ এরপরও চোখে কিছুক্ষণ লেগে থাকে কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রতিবিম্বের বর্ণ পূর্ব বর্ণের পরিপূরক (complimentary) বর্ণে রূপান্তরিত হয়। যেমন বস্তু সাদা, লাল বা হলুদ হলে তাদের **অবার্ন অনুবেদন** হবে যথাক্রমে কালো, সবুজ বা নীল। কারণ সাদার সঙ্গে কালো, লালের সঙ্গে সবুজ এবং হলুদের সঙ্গে নীল মেশালে **সাদা রঙের অনুভূতি** হয়।

সবর্ণ অনুবেদনে বস্তুর দিকে নিবদ্ধ চোখকে হঠাৎ বন্ধ করলে বা সরিয়ে নিয়ে অন্ধকার পটভূমিকায় নিবদ্ধ করলে **বর্ণসহ** বস্তুর প্রতিবিম্ব চোখে কিছুক্ষণ লেগে থাকে। এর কারণ হল উদ্দীপক উৎসকে সরিয়ে নেবার পরও অক্ষিপটের দন্ড ও শঙ্কু গ্রাহক কোষগুলিতে যে আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়া চলছিল সেগুলি আরও কিছুক্ষণ অব্যাহত থাকে। ফলে বর্ণসহ বস্তুর প্রতিবিম্ব উদ্দীপনা বিরতির পরও কিছুক্ষণ বজায় থাকে।

14b.5 বীক্ষণ সূক্ষ্মতা (visual acuity)

এবার আমরা বীক্ষণ সূক্ষ্মতা নিয়ে আলোচনা করবো।

বীক্ষণ সূক্ষ্মতা হল মানুষের চোখের এক বিশেষ ক্ষমতা যার সাহায্যে কোনো বস্তুতে অবস্থিত দুটি স্বতন্ত্র ভৌত উদ্দীপনাকে সে পৃথকভাবে চিহ্নিত করতে পারে অর্থাৎ কোনো বস্তুর অংশাতিত অংশকে সূক্ষ্মভাবে সে দেখতে পায় চোখের আদর্শ বীক্ষণ সূক্ষ্মতার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এটি চোখের এমন এক বিশেষ ক্ষমতা যার প্রয়োগে সে বৃত্তচাপের। 1মিনিট বা $\frac{1}{60}$ ডিগ্রি বীক্ষণ কোনো উৎপন্নকারী অতি ক্ষুদ্র বস্তুকেও সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পারে। লক্ষ্যবস্তুর শীর্ষ বিন্দুও পাদ বিন্দু থেকে নির্গত দুটি কাল্পনিক সরলরেখা মিলিত হয়ে অক্ষিপটে যে কোন উৎপন্ন করে তাকে বীক্ষণ কোণ (visual angle) বলে।

একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে :

ধরুন 20 ফুট দূরে অবস্থিত কোনো পরীক্ষাধীন বস্তুর উচ্চতা 0.07 ইঞ্চি বা 1.75 মিমি. সেই বস্তুটি যদি চোখে $\frac{1}{60}$ ডিগ্রী বীক্ষণ কোণ উৎপাদন করে তবে ফোডিয়ায় গঠিত তার প্রতিবিম্বের আকার হবে মাত্র .005 মিমি বা 5 ইঞ্চি যা কিনা ফোডিয়া অঞ্চলে অবস্থিত ক্ষুদ্রতম শঙ্কু গ্রাহক কোষের ব্যাসের দ্বিগুণ।

অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে স্বাভাবিক বীক্ষণ সূক্ষ্মতা ফোডিয়া অঞ্চলে উপস্থিত গ্রাহক কোষগুলির ঘনত্ব, আকার এবং তাদের পারস্পরিক অবস্থানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এছাড়াও নিয়ন্ত্রক বিষয়গুলি হোল (১) উদ্দীপনার প্রকৃতি (যেমন লক্ষ্যবস্তুর (Surface) দেহতলের উজ্জ্বলতা ও তার আপেক্ষিক পার্থক্য এবং আলোক সম্পাতের স্থায়িত্বকাল) (২) চোখের প্রতিসরণ ক্ষমতা (যা একবর্ণী আলোর ক্ষেত্রে বাড়লেও , অপেরন (alteration) ব্যবর্তন (diffraction) এবং চোখের নানান ধরনের ত্রুটির জন্য পরিস্রান্ত হয়) ফোডিয়া অঞ্চল থেকে যত প্রান্তীয় অঞ্চলের দিকে যাওয়া যাবে ততই সূক্ষ্মতা কমবে।

এখন চোখকে না সরিয়ে বা স্থির রেখে কোনো দর্শক যদি পাশাপাশি থাকা দুটি স্বতন্ত্র বিন্দু উৎসকে বিশ্লিষ্ট বা পৃথক ভাবে দেখতে চায়, তবে নিচের দুটি শর্তকে আবশ্যিকভাবে পালন করতে হয়।

প্রথমত, চোখের আলোকীয় ব্যবস্থা এমন হবে যাতে লক্ষ্যবস্তুর প্রতিটি অংশ অক্ষপটে যে যার নিজস্ব বিম্ব প্রস্তুত করতে পারে এবং দ্বিতীয়ত, অক্ষিপটে অবস্থিত গ্রাহক কোষের বিন্যাস কাঠামো এমন হবে, যাতে সেই কাঠামো বিশ্লিষ্ট বিম্বগুলি সঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারে।

প্রথম শর্তের আলোচনায় দেখতে পাই বৃত্তাকার তারা রন্ধ্রের ব্যাসের গড় মান 4 মিমি হলে কোনো দর্শকের চোখে বিশ্লেষণী ক্ষমতার (power of resolution) কোণিক সীমা বৃত্তচাপের $\frac{1}{2}$ মিনিট কোণে পৌঁছায়। এই অবস্থায় অপেরনজনিত ত্রুটিও ন্যূনতম হয় এবং দ্বিতীয় শর্তের আলোচনায় যুক্তিপূর্ণভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে কোনো চোখ যদি অক্ষিপটে গঠিত দুটি নিকটবর্তী বিম্বকের বিশ্লেষণ করতে চায়, তবে সেই বিম্ব দুটির মাঝখানে একটি অনুত্তেজিত (unstimulated) গ্রাহক কোষের উপস্থিতি প্রয়োজন।

বীক্ষণ-সূক্ষ্মতা পরিমাপের সময় দেখা গেছে পরীক্ষাধীন (test) বস্তুর বিভিন্ন আকারের জন্য প্রাপ্ত ফলাফলও বিভিন্ন হচ্ছে। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বীক্ষণ কোণ θ-র পরিমাণ এত কমিয়ে ফেলা যায় যাতে পরীক্ষাধীন বস্তুকে স্বাভাবিক খালি চোখে দেখতে পাওয়া যায় না বললেই চলে।

কালো পর্দার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো সাদা বিন্দুকে দেখার সময় তার কৌণিক আকার যে অসীমভাবে ক্ষুদ্র করা হয়। রাতের কালো আকাশের বুকে আলোক বিন্দুর মতো তারারা হোল এর চমৎকার উদাহরণ। এইসব তারা

পৃথিবী থেকে এতদূরে থাকে যার ফলে দর্শকের চোখে তাদের বীক্ষণকোণের মান বাস্তবিক লক্ষ্যে প্রায় শূন্য হয়। আবার দিনের বেলায় রঙীন আকাশের পটভূমিকায় মাটিতে পোঁতা পতাকাদন্ডের মতো উজ্জ্বল পটভূমিকায় রাখা দীর্ঘ কালোরেখা যদি দর্শকের চোখে বৃত্তচাপের। সেকেন্ড বা $\frac{1}{60}$ মিনিট বীক্ষণ কোণ উৎপন্ন করে তবেই তাদের চিহ্নিত করা যাবে নচেৎ নয়।

একদিকে একক বিন্দু বা রেখার বীক্ষণ-সূক্ষ্মতা, অন্যদিকে জটিল থেকে জটিলতর আকারের লক্ষ্যবস্তুর বীক্ষণ-সূক্ষ্মতার মধ্যে যে আপাত বৈষম্য (apparent discrimination) দেখা যায়, আলোকীয় ব্যবর্তন ক্রিয়ার (optical diffraction) সাহায্যে তা ব্যাখ্যা করা যায়।

আলোকের তরঙ্গ ধর্মের জন্য ব্যবর্তন ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এর অর্থ হোল কোন বিম্বকেই কখনও সম্পূর্ণভাবে লক্ষ্যবস্তুর মতো পরিষ্কার ও তীক্ষ্ণধার বিশিষ্ট হতে দেখা যায় না। আলোর এই ধর্মের জন্য অক্ষিপটে গঠিত যে কোন তারার প্রতিবিম্বই বিন্দুবৎ না হয়ে অস্ফট আলোক চাকতির মতো দেখায় এবং এই অবস্থায় বীক্ষণ কোণের মান যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন সেই অস্পষ্ট প্রতিবিম্বের ব্যাসের মান কখনই বৃত্ত চাপের 1 মিনিট পরিমাণ থেকে কম হয় না। হলে বীক্ষণ সূক্ষ্মও অকার্যকর হয়ে পড়বে। যদি পরীক্ষাধীন তারাটি তার পটভূমিকার তুলনায় উজ্জ্বলতর হয় এবং তার প্রতিবিম্ব ব্যাস 1 মিনিটের মতো হয় তবেই আমরা সেই তারাকে দেখতে পাবো।

এরকম সরল আলোচনার সাহায্যে চোখের বিশ্লেষণী ক্ষমতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত ঘটনাকে সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, আলোচনা করার সময় আমরা ধরে নিয়েছিলাম চোখকে স্থির রাখতে হবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে চোখ লক্ষ্য বস্তুর উপর সবসময় কম-বেশি নড়াচড়া করতেই থাকে। এইভাবে কোনবস্তুকে অবিরাম নিরীক্ষণ করার মতো ব্যাপারটা ভার্ণিয়ার-সূক্ষ্মতা পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। ভার্নিয়ার পাঠের সময় মূলস্কেলের রৈখিক দাগকে ভার্নিয়ার স্কেলের রৈখিক দাগের সঙ্গে একই সরলরেখায় বিন্যস্ত করার ক্ষেত্রে চোখ তার অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেয়। এই দক্ষতায় চোখ 1 মিমি $\frac{1}{50}$ ভাগের সরনও খালি চোখে পড়ে দিতে পারে। এমনকি এসময় বীক্ষণ কোণের মান বৃত্ত চাপের কয়েক সেকেন্ড হলেও চোখ তাও অগ্রাহ্য করে।

আগেই বলা হয়েছে দৃষ্টিক্ষেত্রের (field of view) প্রান্তীয় অঞ্চলে কোনো বস্তুর সামান্যতম নড়াচড়াও চোখ বুঝতে পারে। ফোডিয়া অঞ্চল থেকে প্রান্তীয় সীমার দিকে যতই যাওয়া যাবে, ততই চোখের বিশ্লেষণী ক্ষমতা কমে যাবে এ ধারণা সর্বাংশে ঠিক নয়। এভাবে চোখের বিশ্লেষণী ক্ষমতাও সহসা কমে যায় না। প্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত দন্ডগ্রাহক কোনো স্বল্প উদ্দীপনায় সংবেদনশীল হলেও পরীক্ষা করে দেখা গেছে কম্পমান আলোক উৎসের বা আলোক স্পন্দনের প্রতি কেন্দ্রীয় অঞ্চলের তুলনায় তারা অধিকতর সংবেদনশীল।

14b.6 বর্ণ বীক্ষণ (Colour Vision)

বর্ণের সংজ্ঞা হচ্ছে এক বিশেষ দর্শন-অনুভূতি যা অক্ষিপটে আপতিত আলোকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা কম্পাংকের উপর নির্ভরশীল। উন্নত শ্রেণীর সাধারণ দর্শকের ক্ষেত্রে বর্ণ-দর্শন অনুভূতি 0.4μ থেকে 0.75μ [1 মাইক্রন 1μ (মিউ)

= 10^{-6} সেমি]। তরঙ্গ দৈর্ঘ্যযুক্ত তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের জন্য হয়ে থাকে। পৃথক তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পৃথক বর্ণ-দর্শনের অনুভূতি জাগায়।

বর্ণানুভূতি উজ্জ্বল আলোকে, আলোক সহিষ্ণু চোখে, এবং শংকু গ্রাহক কোণের সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়। শংকু গ্রাহক কোণ নিজে কোনো বর্ণানুভূতির সৃষ্টি করে না। দৃশ্য বর্ণালীর বিভিন্ন বর্ণকে বিভিন্ন তীব্রতার স্নায়ু প্রবাহে পরিণত করে মস্তিষ্কের বীক্ষণ কেন্দ্রে পাঠায়। যেখানে মস্তিষ্কের এই কেন্দ্র বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে সীমারেখা টানে। দর্শক তখন বর্ণ দেখতে পায় এবং বর্ণ পার্থক্য বুঝতে পারে। কোন বস্তু থেকে নিঃসৃত আলো (transmitted) আমাদের চোখে এ ধরনের বর্ণানুভূতি সৃষ্টি করে এই ধরনের বর্ণ সংবেদন ব্যক্তি নিরপেক্ষ বা ব্যক্তিভিত্তিক হতে পারে। ব্যক্তি নিরপেক্ষতার অর্থ হোল যা ব্যক্তি বিশেষের দর্শন শক্তির মতো অন্য কোন ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল নয়। ব্যক্তিভিত্তিক শব্দটি ব্যবহার করার অর্থ হোল একই বর্ণের আলো বিভিন্ন লোকের চোখে বর্ণান্ধতার মতো বিভিন্ন বর্ণের অনুভূতি জাগায়।

আবার বর্ণ বলতে কোন কোন রঞ্জক পদার্থের (coloured pigment or dye) রংকেও বুঝায়।

বর্ণের তিনটি বৈশিষ্ট্য

গানের সুরের মতো বর্ণেরও তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে (1) বিশুদ্ধ বর্ণ (hue) (2) ঔজ্জ্বল্য (brightness) (3) সংপৃক্তি (staturation)।

বিশুদ্ধ বর্ণ : শব্দ বিজ্ঞানে একটি মাত্র কম্পাংকযুক্ত শব্দ যেমন শুদ্ধ ধ্বনি (tone) তেমনি বীক্ষণ-বিজ্ঞানে একটি মাত্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বা একবর্ণী আলোকে বিশুদ্ধ বর্ণ বলা হয়।

ঔজ্জ্বল্য : ঔজ্জ্বল্য যেন আপতিত আলোকের প্রতি অক্ষিপটের সাড়া দেওয়ার আপেক্ষিক মাত্রা। এ ধরনের আপেক্ষিক বেশি হলে বুঝতে হবে উৎসের ঔজ্জ্বল্য বেশি। শব্দ বিজ্ঞানে এর তুলনা শব্দ প্রাবল্য (loudness)

বর্ণসংপৃক্তি : বিশেষ কোনো রঙের সাদা আলোর সঙ্গে মিশে যাবার প্রবণতা বা স্বাধীনতার মাত্রাকে বলা হয় বর্ণসংপৃক্তি। সে হিসাবে একবর্ণী আলোর সংপৃক্তি শতকরা একশো ভাগ। বর্ণ বললে কিছু পরিমাণ সাদা আলোর সঙ্গে একটি বা দুটি একবর্ণী আলোর মিশ্রণকে বোঝায়। আরো পরিষ্কার করে বলতে গেলে সম উজ্জ্বলতা সম্পন্ন কোনো বর্ণহীন সাদা বা ধূসর বর্ণ থেকে কোনো একটি বিশুদ্ধ বর্ণের পার্থক্য যতটুকু বর্ণ-সংপৃক্তি তারই পরিমাপক। শব্দ বিজ্ঞানে এর তুলনা ভারের (weight) বা গুণের সঙ্গে (quality)।

14b.7 বর্ণানুভূতি

এখন আমরা ব্যক্তি নিরপেক্ষ বর্ণানুভূতির কথা আলোচনা করবো। বর্ণবীক্ষণ হোল অক্ষিপটের শংকু গ্রাহক কোষের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সাধারণভাবে সাদা আলো গ্রেটিং বা প্রিজমে পড়লে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অনুযায়ী পৃথক পৃথক বর্ণে ভেঙে যায়। এই বর্ণসমষ্টি দৃশ্যমান বর্ণালী নামে পরিচিত। বর্ণালীতে বিভিন্ন বর্ণের বন্টন (distribution) দর্শকের চোখে বিভিন্ন বর্ণের অনুভূতি তৈরী করে। বিভিন্ন বর্ণের প্রতি স্বাভাবিক চোখের সংবেদনশীলতা এবং সংশ্লিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন নিয়ে লেখচিত্র আঁকলে দেখা যায় চোখ 5550Å বা 5550μ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট সবুজাভ হলুদ বর্ণের প্রতি সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল। এই সমশক্তি দীপ্তি লেখ বা সংবেদনশীলতা লেখের প্রান্তীয় অঞ্চলের একদিকে লাল রং অপর দিকে বেগুনী রং রয়েছে। সে সব জায়গায় চোখের সংবেদনশীলতা মধ্যাঞ্চলের তুলনায় বেশ কম।

[প্রমাণ প্রতিক্রিয়া উৎপাদনে λ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট নিঃসৃত আলোক শক্তি বা দীপ্তি $e\lambda$ হলে, সংবেদিতা $1/e\lambda$ । সংবেদিতা ও তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নিয়ে প্রস্তুত লেখকে সমশক্তি দীপ্তি লেখ বলে, কারণ উৎস থেকে নিঃসৃত হবার সময় সমস্ত রকম দীপ্তি প্রবাহের একই পরিমাণ শক্তির অধিকারী এবং এই আলোক বা দীপ্তি বিভিন্ন রং-এ বিশ্লিষ্ট হবার সময় প্রত্যেকেই সমানভাবে শক্তি ভাগ করে নেয়।]

এখন একটা প্রশ্ন মনে জাগে ঃ বর্ণালীতে বর্ণ বন্টনের সময় কোন বৈশিষ্ট্যের উপর বিভিন্ন বর্ণানুভূতি নির্ভর করে? সবুজ আলো পেতে হলে আমাদের কি করতে হবে?

এর উত্তরে বলতে পারি ঃ বর্ণালীর যে অংশ সবুজ, সেই অংশকে বেছে নিলেই হবে অর্থাৎ 5300Å তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো চোখে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে তা হোল সবুজ।

কিন্তু এই পদ্ধতি কি একমাত্র পদ্ধতি যার সাহায্যে বিশেষ কোন বর্ণকে এভাবে বেছে নিতে পারি ?

উত্তরে বলতে পারি, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ও বর্ণের মধ্যে এ ধরনের সরলীকৃত মিল, দুই বা ততোধিক তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা বর্ণ মিশ্রণের ফলে সৃষ্ট (Match) বর্ণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। একথা বলার উদ্দেশ্য হোল দুই বা ততোধিক বর্ণের (hue) মিলনের ফলেও (Match) পূর্বের মতো আপাতভাবে একই প্রার্থিত বর্ণের অনুভূতি হতে পারে।

এই আলোচনার প্রথমে আমরা (1) প্রাথমিক বা মূল বর্ণ (Primary Colours) এবং (2) পরিপূরক বর্ণ (Complementary Colours) সম্পর্কে দু এক কথা বলে নেবো। পরীক্ষা করে দেখা গেছে দৃশ্যমান নিরবচ্ছিন্ন বর্ণালীর লাল (তরঙ্গ দৈর্ঘ্য λ = 70000Å) সবুজ (5461Å) এবং নীল (4358Å) এই তিন বর্ণের যথোপযুক্ত আনুপাতিক সংমিশ্রণে দৃশ্যমান বর্ণালীর বাকি বর্ণগুলির সৃষ্টি হয়। এই তিন বর্ণের সংমিশ্রণে অন্যান্য বর্ণ তৈরী করা যায় বলে এদের প্রাথমিক বা মূল বর্ণ বলা হয়। এ ধরনের নামকরণের প্রাথমিক কৃতিত্বের অধিকারী হলেন অংকন

শিল্পীরা। ছবি আঁকার সময় নানা রকমের রং সৃষ্টি করার সময় মূল বর্ণগুলির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন। অবশ্য তাঁরা পদার্থ বিজ্ঞানীদের মতো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মিশিয়ে এসব পরীক্ষা করেননি। তাঁরা এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন নানারকম রঞ্জক পদার্থ মিশিয়ে। আমরা পরবর্তী আলোচনায় রঞ্জক পদার্থের মিশ্রণ দিয়ে তৈরি বর্ণ এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মিশিয়ে বর্ণ তৈরির ভিতরে পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করবো।

পরিপূরক বর্ণ (Complementary Colours)

তিনটি প্রাথমিক মৌলিক বর্ণের সংমিশ্রণে যেমন সাদা বর্ণের উদ্ভব হয়, তেমনি শুধুমাত্র দুটি বর্ণের সঠিক সংমিশ্রণেও সাদা বর্ণ পাওয়া সম্ভব। এইভাবে যে দুটি বর্ণের সংমিশ্রণে সাদা বর্ণের সৃষ্টি হয় তাদের পরস্পরকে পরস্পরের পরিপূরক বর্ণ বলা হয়।

যেমন নীল ও হলুদ বর্ণের সঠিক সংমিশ্রণে বা লাল ও সবুজ বর্ণের যথোপযুক্ত সংমিশ্রণে সাদা বর্ণের অনুভূতি জাগে। অর্থাৎ কোনো সাদা আলো চোখের গ্রাহক কোষে যে রকম অনুভূতি জাগায়, পরিপূরক বর্ণ যুগলও সেরকম একই অনুভূতি জাগায়।

এইভাবে পরিপূরক দুটি বর্ণের মিশ্রণকে বর্ণ-বীক্ষণে (Colour vision) সংযুক্তি পদ্ধতি বলে। ব্যবহারিক জীবনে সোডা-সাবান দিয়ে কাচা কাপড় থেকে হলদে রঙ নির্গত হতে থাকে ওই কাচা কাপড়কে নীল রঙে ডুবিয়ে দিলে কাচা কাপড়কে সাদা দেখায়। কারণ হলুদ ও নীলের সংমিশ্রণে আমাদের চোখে সাদা রং-এ অনুভূতি জন্মেছে।

বস্তুর বর্ণ (Colours of bodies) ও সংযোগমূলক মিশ্রণ (Additive Mixture)

বস্তুর উপরে সাদা আলো পড়লে বস্তু (1) তাকে শোষণ করতে পারে, (2) বস্তু অস্বচ্ছ হলে তাকে প্রতিফলিত করতে পারেঙ্গ (3) বস্তু স্বচ্ছ হলে আপতিত আলোক শক্তিকে নিঃসরণ (transmission) করতে পারে। সেই নিঃসৃত বা প্রতিফলিত আলো বা উদ্দীপনা দর্শকের চোখে পড়লে তার বস্তু দর্শনের অনুভূতি হয় — এই ধরনের বর্ণ দর্শন নির্ভর করে দর্শকের (1) অক্ষিপটের প্রতি একক ক্ষেত্রফলে প্রতি একক সেকেন্ডে আপতিত শক্তির উপরে, (2) আলোকিত দর্শন ক্ষেত্রের আকারের উপর, (3) চোখের সহিষ্ণুতার উপর এবং (4) দর্শকের শারীর বিজ্ঞানীয় অবস্থার উপর। বস্তু থেকে এভাবে নিঃসৃত কোনো উদ্দীপনার ভিতরে বিশেষ কোনো একটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উল্লেখযোগ্য মাত্রাধিক্য না থাকলে, তবে সেই উদ্দীপনা আমাদের চোখে সাদা রঙের অনুভূতি জাগায়। এ ধরনের বহু উৎসকে শিথিলভাবে বা মোটামুটিভাবে আমরা সাদাই বলে থাকি।

আলোচনার সুবিধার জন্য সমশক্তিসম্পন্ন বর্ণালী নিঃসরণকারী বস্তুর বর্ণকে আমরা সাদা বর্ণ বলে ধরবো। এরকম একটি সাদা রঙের বর্ণালীতে যদি কোনো বিশেষ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সামান্য পরিমাণে হলেও মাত্রাধিক্য হয় তবে আমাদের চোখে তার অনুভূতি হবে ধূসর বা অসংপৃক্ত বর্ণের (desaturated colour)। যদি এই বিশেষ তরঙ্গ

দৈর্ঘ্যের পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকে, তবে একসময় তার সংপৃক্তি সর্বোচ্চমানে পৌঁছবে। সেক্ষেত্রে সেই বর্ণকে আমরা বলি একবর্ণী বর্ণ (mono chromatic lighte colour) । এভাবে কোনো সংপৃক্ত বর্ণের সঙ্গে সাদা আলো মিশালে মিশ্রিত বর্ণ আমাদের চোখে অসংপৃক্ত বা ধূসর বর্ণের অনুভূতির সৃষ্টি করে। আগেই বলা হয়েছে অক্ষিপটের ফোডিয়া অঞ্চলের কেন্দ্রস্থল জুড়ে যে অতি ক্ষুদ্র হলুদ অঞ্চল (yellow spot) রয়েছে, সেইখানে বর্ণ সংবেদন সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তমভাবে হয়। তাই কোনো চোখ বর্ণবীক্ষণের জন্য দর্শন ক্ষেত্রের (field of view) মাত্র 2° কৌণিক পরিমাণ ব্যবহার করে। তারপরে ওই ক্ষেত্রের আরও 10° কৌণিক পরিসর জুড়ে তার বর্ণ বিচার চললেও, সে ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল কারণ ফোডিয়া অঞ্চল থেকে দূরে যতই অক্ষিপটের প্রান্তীয় অঞ্চলের দিকে সরে যাওয়া যাবে, ততই শংকু গ্রাহক কোষের সংখ্যা কমবে এবং বর্ণ বীক্ষণের সূক্ষ্মতা কমবে। দন্ড কোষেরা রং দেখতে পায় না বা বর্ণসংবেদী নয়।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে লাল, নীল ও সবুজ এই তিনটি প্রাথমিক বর্ণকে যথোচিত অনুপাতে মিশিয়ে বা সংযোগমূলক মিশ্রণ করে নানা রকম বর্ণ প্রস্তুত করা সম্ভব। এই ধরনের সংযোগমূলক মিশ্রণে তিনটি মৌলিক বর্ণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যই মেশানো হয়, তাই অনেকে একে বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থে মিশ্রণে বর্ণ প্রস্তুতির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেন। প্রথম ক্ষেত্রে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সংযোগমূলক মিশ্রণ এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাদের বিয়োজনমূলক মিশ্রণ (Substractive mixture of colour) হয়ে থাকে। আমরা রঞ্জক পদার্থের মিশ্রণের সময় বিয়োজনমূলক মিশ্রণে কিভাবে নূতন বর্ণের সৃষ্টি হয় সে সম্বন্ধে পরে আলোচন করবো।

(Additive Mixtures)

দেখা গেছে বিভিন্ন অনুপাতে লাল ও সবুজ আলোর মিশ্রণে সংপৃক্ত কমলা, হলুদ বা হলদেটে সবুজ বর্ণের সৃষ্টি করা যেতে পারে। আবার অন্য অনুপাতে লাল, সবুজ ও নীল মিশিয়ে সমশক্তি নিঃসরণকারী বর্ণ বা সাদা আলো তৈরি করা যায়। যদি এই ধরনের মিশ্রণে কোনো এক বিশেষ বর্ণ বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তার ফলাফল হবে স্পষ্ট ধূসর, হলুদ, নীলচে সবুজ বা গাঢ়লাল (Purple) বর্ণের সৃষ্টি।

আগের আলোচনাটিকে পরিপূরকপূর্ণ সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া গেছে তা বিশ্লেষণ করে দেখতে পাই, দুটি বর্ণ যদি পরস্পরের পরিপূরক হয় তবে তার অর্থ এই নয় যে তাদের গাঠনিক বর্ণগুলির উপরিপাতের ফলেও সাদা বর্ণের সৃষ্টি হবে।

উদাহরণ হিসাবে বলতে পারি একবর্ণী লাল, সবুজ এবং নীলের বিশেষ সংযোগমূলক মিশ্রণে সমশক্তি সম্পন্ন সাদা আলোর সৃষ্টি হয়েছে। সেই মিশ্রণ থেকে যদি নীল বর্ণকে বাদ দেওয়া হয়, বাকি বর্ণদুটি লাল ও সবুজ সাদাবর্ণের সৃষ্টি না করে হলুদ বর্ণের সৃষ্টি হবে। এবার সেই হলুদকে যদি নীলের সঙ্গে মেশানো হয় তবে তাদের

মিশ্রণে পুনরায় সাদা বর্ণের সৃষ্টি হবে। অতএব হলুদ ও নীল পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক বর্ণ হবে।

বৈশ্লেষিক পদ্ধতিতে আমাদের এই বক্তব্যকে প্রকাশ করতে পারি।

ধরা যাক এক বিশেষ বর্ণ হলুদকে Y দিয়ে প্রকাশ করা হোল, যদি এই হলুদ বর্ণ r পরিমাণ লাল R এবং g পরিমাণ সবুজ G এর মিশ্রনে প্রস্তুত হয় তবে

$$Y \cong r\,R + g\,G$$

এই সমীকরণে বিকশিত বর্ণ বামপাশে ≅ দিয়ে বোঝানো হচ্ছে বর্ণ সৃষ্টি বা বর্ণ বিকাশ হয়েছে। ডান পাশের সূচকগুলি হোল যাদের মিশ্রণে প্রার্থিত বর্ণ সৃষ্টি হয়েছে এবং + চিহ্নে তাদের মিশ্রণ বোঝানো হয়েছে।

14b.8 বর্ণ পরিমাপ

বর্ণ পরিমাপের জন্য ত্রিবর্ণভিত্তিক তন্ত্র (The Trichromatic System of Colour Measurement)

বর্ণ পরিমাপের জন্য যে ত্রিবর্ণ-ভিত্তিক তন্ত্রের কথা আলোচনা করছি, সেই তন্ত্র নিচের দুটি সুপরিচিত পরীক্ষাশ্রয়ী ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে।

(1) সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে, যে কোনো বর্ণই যেকোনো তিনটি আলোক উদ্দীপনার (লাল, সবুজ, নীল) যথোচিত সংমিশ্রণে বিকশিত (Match) হয়।

[With the restrictions, any colour can be matched by a suitable mixture of any three stimuli.]

(2) তিনটি উদ্দীপনার যথোচিত মিশ্রণে দুটি বর্ণ সৃষ্টি করা হলে, ওই সৃষ্ট বর্ণ দুটির যোগফল এই দুটি মিশ্রণের যোগফলের সমান হবে।

(If two colours are matched in turn by mixtures of three stimuli, then the sum of two colours will be matched by the sum of two mixtures.)

প্রথম সূত্র অনুসারে, যে কোন বর্ণই তিনটি পৃথক বর্ণের সাহায্যে তৈরি করা যায়। আমাদের ক্ষেত্রে এই তিনটি বর্ণ হোল তিনটি মৌলিক বর্ণ লাল, সবুজ, হলুদ। আমরা এই তিনটি বর্ণকে নিয়ে একটা মিশ্রণ তৈরী করলে সম্পূর্ণ নূতন এক বর্ণের সৃষ্টি হবে।

ধরা যাক R বর্ণের r পরিমাণ, G বর্ণের g পরিমাণ এবং B বর্ণের b পরিমাণ একত্রে মিশিয়ে একটি নূতন বর্ণ X তৈরী করা হোল। আংকিক পদ্ধতিতে প্রকাশ করলে

$$X = r\,R + g\,G + b\,B \qquad \text{— (1)}$$

এইভাবে নূতন এক বর্ণ Y তৈরি করার জন্য G, R ও B র পৃথক পরিমাণ যথাক্রমে g', r' এবং b' নেওয়া হল অর্থাৎ $Y = r'R + g'G + b'B$ — (2)

এইভাবে তিনটি বর্ণের যথোচিত সংমিশ্রণে যে কোনো বর্ণ X Y তৈরি করা যায়।

দ্বিতীয় সূত্রের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে : যদি X বর্ণকে Y বর্ণ থেকে পৃথক করানো যায় অর্থাৎ দুটি বর্ণ যদি সদৃশ হয় তবে —

$X = Y$ — (3)

এভাবে যদি দুটি বর্ণালী = বন্টন (Spectral distribution) আমাদের চোখে পরস্পর থেকে পার্থক্যহীন অবস্থায় থাকে, তবে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে একটি স্বতন্ত্র বর্ণ Z যোগ করলে, নূতন মিশ্রণ দুটিও পার্থক্যহীন দেখাবে।

অর্থাৎ $X + Z = Y + Z$ — (4)

এবার সমীকরণ (2) এবং (3) এর সাহায্য নিয়ে লিখতে পারি

$X = rR + gG + bB$

এবং $Y = r'R + g'G + b'B$ — (5)

X এবং Y-র মিশ্রণে যদি নূতন বর্ণ Z এর সৃষ্টি হয় তবে $Z = X + Y = (r + r') R + (g + g') G + (b + b') B$

এই সমীকরণটি অংকশাস্ত্রের ভেক্টর যোগফলের মধ্যে যেখানে (g, r, b) সহগগুলি হচ্ছে একটি ভেক্টরের উপাংশ এবং সহগ (g', r', b') হচ্ছে অপর ভেক্টরের উপাংশ এবং নূতন বর্ণ Z হচ্ছে ভেক্টর দুটির যোগফল।

এইভাবে বীক্ষণ বিজ্ঞান পদার্থবিদ ও গণিতজ্ঞকে সমানভাবে আকর্ষণ করেছে। বস্তুতঃ ভেক্টর তত্ত্বের সাহায্যে বিস্ময়করভাবে স্রোয়ডিংগার (schrodinger) বীক্ষণতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছিলেন।

মৌলিক বা প্রাথমিক বর্ণের মৌলিকতার বিচার

আমাদের আলোচনার শুরুতে যে প্রথম সূত্রের কথা বলা হয়েছে সেটি ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে **কোনো তিনটি ভিন্ন বর্ণের** আলোক উদ্দীপনার যথোচিত সংমিশ্রণে যে কোনো বর্ণকেই বিকশিত করা সম্ভব।

এই সূত্রের ব্যাখ্যায় লাল, সবুজ, ও নীল বর্ণকে **প্রাথমিক** বর্ণ ধরে তাদের সংমিশ্রণে দৃশ্যবর্ণালীর অন্তর্গত যে কোনো বর্ণ বিকশিত হয় বলে আমরা ধরেছি।

কিন্তু যে কোনো তিনটি বর্ণের জায়গায় শুধুমাত্র লাল, সবুজ, নীলকে প্রাথমিক বর্ণ বলে কেন ধরবো ? দৃশ্যবর্ণালীর অন্য তিনটি বর্ণকে কেন প্রাথমিক বলে ধরা যাবে না?

অর্থাৎ বর্ণ প্রস্তুতিতে কোনো বিশেষ তিনটি বর্ণের অপরিহার্যতা মেনে নেওয়া যায় না।

লাল, সবুজ, ও নীল উদ্দীপনার পরিবর্তে, যদি আমরা লাল, নীল ও হলুদ উদ্দীপনা ব্যবহার করে সবুজ বর্ণ তৈরী করতে চাই, তাহলে কি তা করা সম্ভব হবে?

বাস্তবিক পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে এই তিনটি বর্ণ ব্যবহার করে দৃশ্যবর্ণালীর বেশ কয়েকটি বর্ণ তৈরী করা গেলেও এভাবে যে সবুজ বর্ণের সৃষ্টি হয় তা কখনও প্রকৃত সবুজের সমকক্ষ নয়। তাহলে কি এই পদ্ধতিতে আমাদের পক্ষে সবুজ বর্ণ তৈরি করা সম্ভব নয়? উত্তর হল: যদি কিছু পরিমাণ লাল বর্ণ এই মিশ্রণে মেশানো যায়, তবে মিশ্রণটি প্রকৃত সবুজ বর্ণের সৃষ্টি করবে।

অর্থাৎ আমরা লাল বর্ণকে বর্ণ সমীকরণের অন্যপাশে রেখে লাল ও হলুদ বর্ণের মিশ্রণের সাহায্যে সবুজ বর্ণের সৃষ্টি করতে পারি।

গণিতের মার্জিত যুক্তি প্রয়োগ করে আমরা দেখাতে পারি লাল, হলুদ ও নীল বর্ণ ব্যবহার করে সর্বদাই যে (X) বর্ণ তৈরি করা যাবে, এ দাবি কখনোই সম্ভব নয় বরঞ্চ দেখা গেল (লাল বর্ণ + X) নীল ও হলুদ বর্ণের মিশ্রণের সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে।

এভাবে সমীকরণের একপাশ থেকে অন্য রাশিকে অপরপাশে সরিয়ে আনলে আমরা তাকে ঋণাত্মক রাশি হিসেবে গণ্য করি।

অতএব আমরা বর্ণসমীকরণের সহগগুলিকে যে ভাবে প্রকাশ করেছি তাতে দেখা যায় $X = g(G) + b(B) + r(R)$ সমীকরণের সহগগুলিকে (g, b, এবং r) ঋণাত্মক ও ধনাত্মক উভয় ভাবেই ব্যবহার করা যায়।

যদি আমরা ঋণাত্মক পরিমাণ বলতে সমীকরণের **অপর পাশে যোগকরা** বুঝি, তাহলে যে কোন বর্ণই যেকোন তিন বর্ণের দ্বারা সৃষ্টি করা যাবে এবং বর্ণ বিজ্ঞানে সে হিসাবে প্রকৃত পক্ষে বিশেষ কোন প্রাথমিক বর্ণের অস্তিত্ব নেই।

এবার প্রশ্ন আসে: সমস্ত ধরনের মিশ্রণের জন্য তিনটি বর্ণের শুধু ধনাত্মক পরিমাণ ব্যবহার করা যাবে কি? এর উত্তর হবে — না। কিছু কিছু বর্ণের জন্য তিনটি প্রাথমিক বর্ণের প্রত্যেকটি গুচ্ছের (set) সঙ্গে কিছু কিছু বর্ণের ঋণাত্মক পরিমাণ যোগ করা দরকার। অতএব আমাদের কাছে এমন কোন নিখুঁত (unique) ব্যবস্থা নেই যার সাহায্যে কোন এক প্রাথমিক বর্ণের সঠিক সংজ্ঞা দিতে পারি। প্রাথমিক পাঠ্যে লাল, সবুজ এবং নীল বর্ণকে

প্রাথমিক বর্ণ বলার কারণ হলো এদের সাহায্যে বহুসংখ্যক ভিন্নধর্মী বর্ণ তৈরি করা যায় এবং কিছু কিছু মিশ্রণে শুধুমাত্র বর্ণের ধনাত্মক পরিমাণ ব্যবহার করা হয়।

14b.9 বর্ণময়তা লেখ (Chromaticity diagram)

বর্ণ প্রস্তুতির আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি কিভাবে তিনটি আদর্শ উদ্দীপনার প্রয়োজনীয় পরিমাণ নিয়ে যে কোনো বর্ণের বিকাশ সম্ভব।

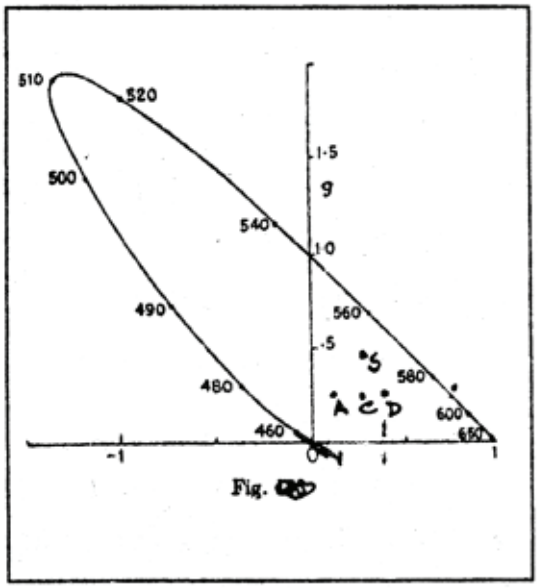

প্রাথমিক বা আদর্শ হিসাবে লাল (R), সবুজ (G) এবং নীল (B) উদ্দীপনাকে আমরা বেছে নিয়েছি। এবার যে এককগুলির সাহায্যে ওই তিন আদর্শ বা প্রাথমিক উদ্দীপনার পরিমাণ নির্বাচন করতে হবে, তার সংজ্ঞা দেওয়া প্রয়োজন। এই এককগুলিকে এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে (R), (G) এবং (B) এর সমপরিমাণ নিয়ে সাদাউদ্দীপনা (W) বা সাদাবর্ণের সৃষ্টি করা যায়।

চিত্র 14.8

এই সংজ্ঞায় একক পরিমাণ (X) [যে কোনো বর্ণ] হোল এমন এক পরিমাণ যা (R), (G), (B) উদ্দীপনার সংযোগ-মূলক মিশ্রণের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে এবং ওই তিনটি উদ্দীপনার পরিমাণ ত্রিবর্ণ ভিত্তিক এককে এমনভাবে নির্বাচিত হয়েছে যাতে তাদের যোগ ফলের সমান 1 হয়।

যদি এই ভিত্তিতে (R), (G) এবং (B) উদ্দীপনার পরিমাণ যথাক্রমে

r, g এবং b হয় তবে $r + g + b = 1$

এবং $1.0\ (X) = r(R) + g(G) + b(B)$ .... (1)

সমীকরণ (1) হোল একক ত্রিবর্ণভিত্তিক সমীকরণ (Unit Trichromatic Equation) এবং r, g. b হল তাদের ত্রিবর্ণ ভিত্তিক সহগ বা ত্রিবর্ণ ভিত্তিক স্থানাংক।

(1) নং সমীকরণে উল্লেখিত (X) বর্ণের পরিমাণকে এক ত্রিবর্ণভিত্তিক একক বা T একক বা বলা হয় এবং ≅ এর অর্থ আগেই বলা হয়েছে সমীকরণের ডান পাশের রাশিগুলোর মিশ্রণে, বামপাশের বর্ণ তৈরি হয়েছে।

এই ধরনের একক ত্রিবর্ণ ভিত্তিক সমীকরণে যে কোনো দুটি স্থানাংক জানা থাকলে তৃতীয় স্থানাংক $r + g + b = 1$ সম্পর্ক ব্যবহার করে সহজেই জানা যায়।

TABLE—1

mμ	r	g	b	mμ	r	g	b
440	–·008	·005	1·00	580	·645	·358	–·003
460	–·091	·052	1·04	600	·847	·154	–·001
480	–·367	·291	1·08	620	·942	·058	·000
500	–1·168	1·390	·778	640	·980	·020	·000
520	–·983	1·853	·130	660	·994	·006	·000
540	–·171	1·163	·008	680	·998	·002	·000
560	+·316	·688	–·004	700	1·000	·000	·000

অতএব (X) হচ্ছে যে কোন দুটি চলরাশির (variable) অপেক্ষক (function) এবং লেখচিত্রের সাহায্যে (X) বর্ণের সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে তার ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। এই ধরনের লেখচিত্রকে বর্ণময়তা লেখ (chromaticity diagram) বলা হয়।

এভাবে গণিতের সাহায্য নিয়ে লেখচিত্রের সাহায্যে আমাদের বক্তব্যকে পরিস্ফুট করা যেতে পারে।

এই বর্ণময়তা লেখে, (R) প্রাথমিক উদ্দীপনার আপেক্ষিক পরিমাণ (ভগ্নাংশে প্রকাশিত) r কে x অক্ষ বরাবর এবং অপর প্রাথমিক উদ্দীপনা (G) এর আপেক্ষিক পরিমাণ g কে y অক্ষ বরাবর প্রকাশ করা হয়। অবশিষ্ট বা তৃতীয় প্রাথমিক উদ্দীপনা (B) র আপেক্ষিক পরিমাণে $r + g + b = 1$ সমীকরণ থেকে পাওয়া যায়।

এই ধরনের লেখচিত্রের সাহায্যে বর্ণময়তা (chromaticity) ব্যাখ্যা করার জন্য আদর্শ বর্ণগুলির ক্ষেত্রে এমন এক বিশেষ ধরনের একক ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়া হয়েছে যাতে সাদা উদ্দীপনার ক্ষেত্রে $r = g = b = {}^1/_3$ হয়।

এই লেখচিত্রে লাল উদ্দীপনা (R) এর স্থানাংক (1,0) , সবুজ উদ্দীপনার (G) এর স্থানাংক (0, 1) এবং নীল উদ্দীপনার (B) স্থানাংক (0, 0) এবং সমশক্তি সম্পন্ন উৎস থেকে নিঃসৃত সাদা (W) র স্থানাংক $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$।

এই বর্ণময়তা লেখচিত্রে সংযোগসূত্রের প্রয়োগ করে নূতন বর্ণসৃষ্টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

যদি A ও D বিন্দুর দ্বারা দুটি আলোক উৎসের বর্ণময়তা প্রকাশ করা যায়, এবং ত্রিবর্ণ ভিত্তিক এককে তাদের ঔজ্বল্য যথাক্রমে M_A, M_D হয়, তবে তাদের যোগ করে যে বর্ণ মিশ্রণ পাওয়া যায় তার উজ্জ্বলতা হবে $(M_A + M_D)$ এবং C বিন্দুতে সেই বর্ণময়তা প্রকাশ পাবে। যদি A ও D বিন্দুতে যথাক্রমে দুটি ভর MA ও MD থাকতো, তবে C বিন্দুতে তাদের ভরকেন্দ্র থাকতো। বর্ণ মিশ্রণে C-র ভূমিকা সেইরকম এক ভর কেন্দ্রের মাপ।

বিশুদ্ধ বর্ণালীর বর্ণসমূহ এই বর্ণময়তা লেখচিত্রের বিভিন্ন বিন্দুর দ্বারা প্রকাশিত হয় এবং একটি রেখা দিয়ে

এই বিন্দুগুলি যোগ করলে যে বক্র পাওয়া যায় তাকে বলা হয় বিশুদ্ধ বর্ণালী সঞ্চার পথ (pure spectrum locus) । আলোকের প্রকট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (dominent wave length) এই লেখতে বিশেষ বিশেষ স্থানাংক বিন্দুর সাহায্যে প্রকাশিত হয়। সেইরকম একটি বিন্দু হোল D । লেখচিত্রের সাদা উদ্দীপনার সূচক বিন্দু S থেকে D বিন্দুর ভিতর দিয়ে সঞ্চার পথ পর্যন্ত রেখা টানলে D বিন্দুর অবস্থান ওই রেখার উপরেই থাকে। যতই বর্ণালীর বিশুদ্ধতা বাড়ে ততই D বিন্দু বর্ণালী সঞ্চার পথের দিকে সরে যায়।

লেখ থেকে দেখা যাচ্ছে বিশুদ্ধবর্ণালী সঞ্চার পথের আকার উত্তল এবং (0,0), (1,0) এবং (0,1) শীর্ষ বিন্দু বিশিষ্ট ত্রিভুজের বাইরের দিকে থাকে। পরীক্ষালব্ধ ফলাফল থেকে যেভাবে জানা গেছে যে বিশুদ্ধ বর্ণালী বর্ণ সাধারণভাবে আদর্শ উদ্দীপনাগুলির শুধুমাত্র সংযোগমূলক মিশ্রণে তৈরী হয় না, বরঞ্চ কোন কোন ক্ষেত্রে অল্প সাদা বা অল্প পরিমাণে, তৃতীয় উদ্দীপনা, অন্য দুই বর্ণের মিশ্রণে উৎপন্ন বর্ণের সঙ্গে মিলালে প্রার্থিত বর্ণ পাওয়া যায়। বর্ণময়তা লেখচিত্র সেই বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য পূর্ণ বা সহমত পোষণ করে।

নিচের সারণীর প্রথম স্তম্ভে বর্ণালীতে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অবস্থান, এবং বাকি তিনটি স্তম্ভে মিশ্রণে লাল (r) , সবুজ (g) এবং নীলচে বেগুনী রঙ (b) র ভগ্নাংশে প্রকাশিত পরিমাণ। ঋণাত্মক চিহ্নের দ্বারা বোঝানো হয়েছে, বর্ণ সৃষ্টির সময় আলোচ্য বর্ণের ভগ্নাংশ পরিমাণ বর্ণ সমীকরণের অপর পাশে রয়েছে।

উদাহরণ হিসাবে, সারণীর ৩নং পংক্তিতে 480mμ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সম্পন্ন বর্ণালী বর্ণ তৈরি করার সময় লাল উদ্দীপনা এককের 0.367 ভগ্নাংশ পরিমাণ আলোচ্য বর্ণের সঙ্গে যোগ করলে সবুজ উদ্দীপনা g এককের 0.291 পরিমাণ ও নীল উদ্দীপনার b এককের 1.08 ভগ্নাংশের মিশ্রণে উৎপন্ন বর্ণের সঙ্গে সদৃশ হবে।

যে এককে r, g, b কে মাপা হয়েছে, তারা সমানভাবে উজ্জ্বল নয়। তাদের ঔজ্জ্বল্য যথাক্রমে 1 : 4.591: 0.060। অনুপাতে রয়েছে এর ফলে গোটা বর্ণময়তা লেখ চিত্র জুড়ে বিভিন্ন বর্ণকে সমান ভাগে জায়গা করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

যদি ব্যবহৃত একক উদ্দীপনাগুলির উজ্জ্বলতা সমান হোত, তবে সাদা বর্ণ হলুদ বর্ণের খুব কাছে চলে যেতো। সেই ক্ষেত্রে অতি অল্প পরিমাণে নীল মিশিয়ে দিলে গোটা মিশ্রণের বর্ণই পাল্টে যেতো।

এই ধরনের অসমান ঔজ্জ্বল্যের জন্য বর্ণময়তা লেখের সর্বত্র উজ্জ্বলতার পরিমাণ এক হয় না। সবুজ অঞ্চলের উজ্জ্বলতা সবচেয়ে বেশি-আর সবচেয়ে কম উজ্জ্বলতা হোল নীল অঞ্চলে।

14b.10 বস্তুর বর্ণ বা রঙ (colour of bodies)

কোনো বস্তুর উপর সাদা আলো পড়লে, সেই সাদা রঙের ভিতরে থাকা দৃশ্য বর্ণালীর 7টি রঙের মধ্যে (V,I,B,G,Y,O,R = বে, ণী, আ, স, ক, লা) সে এই রংগুলিকে পুরোপুরি শোষণ করতে পারে। বস্তুটি অস্বচ্ছ হলে অন্য রঙের শোষণ ছাড়াও বাকি রংকে সে প্রতিফলিত করতে পারে। আবার বস্তুটি স্বচ্ছ হলে পরিমাণে সামান্য হলেও শোষণ, প্রতিফলন বাদে অন্য রংগুলিকে নিঃসরণ (transmission) করতে পারে। এভাবে সাদা আলোর ভিতরে থাকা বর্ণগুলি বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে শোষণ, প্রতিফলন এবং নিঃসরণ এই তিন পদ্ধতির যৌথ ক্রিয়ার

ফলে যে কোন বস্তুর রং বা বর্ণ নির্দেশিত হয়। অর্থাৎ যে রঙের আলো বস্তুটি নিঃসরণ বা প্রতিফলিত করতে পারে সেই রং-ই বস্তুর রং বা বর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

যদি এক টুকরো লাল রঙের কাচের ভিতর দিয়ে দৃশ্যমান বর্ণালীর দিকে তাকাই, তবে আমরা বর্ণালীর লাল অংশটুকুই দেখতে পাবো। সবুজ কাচ বর্ণালীর সবুজ অংশকে নিঃসরণ করলেও, লাল আলোকে শোষণ করে নেয়, এবার, যদি লাল কাচের টুকরোকে সবুজ আলোতে কিংবা সবুজ কাচের টুকরোকে লাল আলোর মধ্যে রাখা হয়, তবে দুটো রঙিন টুকরোকেই কালো দেখাবে। আবার লাল ও সবুজ রঙের দুটি কাচের টুকরে একসঙ্গে দিনের আলোতে রাখলেও, সেই সমন্বয়কে আগের মতোই কালো দেখাবে। কারণ তার ভিতর থেকে কোন আলোই নিঃসৃত হয়ে বাইরে আসতে পারে না। এ ঘটনা থেকে প্রমাণিত হোল স্বচ্ছ বস্তুর রং নিঃসরণের দ্বারা নির্ধারিত হয়।

অস্বচ্ছ বস্তু হিসাবে জবাফুলকে দিনের আলোতে লাল দেখায়, তার কারণ জবাফুলটি দৃশ্যবর্ণালীর আর সমস্ত রং শোষণ করলেও লাল রঙকে প্রতিফলিত করে। ফুল থেকে প্রতিফলিত হয়ে লাল তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো এসে চোখে পড়লে, ফুলটিকে তখন লাল দেখি। আবার এক টুকরো খুব পাতলা সোনার পাতকে হলুদ আলোয় রাখলে প্রতিফলনের ফলে পাতের রং আমাদের চোখে কমলাটে-হলুদ (কমলা রং + হলুদ রং) বলে মনে হবে। আবার সেই পাত থেকে নিঃসৃত আলোকে আমাদের নীলচে সবুজ রং-এর বলে মনে হয়।

এইভাবে বিশেষ বর্ণকে বাছাই করে তার প্রতিফলন বা নিঃসরণকে বলা হয় বৃত প্রতিফলন (selective reflection) বা বৃত শোষণ (selective transmission)। এই ধরনের বৃত প্রতিফলন এবং বৃত শোষণ বস্তুর রঙের ভিতরে নানা বৈচিত্র্য আনে।

এখন প্রশ্ন: রঙিন কাচের গুঁড়োর রং কেমন হবে? এর উত্তর হোল: রঙিন কাচের গুঁড়োর উপরে সাদা আলো ফেললে, কাচের গুঁড়োকে সাদা দেখাবে। এর কারণ হোল প্রতিটি আপতনের সময়, আপতিত সাদা আলোর কিছু অংশ প্রতিবারই প্রতিফলিত হয়। এভাবে বিপুল সংখ্যক প্রতিফলনের দরুন চূড়ান্ত প্রতিফলনে কাচের যে রঙ ছিল সেই রং-এর তুলনায় সাদা আলোর পরিমাণ অনেক বেশি হওয়ায় রঙিন কাচের চূর্ণ সাদা দেখায়।

দুটি ভিন্ন রঞ্জক পদার্থের মিশ্রণ (Mixture of two pigments)

এক বা একাধিক রঞ্জক পদার্থের সঙ্গে উপযুক্ত ধরনের তরল মিশিয়ে রং তৈরি করে অংকন শিল্পীরা ছবি আঁকেন।

এ ধরনের দুটি ভিন্ন বর্ণের রঞ্জক পদার্থ মিশিয়ে যে বর্ণ বা রং পাওয়া যায় তা কিন্তু দুটি বর্ণ বা দুটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোক উদ্দীপনার মিশ্রণের বর্ণ থেকে পৃথক হয়।

যেমন হলুদ ও নীল বর্ণের আলো মিশালে, মিশ্রণ থেকে যে আলো পাওয়া যায়, তা আমাদের চোখে সাদা আলোর অনুভূতি সৃষ্টি করে।

কিন্তু হলুদ ও নীল রঙের দুটি রঞ্জক পদার্থ মিশালে মিশ্রণের বর্ণ সবুজ হয়। এক্ষেত্রে মিশ্রণের বর্ণ বৃত শোষণ বা বৃত নিঃসরণ পদ্ধতির সাহায্যে স্থির হোল।

হলুদ বর্ণের রঞ্জক পদার্থের উপরে সাদা আলো পড়লে আপতিত সাদা আলোর কেবল মাত্র হলুদ ও তার পার্শ্ববর্তী সবুজ আলো প্রতিফলিত হয়ে চোখে পড়ে আর বাকি রংগুলি শোষিত হয়। এখানে হলুদ ও সবুজ রঙের বৃত প্রতিফলন হয়েছে।

নীল বর্ণের রঞ্জক পদার্থের উপরে সাদা আলো পড়লে নীল রঞ্জক পদার্থ সাদা আলোর দৃশ্যমান বর্ণালীতে উপস্থিত নীল ও তার পার্শ্ববর্তী সবুজ আলোকে বৃত প্রতিফলনের দ্বারা আমাদের চোখে পাঠায়।

এখন এই দুই বর্ণ অর্থাৎ হলুদ ও নীল রঙের রঞ্জক পদার্থের ওপর সাদা আলো ফেললে, কেবলমাত্র সবুজ বর্ণের আলোই ওই দুটি পদার্থের দ্বারা শোষিত না হয়ে প্রতিফলিত হবে। আর বাকি দুটি বর্ণ হলুদ ও নীল রং একে অপরকে শোষণ করে নেবে। ফলে ওই দু'রঙের রঞ্জক পদার্থের মিশ্রণ থেকে শুধু সবুজ আলো আমাদের চোখে পড়ে বলে আমরা সেই মিশ্রণকে সবুজ দেখি —

প্রশ্ন : (১) বর্ণ কাকে বলে। কিভাবে লাল ফুলকে চোখে লাল দেখায়?

প্রশ্ন : ২) রঞ্জক পদার্থ কাকে বলে? রঞ্জক পদার্থের মিশ্রণের রং এবং দুটি ভিন্ন বর্ণের আলোর মিশ্রণের রং কেন পৃথক হয়?

প্রশ্ন : ৩) বর্ণময়তা লেখ কি, তার সাহায্যে আমরা কিভাবে কোন বস্তুর রং ঠিক করি?

14b.11 বর্ণান্ধতা (Colour blindness)

অন্ধকার বীক্ষণে যেমন রাতকানা রোগ, আলোক বীক্ষণে এক বা একাধিক বর্ণের বীক্ষণের সময় বীক্ষণ যন্ত্রের ত্রুটির জন্য বর্ণান্ধতা দেখা যায়।

বর্ণান্ধতাকে তিনভাগে ভাগ করা হয়—

(১) ব্যতিক্রমী ত্রিবর্ণ দর্শন (anamalous trichromatism)

(২) দ্বিবর্ণ দর্শন (dichromatism)

এবং (৩) একবর্ণ দর্শন (mono chromatism)

(১) ব্যতিক্রমী ত্রিবর্ণ দর্শন ঃ

স্বাভাবিক চোখ ও বিকারগ্রস্ত চোখ উভয়েই দৃশ্যবর্ণালীর সব কটি বর্ণ উৎপাদনে তিনটি মূল বর্ণের ব্যবহার করে থাকে। তবে একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি কোনো এক নির্দিষ্ট বর্ণ উৎপাদনের সময় তিনটি মূল বর্ণকে যে অনুপাতে ব্যবহার করে, ব্যতিক্রান্ত ত্রিবর্ণদর্শীদের ক্ষেত্রে সেই পরিমাণ আরও বেশি হয়।

এই ধরনের বর্ণান্ধতাকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ

(ক) লোহিত বিচ্যুতি (Protanomaly) ঃ এ ক্ষেত্রে লাল রঙের প্রতি সংবেদনশীলতা স্বাভাবিক ক্ষেত্রের তুলনায় কম হয়। এই ধরনের বর্ণান্ধতা পারিবারিক সূত্র থেকে আসে।

(খ) সবুজ বিচ্যুতি (denteranomaly) ঃ এ ক্ষেত্রে সবুজ-অনুভূতি স্বাভাবিকের চেয়ে কম হয়। এটিও সাধারণত বংশগত ত্রুটি।

(গ) নীলবিচ্যুতি (triamony) ঃ এতে নীল অনুভূতি স্বাভাবিকের অপেক্ষা কম হয়। এ ধরনের বর্ণান্ধতা খুবই বিরল।

দ্বিবর্ণ দর্শন (dichromatism) ঃ

দ্বিবর্ণ বর্ণান্ধ লোকেরা তিনটি মূলবর্ণের মধ্যে একটি বর্ণ ছাড়া অপর দুটি বর্ণের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে না পারার জন্য মাত্র দুটি বর্ণকে দেখতে পায়।

এই শ্রেণীর বর্ণান্ধতাকেও তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

(a) লোহিত বর্ণান্ধতা (Protanopia), (b) সবুজ বর্ণান্ধতা (dueternopia) এবং (c) নীল বর্ণান্ধতা (tritanopia)

লোহিত বর্ণান্ধরা যেমন নীল রং ছাড়া লাল ও সবুজের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না, তেমনি সবুজ বর্ণান্ধ দর্শকেরা সবুজ রং ছাড়া মূলবর্ণের অন্য দুটি রং দেখতে পায়। অতি বিরল নীল বর্ণান্ধরা তেমনি নীল রং ছাড়া অন্যদুটি মূলবর্ণ দেখতে পায়।

একবর্ণ দর্শন ঃ

একবর্ণ দর্শনকে বলা হয় রাত্র্যন্ধতা বা রাতকানা রোগের (night blindness) বিপরীত অবস্থা। এই ত্রুটিতে চোখের দন্ড গ্রাহককোষ-কার্যকর থাকলেও, শংকুগ্রাহক কোষের বর্ণানুভূতি নষ্ট হয়। ফলে দিনের আলোতে এ জাতীয় বর্ণান্ধ ব্যক্তি গোটা পৃথিবীকে অন্ধকার বা ধূসর দেখে।

ইয়ং হেলস্ হোলজ মতবাদ :

এই বর্ণান্ধতাকে ব্যাখ্যা করার জন্য সর্ব প্রাচীন ব্যাখ্যা হোল সম্পূর্ণ পৃথক তিনটি বর্ণের জন্য প্রতিটি স্বাভাবিক চোখে তিন ধরনের শংকু গ্রাহক কোষ রয়েছে। তাদের প্রত্যেকে এক একটি বিশেষ বর্ণকে তুলনামূলকভাবে অধিকতর পরিমাণে গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে। এদের মধ্যে কিছু কোণ লাল আলোতে বেশি উদ্দীপ্ত হয়। কেউবা নীল আলো আবার কোনটি হয়ত সবুজ আলোর প্রতি তার সংবেদনশীলতা দেখায়। যেসব দর্শকের চোখে এ ধরনের দু-প্রস্থ শংকু গ্রাহক কোষ অনুপস্থিত বা নিষ্ক্রিয় থাকে তারা সম্পূর্ণ বর্ণান্ধ। আবার যাদের ক্ষেত্রে যেকোনো একপ্রস্থ শংকু কোষ অনুপস্থিত থাকে অর্থাৎ হয় লাল আর না হয় নীল-সংবেদী শংকুকোষ অনুপস্থিত থাকে তারা দ্বিবর্ণ-বর্ণান্ধ এবং যেহেতু স্বাভাবিক সুস্থ চোখ তিনটি মৌলিকবর্ণকে সমানভাল দেখতে পায় ও তাদের পার্থক্য বুঝতে পারে, সেজন্য এ ধরনের দর্শককে বলা হয় ত্রিবর্ণ দর্শক (Trichromates)।

আধুনিককালে পূর্বের মতবাদের পরিবর্তে বিরুদ্ধ প্রক্রিয়াশ্রয়ী মতবাদে (opponent process theory) বলা হয়েছে কিছু কিছু তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো বা বর্ণ স্নায়ুপক্ষের গ্যাগ্লিয়ন কোষে উদ্দীপনা সৃষ্টি করলে, অন্য বর্ণেরা সেখানে বাধার সৃষ্টি করে।

এইসব রং হল লাল ও সবুজ, হলুদ ও নীল এবং সাদা ও কালো। জুটি বর্ণালীগত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় প্রথম দুটি তরঙ্গ যুগলের জন্য যেমন সাদা আলোর সৃষ্টি হয়, তেমনি সাদা-কালোর সংমিশ্রণে অন্ধকার বা ধূসর বর্ণের জন্য দায়ী।

এই তত্ত্বে আরও বলা হয়েছে কোনো দর্শন স্নায়ু হয়ত এইসব বর্ণ যুগলের মধ্যে কোনো একটি রং ধরা যাক হলুদকে বেশি পরিমাণে মস্তিষ্কে বয়ে নিয়ে গেল অথচ স্বাভাবিক পরিমাণ নীল রংকে সে বহন করে নিয়ে গেল না। আবার অনুরূপভাবে লাল ও সবুজের মধ্যে সবুজ উদ্দীপনা লালের অপেক্ষা বেশি পরিমাণে মস্তিষ্কে গচ্ছিত হোল। ফলে বর্ণযুগলের মধ্যে যে সমতা থাকলে প্রার্থিত বর্ণের সৃষ্টি হতো, তার ব্যাঘাত ঘটে, তার জন্য বর্ণানুভূতিতে ত্রুটি ঘটে। এই বর্ণানুভূতির ত্রুটিই হল বর্ণান্ধতা।

14b.2 পতঙ্গের পুঞ্জাক্ষি (Compound eye of insects)

এই জীবজগতে একমাত্র মানুষেরই যে চোখের মতো দৃষ্টি যন্ত্র আছে তা' নয়, অন্যান্য মেরুদন্ডী প্রাণীদেরও চোখ আছে। নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীদের অনেকের চোখ তেমন সুগঠিত বা জোরালো না হলেও, অমেরুদন্ডী শ্রেণীর পতঙ্গদের অনেকেরই পুঞ্জাক্ষি নামে বেশ উন্নত ধরনের চোখ রয়েছে। আবার কোন কোন পতঙ্গের বড়বড় পুঞ্জাক্ষি ছাড়াও বাড়তি সরল চোখ রয়েছে।

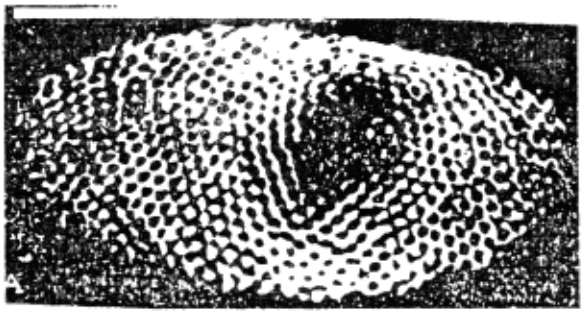

মৌমাছির পুঞ্জাক্ষি এখানে আমাদের আলোচনার বিষয়। বৈজ্ঞানিকেরা মধুর প্রতি মৌমাছির স্বাভাবিক টানকে কাজে লাগিয়ে, তাদের পুঞ্জাক্ষির বীক্ষণ সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সেই সংগৃহীত তথ্য একদিকে যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি অন্যদিকে কীট পতঙ্গের বীক্ষণ বিজ্ঞানের অনেক অজানা দিগন্ত আমাদের কাছে উন্মুক্ত করেছে। লাল বা নীল রঙের কাগজে মধু রেখে পরীক্ষা করেছেন, কোন রঙের কাগজের মধু মৌমাছিকে আগে আকর্ষণ করে? আমাদের চোখে যা সাধারণভাবে সাদা, সেই সব সাদা ফুলকে এক জায়গায় রেখে তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেছেন মৌমাছির চোখে সব সাদা ফুলই একরকম সাদা নয়। সাদারও রকম ফের আছে। কিভাবে তারা বিভিন্ন রঙের মধ্যে পার্থক্য বোঝে? সাধারণভাবে একই রং-এর মনে হলেও তারা যে বিভিন্ন—এ পার্থক্যকে তারা কোন কৌশলে পৃথক করতে পারে ? বৈজ্ঞানিকেরা তার সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মানুষের চোখ দৃশ্যবর্ণালীর লাল (তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 7000Å) থেকে বেগুনী (400Å) পর্যন্ত রংগুলিকে দেখতে পায়। কিন্তু মৌমাছিরা সে জায়গায় (400Å তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের)বেগুনী রং ছাড়িয়ে আরও নিচের দিকে (3000Å পর্যন্ত বিস্তৃত) অতি বেগুনী রশ্মিও দেখতে পায়। তাই

ফুলের যে সব রং আমরা দেখতে পাই না মৌমাছিরা সেগুলি অনায়াসে দেখে। এই সমস্ত রঙ কোনো বিশেষ ফুলের প্রতি মৌমাছিদের আকর্ষণ করার জন্য সংকেত হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

চিত্র 14.9

আমরা জানি কোনো ফুল সাদা তার অর্থ হোল ফুলটি সূর্যের সাদা আলোতে থাকা বহু তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের কোনটিই শোষণ করে না — সবগুলিকেই প্রতিফলিত করে। মৌমাছিরা জানে সাদা ফুলটি দৃশ্যবর্ণালীর সবগুলি রংকেই প্রতিফলিত করে ফেরত পাঠালেও অতি বেগুনী রশ্মিকে বিভিন্ন মাত্রায় শোষণ করে। ফলে মৌমাছিরা সহজেই বুঝতে পারে সাধারণভাবে সাদা ফুলগুলি ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় অতি বেগুনী রশ্মি প্রতিফলিত করছে। এভাবেই কোনো সাদা ফুলই মৌমাছির কাছে সাদা নয়। কারণ, কোনো সাদা ফুলই আপতিত অতি বেগুনি রশ্মির শতকরা একশোভাগই প্রতিফলিত করতে পারে না।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে মৌমাছিরা লাল আলো দেখতে পায় না। আমাদের ধারণা মতো সব লাল ফুলকেই মৌমাছির চোখে কালো দেখা উচিত। কিন্তু তা হয় না। যে কোনো ধরনের লাল ফুলকে খুঁটিয়ে দেখলে আমাদের চোখেও ধরা পড়ে লাল ফুল থেকে লাল রঙ ছাড়াও একটা নীলচে রং বেরিয়ে আসছে। এভাবে নীলচে রং বেরিয়ে আসার কারণ হিসাবে বলতে পারি লাল ফুলটি লাল রং ছাড়াও বাড়তি অল্প নীল রং-ও প্রতিফলিত করে — যা মৌমাছির চোখ এড়ায় না। এর ফলেই লাল বর্ণান্ধ মৌমাছিরা কি পরিমাণ নীল রঙ প্রতিফলিত হচ্ছে তার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের লাল ফুলকে চিহ্নিত করতে পারে।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে একই ফুলের বিভিন্ন পাপড়ি থেকে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ অতি বেগুনি রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে বেরিয়ে আসে। যদি আমাদের চোখ অতি বেগুনি রশ্মি দেখতে পেতো তাহলে ফুলগুলিকে আরও সুন্দর, আরও পৃথক দেখাতো।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে কিছু কিছু লাল ফুল একেবারেই নীল বা অতি বেগুনী রশ্মি প্রতিফলিত করে না। মৌমাছিরা এ ধরনের ফুলকে কালো বলেই দেখবে। আবার মৌমাছিরা এসব ফুলকে কালো দেখলেও, এক ধরনের মধু-খাদক ছোট পাখি হামিংবার্ডের কাছে তারা লাল-ই! কারণ হামিবার্ডেরা লাল রঙ ভালো দেখতে পায়।

মৌমাছির বীক্ষণ ক্রিয়ার আরও একটি চিত্তাকর্ষক দিক হোল আকাশে সূর্যকে সরাসরি না দেখেও আলোকিত নীল আকাশের এক ক্ষুদ্র অংশ দেখে মৌমাছিরা সূর্যের দিক ঠিক করে নেয়। আমাদের পক্ষে এ ধরনের কাজ করা সম্ভব নয়। সূর্যকে সরাসরি না দেখে বা মেঘে ঢাকা আকাশের অতি ক্ষুদ্র নীল রঙের একটা টুকরো দেখে সূর্যের দিক ঠিক করা আমাদের পক্ষে অসম্ভবের পর্যায়েই পড়ে। মৌমাছিরা তা করতে পারে কারণ মৌমাছিদের চোখ

আলোক সমবর্তন (poliration) ক্রিয়ার প্রতি অতি মাত্রায় সংবেদনশীল এবং আকাশ থেকে প্রতিক্ষিপ্ত (scattered) আলোক সমবর্তিত।

মানুষের চোখ যেখানে প্রতি সেকেন্ডে কুড়িটি পর্যন্ত আলোক স্পন্দন (fliculer) দেখতে পায় বা বুঝতে পারে সেখানে মৌমাছিরা অনায়াসে প্রতি সেকেন্ডে দু'শোর মতো স্পন্দন দেখতে পায়! মৌচাকের উপরে মৌমাছিদের বিচরণ এবং তার সঙ্গে তাদের ডানার সঞ্চালন এত দ্রুত হয় যে, আমাদের চোখ তার সঙ্গে তাল না রাখতে পারলেও, মৌমাছিরা সেই ক্ষিপ্রতা অনায়াসে বুঝতে পারে।

মৌমাছিদের যে বীক্ষণ সূক্ষ্মতার পরিচয় এতক্ষণ ধরে পেয়েছি, এবার তার উৎস এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

মৌমাছির মাথার বাইরের দিকে প্রায় গোলীয় এক তলের উপরে প্রচুর পরিমাণে বিশেষ ধরনের অক্ষিকোষ "অক্ষিকা" (ommatadia) কৌণিকভাবে সাজিয়ে মৌমাছির পুঞ্জাক্ষি তৈরি হয়েছে। এই ধরনের অক্ষিকোষগুলি আবার কয়েকটি অণু-অক্ষিকা (ommatadium) দিয়ে গঠিত। এ ধরনের অণুঅক্ষিকার ছবি পাশে দেওয়া হোল। প্রতিটি অণু অক্ষিকার শীর্ষে লেন্সের মতো একটা স্বচ্ছ জায়গা রয়েছে। তাকে লেন্সের মতো না বলে ফিল্টার বা আলোক-নল (light tube) বলাটা বোধহয় অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে। কারণ অণু-অক্ষিকার ভিতরে একট সরু সুতোর মত অংশ বেয়ে আলোর ধারা নেমে যায়। সম্ভবত: আলো এখানেই শোষিত হয়, এই সুতোর শেষ প্রান্ত, দর্শন স্নায়ুসূত্রে এসে মিশেছে। এভাবে এক একটি অক্ষিকায় একটি কেন্দ্রীয় সূত্রের চারপাশে 6টি করে অণুঅক্ষিকা কেণিকভাবে এমন করে ঘিরে থাকে যাতে আলোচ্য সূত্রটি স্বতন্ত্র হিসেবে থাকে। এইভাবে তৈরি হয় মৌমাছির পুঞ্জাক্ষির এক একটি অক্ষিকা। এভাবে অনেক অক্ষিকা বা অক্ষকোষ কৌণিক সজ্জায় সারা চোখ জুড়ে সাজানো থাকে। কোনো একটি অক্ষিকা যদি একদিক থেকে সংবেদন গ্রহণ করে, তবে তার ঠিক পরের কোষটি অন্যদিক থেকে সংবেদন গ্রহণ করবে, এইভাবে পরের পর অক্ষিকা বা অক্ষিকোষগুলি কোণ বস্তু থেকে সংবেদন গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় মস্তিষ্কে প্রেরণ করে এবং মৌমাছিরা দুটি অক্ষিকার মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয়ে ভালোভাবে দেখতে পায় না। মৌমাছির চোখে যে বীক্ষণ-সূক্ষ্মতার সৃষ্টি হয় তা নিশ্চিতভাবে একটি কোণের সংঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবে। সেই কোণটি হোল তার চোখের বক্রতা-কেন্দ্র সাপেক্ষে কোণ অণু অক্ষিকার (ommatidiam) শেষাংশের কোণ।

একটি অণু অক্ষিকা থেকে ঠিক তার পরের অণু অক্ষিকা পর্যন্ত এই কোণের মান হোল অক্ষিকার ব্যাস এবং চোখের ব্যাসার্ধের (r) অনুপাত।

$$\text{অর্থাৎ } \Delta\theta g = \frac{\delta}{r}$$

δ-র মান যত সূক্ষ্ম হবে ততই মৌমাছির চোখের বীক্ষণ সূক্ষ্মতা বাড়বে। তবুও এই δ-র মানকে একটা

নির্দিষ্ট মানের অপেক্ষা কম করা যায় না, তার কারণ তাতে অপবর্তনজনিত ত্রুটি এসে যাবে। আবার δ-র মান বেশি করলে বীক্ষণ বা দেখাটা ততো স্পষ্ট হবে না।

যদি এমন এক দূরত্ব (d) নির্বাচন করা হয়, যাতে অস্পষ্টতাজনীত ত্রুটি এবং অপবর্তনজনিত ত্রুটিকে ন্যূনতম রাখা সম্ভব হয় তবে সেক্ষেত্রে অক্ষিকার ব্যাস হবে — $\delta = \sqrt{\lambda r}$

যদি চক্ষুতলের ব্যাস r = 3 মিমি, এবং মৌমাছি যদি 4000Å তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে ভালো দেখতে পায় তবে

$\delta = \sqrt{3 \times 10^{-3} \times 4 \times 10^{-7}}$ meter

$= 3.5 \times 10^{-5}$m বা 35μ

অতএব মৌমাছির চোখের আকার কত ক্ষুদ্র! আমাদের চোখের তুলনায় মৌমাছির চোখের বিশ্লেষণী ক্ষমতা অতীব অল্প।

আমাদের চোখে যে প্রতিবিম্ব গঠিত হয় তার আকার মৌমাছিদের চোখে গঠিত বিম্বের আকারের তুলনায় 30 গুণ ছোট। আমাদের চোখে গঠিত বিম্বের তুলনায় মৌমাছি আবছা ও অফোকাসিত বিম্ব দেখে। অবশ্যই তাদের চোখে সেটাই সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা । কারণ আমাদের চোখের মতো না আছে তাদের সুগঠিত চোখ, না আছে তাতে কোন চক্ষু লেন্স, ভাগ্যিস নেই! প্রথমত: মৌমাছিরা অতি ক্ষুদ্র প্রাণী। যদি আমাদের চোখের মতো তাদের চোখ হোত অবশ্যই তাদের অনুপাতে, তবে চক্ষু ছিদ্রের আকার হোত 30μ-র মতো। এতে তখন অপবর্তন ক্রিয়া এত উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যেত যার জন্য তাদের দেখার কাজটা একেবারেই ভালো হোত না। চোখের আকার কম হলে, সেই চোখে ভালো দেখা যায় না। বড় চোখে ভাল দেখে। আচ্ছা, ধরা যাক মৌমাছির চোখ তার মাথার মতো বড় বড় হোল। তাহলে তার গোটা মাথা জুড়েই চোখ থাকতো। পুঞ্জাক্ষির সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হলো তার জন্য কোনো জায়গা না লাগা - মৌমাছির দেহতলের উপরে একটা পাতলা স্তরের মতো এটি থাকে (it is just a very thin layer on the surface of the bee) সেজন্য যখন আমরা বলি মৌমাছিদের আমাদের মতো দেখতে পাওয়া উচিত ছিল, তখন তাদের নিজস্ব সমস্যার কথা চিন্তা করা উচিত।

14b.13 আরও অন্য চোখের কথা (other eyes)

মৌমাছি ছাড়াও অপরাপর অনেক প্রাণীই রং দেখতে পায়। মাছ, প্রজাপতি, পাখি এবং অনেক সরীসৃপই রং চিনতে পারে অথচ অধিকাংশ স্তন্যপায়ী জীবই তা পারে না। পাখিরা নিশ্চিতভাবে রং দেখতে পায় এবং সেজন্য প্রকৃতিতে এত রঙিন পাখির ছড়াছড়ি। স্ত্রী পাখিদের মনোরঞ্জনে পুরুষ পাখির পালকে এত রঙের বাহার। পাখিদের যৌনমিলনে রঙের একটা বিশাল ভূমিকা রয়েছে। আমরা যখন কোনো ময়ূরের দিকে তাকাই তখন তাকে রাজকীয় বর্ণের উজ্জ্বল বিজ্ঞাপন বললেও খুব একটা বেশি বলা হয় না। বিস্ময়করভাবে একই সঙ্গে রঙের সুষমা

এবং কোমলতার সংমিশ্রণ ময়ূরের ক্ষেত্রে যে ভাবে হয়েছে তাতে ময়ূরীর রুচিকে সব প্রশংসার উর্ধ্বে রাখতে হয়।

সমস্ত অমেরুদন্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে দেখার জন্য হয় অগঠিত, ক্ষীণ দর্শন ক্ষমতাযুক্ত চোখ বা পুঞ্জাক্ষির ব্যবস্থা রয়েছে। আর সব মেরুদন্ডী প্রাণীদের আমাদের চোখের মতো চোখ রয়েছে। তবে একটা ব্যতিক্রম আছে, অমেরুদন্ডী প্রাণী অক্টোপাসের চোখ অন্যান্য অমেরুদন্ডীদের চোখের তুলনায় অনেক উন্নত, সুগঠিত এবং পৃথক। অমেরুদন্ডীদের তুলনায় অক্টোপাসের মস্তিষ্ক এবং তার ক্রিয়াকলাপ অনেক উন্নত, তাদের চোখে রয়েছে অচ্ছোদপটল বা কর্ণিয়া, চোখের পাতা, কণিনীকা এবং দুপাশের কক্ষে তরল নেত্ররস নিয়ে মাঝখানে চক্ষু লেন্স এবং সবশেষে অক্ষিপট। এ চোখ অমেরুদন্ডীদের মতো বিন্দু চক্ষু (eye spot) বা পুঞ্জাক্ষির মতো নয়, একেবারে মেরুদন্ডী প্রাণীদের চোখের অনুরূপ।

ভ্রূণঘটিত বিকাশের ক্ষেত্রে (in the embyonic development) মেরুদন্ডী প্রাণীদের অক্ষিপট যেমন মস্তিষ্কের অংশ হিসাবে পরিগণিত হয়, অক্টোপাসের ক্ষেত্রেও আশ্চর্যজনকভাবে একই ঘটনা ঘটে। কিন্তু এই দুই-এর মধ্যে একটা চিত্তাকর্ষক পার্থক্য রয়েছে। তা হোল অক্টোপাসের চোখের আলোক সংবেদনী কোষগুলি থাকে ভিতরের দিকে আর বিশ্লেষণকারী কোষগুলি থাকে তাদের পিছনে অর্থাৎ বাইরের দিকে। আমাদের চোখের তুলনায় এই ব্যবস্থা একেবারে উল্টো। আমাদের বিবেচনায় প্রকৃতি যখন দেখলো যে কোষগুলির বাইরে থাকার কথা তাদের বাইরে এনে বিশেষ কোনো লাভ হয়নি, সেই ত্রুটি সংশোধনের জন্য তখন সে অক্টোপাসের চোখ দুটিকে খাড়া সোজাভাবে বাইরে ঠেলে বের করে আনলো।

সামুদ্রিক প্রাণী দানব ইকুইডের চোখের আকার সর্ববৃহৎ, তাদের এক একটা চোখের ব্যাস ১৫ ইঞ্চির মতো।

14b.15 প্রশ্নাবলি

(ক) অভিযোজন এবং উপযোজন কাকে বলে? এদের মধ্যে পার্থক্য কি?

(খ) আঁধার বীক্ষণ কি? আলোক বীক্ষণের সঙ্গে তার পার্থক্য কি?

(গ) আঁধার বীক্ষণে অক্ষিপটের কোন গ্রাহক কোষ অংশ নেয়? তাদের অবস্থা এ ধরনের বীক্ষণে কোন ভূমিকা নেয়?

উঃ অক্ষিপটের প্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থান হওয়ার দরুণ ক্ষীণ আলোকে বীক্ষণের কাজ, গতিশীলতা সংবেদন এবং অবার্ন (achromatic) বীক্ষণ অনুভূতি এবং একপেশে (adverted eye) বীক্ষণে ক্ষীণ আলোক উৎসের সনাক্তকরণ প্রভৃতি কাজে দন্ডগ্রাহক কোষেরা অংশগ্রহণ করে।

(ঘ) আলোক বীক্ষণের বৈশিষ্ট্য কি? [বর্ণানুভূতি, বীক্ষণ সূক্ষ্মতা প্রভৃতি]

প্রঃ পারকিনজি ক্রিয়া কি?

উঃ আঁধার বীক্ষণ থেকে আলোক বীক্ষণের সময় চোখের নিম্ন তরল দৈর্ঘ্য অঞ্চল থেকে উচ্চতর দৈর্ঘ্য অঞ্চলে বীক্ষণ সূক্ষ্মতা সরণকে পারকিনজি ক্রিয়া বলে।

(ঙ) বস্তুর বর্ণ কিসের উপর নির্ভর করে?

উঃ উজ্জ্বলতা, প্রকট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এবং বর্ণ সংপৃক্তির উপর।

(চ) দৃষ্টি নির্বন্ধ কি? বর্ণ ক্লান্তির সঙ্গে তার পার্থক্য কি?

(ছ) বর্ণানুবেদন কাকে বলে ? বর্ণানুবেদন কয় প্রকার ও কি কি?

(জ) রাতকানা বা রাত্রন্ধতা (Night blindness) অসুখ কোন বীক্ষণের বৈশিষ্ট্য দন্ডগ্রাহক কোষের পর্যাপ্ত অনুপস্থিতি এর খাদ্যে ভিটামিন A-র অভাব রাতকানা রোগের জন্য দায়ী। এটি আঁধার বীক্ষণ ক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত।

(ঝ) প্রবল আলোয় আঁধার বীক্ষণ ব্যবস্থা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে কেন? কারণ আঁধার বীক্ষণ ব্যবস্থায় মূল অংশগ্রহণকারী দন্ডকোষের উপরে অবস্থিত রঞ্জক পদার্থ তীব্র আলোয় ভেঙে যেতে থাকে।

(ঞ) বীক্ষণ সূক্ষতা কি? কোন কোন শর্তে বীক্ষণ সূক্ষ্মতার মান সর্বাধিক হয় ? সর্বদা কি চোখ এই শর্ত মেনে চলে?

(ট) ভার্নিয়ার বীক্ষণ ও দ্বিনেত্র বীক্ষণের মধ্যে পার্থক্য কি?

ভার্নিয়া বীক্ষনে একটি চোখ বা দুটি চোখ যে কৌশলে মূল স্কেলের দাগ ও ভার্নিয়ার স্কেলের দাগের মধ্যে 1 মিলিমিটারের $\frac{1}{50}$ ভাগ পর্যন্ত সরণ দেখতে পায় তাকে ভার্নিয়া বীক্ষণ বলে।

দ্বিনেত্র দর্শনে বাঁ-চোখ বস্তুর বামদিকের অংশ এবং ডান চোখ বস্তুর ডান দিকের অংশ দেখে দর্শকের কাছে বস্তুর সম্পর্কে ত্রিমাত্রিক ধারণা, আপেক্ষিক অবস্থান ও গভীরতা সম্বন্ধে ধারণা জন্মায়।

14b.14 সারাংশ

আঁধার বীক্ষণ হোল অন্ধকারে বা ক্ষীণ আলোকে বীক্ষণ ব্যবস্থা। এতে অক্ষিপটের সংখ্যাগুরু দন্ডগ্রাহক কোন অংশ গ্রহণ করে তীব্র আলোতে দন্ডগ্রাহক কোষের উপরে রডোপসিন নামে এক ধরনের ক্রোমোপ্রোটিন থাকে তারা ভেঙে যায় এবং আঁধার বীক্ষণ ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যায়। পুনরায় অন্ধকারে গেলে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় রডোপসিনের পুনঃ সৃজন হয় এবং অন্ধকার বীক্ষণের দক্ষতা ধীরে ধীরে অর্জিত হতে থাকে।

আলোক বীক্ষণ ব্যবস্থা হোল আঁধার বীক্ষণ ব্যবস্থার বিপরীত। তীব্র আলোতে শংকু গ্রাহক কোষের সক্রিয়তায় এ ধরনের বীক্ষণ চলে। উজ্জ্বলতার আপেক্ষিক পার্থক্যে চোখের বর্ণানুভূতি হয়। আলোক বীক্ষণে বস্তুর বর্ণ সম্পর্কে ধারণা জন্মায়। অন্ধকার থেকে আলোয় এলে একই চোখের চরম বীক্ষণ অনুভূতি অন্ধকারে নীল অঞ্চলের থেকে লাল অঞ্চলে সরে আসে, এই ঘটনা পারকিনজি ক্রিয়া নামে পরিচিত।

দৃষ্টি নির্বন্ধঃ যে কোন দৃশ্যই স্বাভাবিক চোখে $\frac{1}{10}$ সেঃ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই সময়ের ভিতরে অন্য দৃশ্য এলে চোখ তাকে দেখতে পায় না। এই ঘটনাকে দৃষ্টি নির্বন্ধ বলে।

বর্ণ ক্লান্তি — একটানা একটি বর্ণের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ চোখকে সরিয়ে নিলে সেই রঙিন বস্তুর জায়গায় অন্য বর্ণে রঞ্জিত তারই মতো বস্তুর অনুভূতি চোখ লেগে থাকে। এই ঘটনাকে বলা হয় বর্ণ ক্লান্তি লাল বস্তুর জায়গায় চোখ অন্যদুটি প্রাথমিক বর্ণ নীলাভ-সবুজ রঙে চিত্রিত বস্তুর প্রতিবিম্ব দেখে।

অনুবেদন: একটানা অনেকক্ষণ কোন বস্তুর দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বস্তু থেকে চোখ সরিয়ে নিলে বা বস্তুকে চোখ থেকে সরিয়ে নিলে, চোখের উপর রেশ লেগে থাকে এ ঘটনাকে বলা হয় অনুবেদন (after image) অনুবেদন দু'রকমের অবার্ন অনুবেদন এবং সবর্ণ অনুবেদন বীক্ষণ সূক্ষ্মতা হোল মানুষের চোখের যে ক্ষমতার জন্য কোন বস্তুতে অবস্থিত দুটি স্বতন্ত্র ভৌত উদ্দীপনাকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হয়।

বর্ণবীক্ষণ: উজ্জ্বল আলোকে, আলোক সহিষ্ণু চোখে এবং শংকু কোষের সাহায্যে দর্শন বস্তুর রং দেখতে পায়। সাদা আলোতে 7টি দৃশ্য রং রয়েছে। এদের মধ্যে লাল, সবুজ, নীল হোল মৌলীকরণ বা প্রাথমিক বর্ণ। কারণ এদের যথোচিত সংমিশ্রণে বর্ণালীর অন্যান্য রঙের সৃষ্টি হয়। পরিপূরক বর্ণ হোল, এমন দুটি বর্ণ যাদের মিশ্রণে সাদা আলোর অনুভূতি হয়। যেমন হলুদের সঙ্গে নীল মেশালে সাদা বর্ণের অনুভূতি জন্মায় বলে তারা পরস্পরের পরিপূরক বর্ণ।

বর্ণ মিশ্রণের সাহায্যে যে অন্য বর্ণ তৈরি হয় তাদের পরিমাণ নির্দিষ্ট করার জন্য ত্রিবর্ণভিত্তিক তন্ত্র রয়েছে।

বর্ণময়তা লেখ: এই লেখের সাহায্যে তিনটি প্রাথমিক বর্ণের সংমিশ্রণে কিভাবে বিভিন্ন বর্ণের সৃষ্টি হয়, সেই পরীক্ষালব্ধ ফলকে জ্যামিতিক উপায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

বস্তুর বর্ণ হল - সাদা আলোর দৃশ্যমান বর্ণালীর যে অংশ প্রতিফলন করে, সেই বর্ণই বস্তুর বর্ণ।

আর রঞ্জক পদার্থের বর্ণ সাদা আলোর দৃশ্যমান বর্ণালীর নির্বাচিত অংশের বৃত প্রতিফলন বা বৃতনিঃসরণের উপর নির্ভর করে।

তিনটি প্রাথমিক বর্ণের মিশ্রণের ফলে যে বর্ণের সৃষ্টি হয়, দুটি রঞ্জক পদার্থের মিশ্রণে সেই রংএর সৃষ্টি না-ও হতে পারে।

বর্ণান্ধতা হল চোখের একপ্রকার ত্রুটি যার জন্য যে বিশেষ বিশেষ বর্ণ দেখতে পায় না।

নিম্নশ্রেণীর অমেরুদন্ডী প্রাণীদের চোখে পুঞ্জাক্ষি নামে এক ধরনের বীক্ষণ ব্যবস্থা রয়েছে। পুঞ্জাক্ষি হল বহু সংখ্যক অণু- অক্ষিকার সমাহার। মৌমাছিরা পুঞ্জাক্ষি দিয়ে দৃশ্য বর্ণালীর অন্য রঙ ছাড়াও অতি বেগুনী রশ্মির নিঃসরণও বুঝতে পারে।

NOTES

NOTES